অলকা চট্টোপাধ্যায়

অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান



নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৫৯

প্রকাশক : প্রসন্ন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

মুদ্রক : প্রসন্ন বসু,
নিউ এজ প্রিণ্টার্স,
৮২ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

আঠারো টাকা

ATISA DIPANKAR SRIJNAN
By
ALOKA CHATTOPADHYAY

সূচীপত্র

তিব্বতী শব্দ প্রসঙ্গে

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ সংক্রান্ত অধুনালভ্য প্রায় সমস্ত মূল তথ্যই তিব্বতী ভাষায় সংরক্ষিত। তিব্বতী গ্রন্থাদির উপর নির্ভর না করে তাঁর কথা আলোচনা করা যায় না। বর্তমান গ্রন্থে তাই প্রায় প্রতি পদেই তিব্বতী শব্দ, তিব্বতী নাম প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা হরফে এ জাতীয় শব্দাদি সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত ও কমবেশি আয়াসসাধ্য বলে প্রতীত হবার সম্ভাবনা। অতএব শুরুতেই এ বিষয়ে কয়েকটি কথা পাঠকদের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে।

তিব্বতী শব্দের ইংরেজী বর্ণমালায় রূপান্তরের একটা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক বিদ্বান সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু এই পদ্ধতি ইংরেজী হরফের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর-শীল; ফলে বাংলায় তার হুবহু অনুসরণ সম্ভব নয়। প্রথমে তার একটি প্রধান কারণ দেখা যাক।

তিব্বতী শব্দের (তিব্বতী বর্ণমালায়) যে-লিখিত রূপ তার সঙ্গে শব্দটির উচ্চারিত রূপ অভিন্ন নয়। তার একটা বড় কারণ এই যে লিখিত রূপটির ক্ষেত্রে এক বা একাধিক আদ্য বর্ণ অনুচ্চারিত থাকে। ইংরেজী বর্ণমালায় রূপান্তরের সময় অনুচ্চারিত বর্ণগুলি ছোটো হাতের (বা লোয়ার কেস টাইপে) দেওয়া হয়, উচ্চারিত আদ্য বর্ণটির জন্য ক্যাপিটাল বা বড়ো হরফ ব্যবহার করা হয়। যেমন

bsTan-'gyur, উচ্চারণে তাঞ্জুর

বাংলায় ছোটো হাতের হরফ নেই। তাই বাংলায় তিব্বতী শব্দটির লিখিত রূপ বজায় রাখতে গেলে কোনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয়। যেমন হয়তো ব্ স্ ত ন গ্যুর · ব্ স্ অনুচ্চারিত, গ্য উচ্চারণে 'জ' হয়ে যায়। উচ্চারণে শব্দটি মোটের উপর 'তাঞ্জুর'। সাধারণ পাঠকদের কাছে তাঞ্জুর অবশ্যই সহজপাঠ্য; কিন্তু 'ব্ স্ ত ন গ্যুর' লিখলে খুবই কিম্ভুতকিমাকার মনে হবে। বর্তমান গ্রন্থে তাই তিব্বতী শব্দের অনুচ্চারিত আদ্য অক্ষর বাদ দিয়ে এবং মোটের উপর শব্দটির উচ্চারিত রূপ অনুসরণ করা হয়েছে।

অবশ্যই উচ্চারিত রূপ অনুসরণেরও নানা সমস্যা আছে। প্রথমত, তিব্বতের প্রদেশভেদে উচ্চারণের তারতম্য আছে। জাস্কী তাঁর 'তিব্বতী-ইংরেজী অভিধান'-এর ভূমিকায় এই জাতীয় তারতম্যের বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করেছেন: পশ্চিম তিব্বতে একরকম উচ্চারণ, মধ্য তিব্বতে আর একরকম; খাম্-দের মধ্যে উচ্চারণ আবার অন্য রকম। এমনকি মধ্য তিব্বতেও উচ্চারণ সর্বত্র সমান নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের পক্ষে এইসব জটিলতায় প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। মোটের উপর মধ্য তিব্বতের বৌদ্ধ বিহারে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসরণ করতে পারলেই যথেষ্ট। বর্তমান গ্রন্থে

সেই চেষ্টাই করা হয়েছে, যদিও তিব্বতী বিশারদদের মধ্যে এ নিয়ে নানা বিতর্ক উঠতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বাংলা বর্ণমালায় ইংরেজী 'z'-এর সমতুল্য কোনো হরফ নেই—যেকারণে রাজশেখর বসু 'zাস্ত পারো না' লিখেছিলেন। সাধারণত z-এর জন্যে বাংলা জ লেখা হয়, যদিও তার ফলে Zola নামটি বাংলায় 'জোলা'-য় পরিণত। বাংলা বর্ণমালার এই অভাব দূর করা অবশ্যই কঠিন নয়। যেমন, জ-র তলায় ডট চিহ্ন দিয়ে নতুন হরফ ব্যবহারের প্রথা সহজেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এখনো মুদ্রাকরেরা এ জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। উচ্চারিত 'z' অক্ষরের জন্যে 'জ'-ই ব্যবহৃত হয়। ফলে তিব্বতী হরফে যে-অক্ষর 'z'-এর সমতুল্য তার জন্যেও 'জ'-ই ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রন্থমধ্যে বহুলভাবে ব্যবহৃত একটি তিব্বতী শব্দ 'লো-চা-বা'—কিংবা উচ্চারণ আরো বিশুদ্ধ করতে হলে শুধু চ না লিখে 'চ-এ ব-এ' যুক্তাক্ষর ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু পাঠকদের চোখে তা অদ্ভুত দেখাবে। তাই পড়ার সুবিধা হবে—এই আশায় হাইফেন চিহ্ন বাদ দিয়ে শব্দটি 'লোচাবা' হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে।

লোচাবা মানে 'অনুবাদক', অর্থাৎ বিশেষত বৌদ্ধ শাস্ত্রাদিগ্রন্থের অনুবাদক। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদই সেকালের তিব্বতে পরম পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল। হয়তো এই কারণেই শব্দটি পাণ্ডিত্যসূচক অর্থেও ব্যক্তিনামের বিশেষণ হয়েছে। যেমন, শোন-নু-পাল (১৩৯২-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) সংক্ষেপে প্রায়ই গোই লোচাবা বা 'গোই-এর লোচাবা' নামে উল্লিখিত। কিন্তু তাঁর প্রধান কীর্তি অনুবাদ সাহিত্য নয়; বৌদ্ধ-ধর্মের এক সুবিশাল ইতিহাস। পঞ্চম দলাই লামা প্রভৃতি তিব্বতী বিদগ্ধদের মতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তার সমতুল্য বিদ্বান আর কেউ নন—তিব্বতী ভাষায় 'লো-জুই-ম্না-লা-দা-মেদ' বা অতুলনীয় ঐতিহাসিক।

তিব্বতী বিদ্বানদের নাম প্রসঙ্গে আর একটি চিত্তাকর্ষক কথা উল্লেখ করা যায়। 'শোন্-নু-পাল' নামটি সংস্কৃত শব্দ 'কুমারশ্রী'-র আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র। এই জাতীয় নামকরণের বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র আলোচ্য ঐতিহাসিকটিরই নয়। বস্তুতপক্ষে সেকালের তিব্বতে প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নামই আসলে কোনো-না-কোনো সংস্কৃত শব্দের হুবহু তর্জমা মাত্র। দীপংকরের জীবন প্রসঙ্গে এই জাতীয় যে-সব ব্যক্তির কথা বার বার উঠবে তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যায় :

জয়শীল = ছুল-ঠিম-জল-বা ॥ দীপংকরের এই তিব্বতী শিষ্যই তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে নিয়ে যান।

বীর্যসিংহ = চোন-ডুই-সেং-গে ॥ বিক্রমশীল বিহারে দীর্ঘকাল দীপংকরের কাছে অধ্যয়ন করেন এবং দীপংকরকে তিব্বতে নিয়ে যাবার সময় নেপালে মারা যান।

রত্নভদ্র = রিন্-ছেন-সাং-পো ॥ তিব্বতের মহাপণ্ডিত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। প্রায় ৮৫ বছর বয়সে তিনি দীপংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

জ্ঞানপ্রভ = এ-শে-ওদ॥ পশ্চিম তিব্বতের রাজা। তাঁরই আমন্ত্রণে দীপংকর তিব্বত গমন করেন।

বোধিপ্রভ = জন-ছুব-ওদ॥ জ্ঞানপ্রভর ভ্রাতার পৌত্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে দীপংকরের ঘনিষ্ঠ শিষ্য হন।

জয়াকর = জল-বেই-জুং-নে॥ তিব্বতে দীপংকরের প্রধান শিষ্য এবং দীপংকর প্রচারিত ধর্মতত্ত্বের উপর নির্ভর করে 'কা-দম্-পা' নামে তিব্বতী বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

দীপংকর প্রসঙ্গে তিব্বতী সাহিত্যের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রাথমিক পরিচয় পাঠকদের পক্ষে সুবিধার হতে পারে।

প্রথমত, অনুবাদ সাহিত্যের কথা। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার ভারতীয়—বিশেষত বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই বিশাল অনুবাদ সাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত—কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর। তিব্বতী মতে কাঞ্জুরের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলি সাক্ষাৎ বুদ্ধবচন; তাঞ্জুরের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলি 'শাস্ত্র'—অর্থাৎ বুদ্ধের পরবর্তী পণ্ডিতদের লেখা, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ। কাঞ্জুরের গ্রন্থসংখ্যা ১১০৮; তাঞ্জুরের গ্রন্থসংখ্যা ৩৪৫৯। সাধারণত কোনো ভারতীয় পণ্ডিতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তিব্বতী অনুবাদক বা লোচাবা তর্জমার কাজ করতেন। গ্রন্থশেষে তাই সাধারণত সেই ভারতীয় পণ্ডিত ও তিব্বতী লোচাবা উভয়েরই নাম উল্লিখিত। সেই সঙ্গে কখনো কখনো উভয় সম্বন্ধেই কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলি থেকে তাই অনেক সময় দুর্মূল্য ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের সুযোগ আছে।

অবশ্যই ঐতিহাসিক উপাদানের দিক থেকে তিব্বতে যে-সাহিত্যের সর্বাধিক সমাদর প্রধানত তা দু'ভাগে বিভক্ত—১। জল-রাব এবং ২। ছোই-জুং। জল-রাব মানে রাজকাহিনী, ছোই-জুং ধর্ম-ইতিহাস, বা আরো নির্দিষ্টভাবে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। তিব্বতী ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে দীপংকরের স্থান অদ্বিতীয়; তাই ছোই-জুং নামের সাহিত্য দীপংকরের মহিমায় ভরপুর।

ছোই-জুং বা ধর্ম-ইতিহাসগুলির মূল তিব্বতী নাম সাধারণত অত্যন্ত দীর্ঘ। কিন্তু সেইসঙ্গে এগুলির প্রায়ই সংক্ষিপ্ত নামও বর্তমান। যেমন, গোই লোচাবার গ্রন্থটির পুরো নাম: বোদ-চি-উল-দু-ছোই-দং-ছোই-মা-বা-জি-তর-জুং-বেই-রিম-পা-দেব-থের-ঙোন-পো। কিন্তু এতো বড় নামের বদলে বইটিকে সাধারণত শুধু 'দেব-থের-ঙোন-পো' বা 'নীল বিবরণ' বলে উল্লেখ করা হয়। তাই ইংরেজী তর্জমায় জি?. রোয়েরিখ বইটির নাম দিয়েছেন: *Th- Blue Annals*।

সাধারণ পাঠকদের পক্ষে অবশ্য এই জাতীয় নাম ব্যবহারের বদলে গ্রন্থকারদের (সংক্ষিপ্ত) নাম অনুসারে ধর্ম-ইতিহাসগুলির উল্লেখ করলে পড়বার সুবিধা হবে। যেমন: বু-তোন রচিত ধর্ম-ইতিহাস, সুম-পা রচিত ধর্ম-ইতিহাস। বর্তমান আলোচনায় প্রধানত এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও অবশ্যই বলে রাখা দরকার যে

বু-তোন প্রভৃতি তিব্বতী ঐতিহাসিকদের পুরো নামগুলিও প্রায়ই সুদীর্ঘ ; কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তাঁদের দীর্ঘ পুরো নামের বদলে সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহারই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

এখানে তিব্বতী বর্ষগণনা প্রসঙ্গেও কিছু কথা উল্লেখ করা দরকার। তিব্বতী পঞ্জিকার মূল কথা হল : ষাট বছরের একটি কালচক্রের আবর্তন। অগ্নি, ভূমি, লৌহ, জল ও কাষ্ঠ—এই পাঁচটি পদার্থের সঙ্গে শশক, মকর, সর্প প্রভৃতি বারো রকম প্রাণীর নাম সংযোজন করে প্রতি বর্ষের নামকরণ করা হয়। যেমন : অগ্নি-শশক বর্ষ, ভূমি-সর্প বর্ষ ইত্যাদি। ষাট বছরের পুরো চক্রটিকে তিব্বতীতে বলে রাব্-জুং। অগ্নি-শশক বর্ষ থেকে একটি রাব-জুং শুরু ; ষাট বছর পরে আবার অগ্নি-শশক বর্ষ থেকেই পরবর্তী রাব-জুং শুরু হবে। এই ভাবে ষাট বছরের একটি কালচক্র ঘুরে চলেছে।

এই তিব্বতী পঞ্জিকা থেকে আধুনিক ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে বর্ষনির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। তার ফলে তিব্বতী ইতিহাসে উল্লিখিত অগ্নি-শশক বর্ষ প্রভৃতির তর্জমাও আধুনিক তিব্বতবিদ্‌দের কাছে আজ আর তেমন কঠিন সমস্যা নয়। বর্তমান গ্রন্থে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তিব্বতী ইতিহাসের সনতারিখ নির্ণয়ের নমুনা দেখা যাবে।

পরিশেষে আর একটি কথা বলা দরকার। উপরে তিব্বতী নাম প্রভৃতি উল্লেখ করার সময় প্রচুর হাইফেন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : ছুল-ঠিম-জল-বা, চোন-ডুই-সেং-গে ইত্যাদি। এই জাতীয় হাইফেন চিহ্নর ব্যবহার বর্তমানে প্রচলিত ইয়োরোপীয় প্রথা সম্মত। এই প্রথার কারণ হলো, তিব্বতী লেখায় (মোটের উপর বলা যায়) প্রতিটি উচ্চারণযোগ্য শব্দাংশের পর মাথার কাছে একটি করে ডট চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন · ছুল·ঠিম·জল·বা ইত্যাদি। আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতিতে এই ডট চিহ্নগুলির বদলে হাইফেন চিহ্ন ব্যবহৃত। কিন্তু সাধারণপাঠ্য বর্তমান বইতে পড়বার সুবিধার জন্যে হাইফেন চিহ্ন (বা তিব্বতী প্রথায় ডট চিহ্ন) বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। এবং নামগুলি যাতে অত্যন্ত দীর্ঘ বলে প্রতীত না-হয়, সেই উদ্দেশ্যে এগুলি প্রায়ই ভেঙে লেখা হয়েছে। যেমন : ছুলঠিম জলবা। এইভাবে ভাঙার সমর্থনে বলা যায়, অধিকাংশ তিব্বতী বৌদ্ধ নামের মতো আলোচ্য নামটিও দুটি সংস্কৃত শব্দের হুবহু তিব্বতী প্রতিশব্দ দিয়ে গড়া। ছুলঠিম জলবা হলো সংস্কৃত শব্দ "জয়শীল"-এর আক্ষরিক অনুবাদ। "ছুলঠিম" = শীল ; "জলবা" = জয়। কিন্তু একসঙ্গে "ছুলঠিমজলবা" না-লিখে নামটি দু'ভাগে ভেঙে "ছুলঠিম জলবা" হিসাবে লেখাই সুবিধাজনক মনে হয়েছে। তিব্বতী নাম অনেক সময় আরো অনেক বড়ো, কিছুটা ভেঙে না-লিখলে পড়তে অসুবিধা হবার সম্ভাবনা। অতএব, সংক্ষেপে, হাইফেন বা ডট চিহ্ন বাদ দিয়ে এবং বড়ো নামগুলি প্রয়োজনমতো ভেঙে নিয়ে বর্তমান বইতে ব্যবহৃত করা হয়েছে।

১। দীপংকর শ্রীজ্ঞান

তিব্বতী ভাষায় জোবো, জোবোজে অর্থে প্রভু, জোবো ছেনপো অর্থে মহাপ্রভু। গত একাদশ শতক থেকে বিংশ শতক—এই হাজার বছর ধরে তিব্বতের মানুষ জোবোজে, জোবো ছেনপো বলতে প্রধানত যাঁকে জেনেছেন ও মেনেছেন, তিনি আমাদের বাঙালী বৌদ্ধাচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান। তিব্বতে ও মোঙ্গলিয়ায় কখনও বা সংক্ষেপে অতি+ঈশ =অতীশ নামেও তিনি অভিহিত।

শোনা যায়, অবিভক্ত বাংলার বা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি মাটির ঢিবিকে "অতীশের ভিটা" বা "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" বলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কিন্তু এ ছাড়া তাঁর জন্মভূমি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ—তাঁকে বিশেষ মনে রাখেনি। অথচ তিব্বতের ধর্ম-ইতিহাস, রাজকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্রগাথা ও সর্বোপরি তাঞ্জুর নামে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ-সংকলন—সে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রায় সবগুলি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাই দীপংকর শ্রীজ্ঞানের মহৎ ও বিপুল কর্মজীবন সম্পর্কে যা কিছু তথ্যপ্রমাণ তা তিব্বতী সূত্র থেকে সংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই সূত্র থেকেই সংক্ষেপে জানা যায়:

জল-অশ্ব বর্ষে বা ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুরে 'রাজা' কল্যাণশ্রী ও রাণী প্রভাবতী বা শ্রীপ্রভার মধ্যমপুত্র চন্দ্রগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে তান্ত্রিক অভিষেক গ্রহণ করেন,, তখন তাঁর তান্ত্রিক নামকরণ হয় জ্ঞানগুহ্যবজ্র। পরে ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণ কালে তাঁর নাম হয় দীপংকর শ্রীজ্ঞান। ভারতের বিভিন্ন বিহারে অধ্যয়ন শেষে একত্রিশ বৎসর বয়সে দীপংকর সুবর্ণদ্বীপের আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। সেখানে বারোবৎসর শাস্ত্রচর্চা করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

তারপর ভারতে তিনি যে পনের বৎসর ছিলেন সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ-বিহারে—ওদন্তপুরী, সোমপুরী এবং বিশেষভাবে বিক্রমশীল বিহারে—অধ্যাপনা ও পরিচালনার কাজে নিযুক্ত থেকে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে ও অনুনয়ে দীপংকর আটান্ন বৎসর বয়সে বিক্রমশীল বিহার থেকে যাত্রা করে নেপাল হয়ে তিব্বতে গমন করেন। সে দেশে রাজানুকূল্যে ও অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্তদের সাহায্যে সমগ্র তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। বহু মঠমন্দির প্রতিষ্ঠা, দ্বিশতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা এবং অগণিত ভক্তবৃন্দের সমাবেশের মধ্য দিয়ে তিনি সে দেশে শ্রেষ্ঠগুরুর সম্মান লাভ করেন। তেরো বৎসর তিব্বত বাসশেষে কাষ্ঠ-অশ্ব বর্ষে অর্থাৎ ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে লাসার কাছে ঞেথাং বিহারে তাঁর মৃত্যু হয়।

২। তথ্যপ্রসঙ্গে

দীপংকর যখন তিব্বত যাত্রা করেছেন, তখন তিনি পরিণত বয়স্ক প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য। কিন্তু জীবনের যে বৃহদংশ তিনি ভারতে কাটিয়েছেন তার কোনো বিবরণ আমরা এদেশে পাই না।

বৌদ্ধাচার্যরূপে ভারতে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল—বিক্রমশীল বিহার। এই বিহারটি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণা এখনও অসম্পূর্ণ। অন্যদিকে সাহিত্যগত উপকরণ বলতে দীপংকরের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো তথ্য দূরের কথা, বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যামূলক যে সকল গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, সেগুলিও এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিব্বতী ভাষায় কিন্তু অতীশের জীবনী ও অতীশের সমগ্র রচনাবলীর অনুবাদ সযত্নে রক্ষিত আছে।

অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের ধর্ম ও কর্মজীবনের বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণের জন্য আমরা যে তিব্বতী সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল তা প্রধানত নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত :

১। ছোই জুং বা ধর্ম-ইতিহাস
২। নাম থর বা জীবনী-সাহিত্য
৩। জল রাব বা রাজকাহিনী
৪। তোদ পা বা প্রশস্তি-স্তোত্র
৫। তাঞ্জুর বা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভারতীয় গ্রন্থের বিশাল অনুবাদ সংকলন। তিব্বতী মতে এগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ।

ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ সংকলনের অপর অংশের নাম কাঞ্জুর। তার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থসংখ্যা ১১০৮ ; তিব্বতী মতে এগুলি বুদ্ধবচন।

এই উপকরণগুলির মধ্যে প্রথম চারটি ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। তিব্বতে ইতিহাস বা ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্যে কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। লেখকরা ভক্তিপ্রকাশের ব্যগ্রতায় বাস্তব বিবরণের পরিবর্তে এখানে বহু ক্ষেত্রেই অলৌকিক কাহিনী বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছেন।

বর্তমান আলোচনার জন্য আমরা প্রথমেই দুটি ধর্ম-ইতিহাসের উল্লেখ করব। শুধু তিব্বতে বা মোঙ্গলিয়ায় নয়, তিব্বতের বাইরেও তিব্বত-বিশেষজ্ঞদের মতে ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে এই গ্রন্থ দুটির মূল্য সর্বাধিক।

প্রথম গ্রন্থটি বুতোন রিনছেন ডুব রচিত "ভারত ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস"। বুতোন (১২৯০—১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে তিব্বতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-মণ্ডলীর অন্যতম। ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তিব্বত-বিশেষজ্ঞ জর্জ রোয়েরিখের মতে তিব্বতে বৌদ্ধশাস্ত্রের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি অমূল্য। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ শেরবাৎস্কি বলেন, এই গ্রন্থের প্রথম অংশটির বৈজ্ঞানিক মূল্য অপরিসীম। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

সংযুক্ত সকল বিষয়ের সমন্বয় এই গ্রন্থটিতে ঘটেছে। কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর—এই সুবিশাল অনুবাদ সাহিত্য সম্পাদনায় যাঁরা চূড়ান্ত রূপ দেন, বুতোন তাঁদের অন্যতম। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনায় বুতোনের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি সে সময়ে আর কেউ হতে পারতেন না। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের যে ইতিহাস তার পরিপ্রেক্ষিতেই দীপংকরের কর্মজীবন আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়; সে কারণেই বুতোনের এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি গোই লোচাবা শোননু পাল (১৩৯২—১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) রচিত ছোইজুং বা ধর্ম-ইতিহাস—"তিব্বতভূমিতে (বৌদ্ধ) ধর্মের ও তার প্রচারকদের আবির্ভাবের ক্রমপর্যায়"; সংক্ষেপে 'দেব-ঙোন'। এই বিপুলায়তন গ্রন্থটির রচনাকাল ১৪৭৬-৭৮ খ্রিস্টাব্দ। তিব্বতের ইতিহাসের সুসংহত ঘটনাপঞ্জীরূপে এই গ্রন্থটিও অমূল্য। তিব্বতে বর্ষগণনার পদ্ধতি অনুসারে এতে সন তারিখ নির্দেশ করা হয়েছে। রচনাকার এই কাল নির্দেশে আর একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যথা, প্রথমে তিনি তিব্বতের ইতিহাসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তারিখ নিয়েছেন, যেমন, রাজা স্রোং চান গামপোর মৃত্যুকাল (৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) কিংবা তাঁর নিজের এই রচনারম্ভকাল (১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ); তারপর সেই বৎসরটিকে ভিত্তি করে তিনি তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাসমূহের কালনির্ণয় করেছেন। এই ইতিহাসের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত ধর্মগুরুদের ও তাদের শিষ্যদের তালিকা; তাদের জন্মস্থান, বিহার ইত্যাদির নাম, কখনও বা জন্মমৃত্যুর তারিখও তিনি দিয়েছেন। গ্রন্থটি পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এর এক-একটি অধ্যায়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোনো শাখা বা সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বিখ্যাত তিব্বত বিশেষজ্ঞ জর্জ রোয়েরিখ গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সেই অনুবাদটি The Blue Annals নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। রোয়েরিখের অনুবাদের একটি বিশেষ গুণ এই যে তিব্বতীয় বর্ষগণনার পদ্ধতিকে ইউরোপীয় পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকালকে ইংরেজি খ্রিস্টাব্দে রূপান্তরিত করেছেন। ফলে গ্রন্থটি আধুনিক পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে।

পরবর্তীকালে প্রধানত এই দুটি গ্রন্থ অবলম্বন করে তিব্বতে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এখানে তার মধ্যে অন্তত একটির আলোচনা খুবই প্রয়োজন। এই গ্রন্থটির পূর্ণ তিব্বতী নামটি সুদীর্ঘ; কিন্তু সংক্ষেপে এটি "পাগ সাম জোনসং" (অর্থাৎ 'কল্পদ্রুম' বা 'কল্পতরু') নামে পরিচিত। লেখকের নাম সুমপা খেনপো য়েশে পালজোর—সংক্ষেপে সুমপা। শরৎচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় বিষয়বস্তুর নির্দেশনামা ও বিষয়সূচীসহ গন্থটির একাংশ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়; গ্রন্থটির নানা পরিচ্ছেদের ইংরেজি অনুবাদও শরৎচন্দ্র দাস এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদিত তিব্বতী সংস্করণের সঙ্গে শরৎচন্দ্র দাস ইংরেজিতে গ্রন্থটির যে বিষয়বস্তু নির্দেশনামা ও বিষয়সূচী

সংযুক্ত করেন, আমাদের আধুনিক ঐতিহাসিকরা তার উপর বিশেষ নির্ভরশীল। বলাই বাহুল্য, শরৎচন্দ্র দাস এযুগে তিব্বতী চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ এবং আধুনিক বিদ্বান সমাজ তাঁর কাছে এই কারণে চিরঋণী। কিন্তু তাঁর সময়ে বিশেষত তিব্বতী বর্ষগণনা প্রসঙ্গে বিদ্বানদের যে ধারণা ছিল, পরবর্তীকালে তা সংশোধনসাপেক্ষ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে উপরোক্ত বিষয়বস্তুর নির্দেশনামা ও বিষয়সূচীতে শরৎচন্দ্র দাস ইউরোপীয় পঞ্জিকা অনুসারে যে সব সন তারিখ উল্লেখ করেছেন, আধুনিক পণ্ডিতরা অনেক সময় তা গ্রহণ করেন নি। এখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। শরৎচন্দ্র দাসের তর্জমায় সুমপার জীবনকাল ১৭০২-৭৫ খ্রিষ্টাব্দ, যদিও পরবর্তীকালে তা সংশোধন করে ১৭০৪-১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। শরৎচন্দ্র দাসের বিষয়সূচীতে ইউরোপীয় প্রথায় উল্লিখিত সমস্ত সন তারিখই পুনর্বিবেচ্য ; তার উপরে নির্বিচারে নির্ভর করলে কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে দু-এক বছর—কখনো আরো বেশি—হিসাবের ভুল করার আশংকা আছে।

সুমপার গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে পশ্চিম তিব্বতের রাজবংশ সম্পর্কে যে অংশটি আছে তার ইংরেজি অনুবাদ ফ্রাঁকে তাঁর 'এ্যান্টিকুইটিস অফ ইণ্ডিয়ান টিবেট' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দিয়েছেন। এই পশ্চিম তিব্বতের রাজবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে তিব্বতে দীপংকরের কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে, তাই দীপংকরের জীবনী আলোচনায় ফ্রাঁকের এই অনুবাদটিও বিশেষ সহায়ক। দীপংকর ও তাঁর একান্ত অনুগত পশ্চিম তিব্বতের রাজকুলের কাহিনী যে ঐতিহাসিক সত্য—আষাঢ়ে গল্প নয়—তিব্বতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ফ্রাঁকে তার নিশ্চিত প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আধুনিক গবেষকবৃন্দ সে পরিচয় পাবেন।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী ছাড়া অতীশ দীপংকর সংক্রান্ত তথ্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর তাঞ্জুর গ্রন্থসংকলন।

তাঞ্জুরে দীপংকরের রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত হয়েছে ; এই গ্রন্থগুলির গ্রন্থপরিচয় বা পুষ্পিকায় দীপংকরের জীবনী-সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই পুষ্পিকার কয়েকটি দীপংকরের স্ব-রচিত। যেমন 'আর্য অবলোকিত লোকেশ্বর-সাধন' গ্রন্থের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, 'আমি দীপংকর শ্রীজ্ঞান, উপদেশ সমবায়ের ভিত্তিতে এটি রচনা করছি।' এই রকম বেশ কয়েকটি গ্রন্থের পুষ্পিকায় দীপংকর সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ পাওয়া যায়।

তিব্বতের বাইরে তিব্বত-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে জনৈক জার্মান পণ্ডিত কোয়পেনই দীপংকর সম্পর্কে সর্বপ্রথম ঔৎসুক্য দেখান। তারপরে শরৎচন্দ্র দাস কর্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত 'অতীশের জীবনী' আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করে। দীপংকর সংক্রান্ত সকল সংবাদের জন্য গবেষকরা বহুদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থটিরই শরণ নিয়েছেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে The Journal of the Buddhist Text Society-তে 'অতীশের জীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয়। তার পাদটীকায় শরৎচন্দ্র দাস জানিয়েছেন,

'কল্যাণমিত্র ছাগ সোরপা অতীশের কাহিনী রচনার আগ্রহে নাগছোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। উনিশ বছর ধরে নাগছো এই ভারতীয় মহাপণ্ডিতের (অতীশের) পরিচর্যা করেছেন। অতীশের জীবনী বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ দানের যোগ্যতাও তিনি অর্জন করেছিলেন। ইয়াং থোগ মন্দিরে ছাগ সোরপা এই বৃদ্ধ লোচাবার সাক্ষাৎ পান।…অতীশের ধর্মজীবন ও কর্মাবলী সম্পর্কে প্রচুর তথ্য তিনি (নাগছো) ছাগ সোরপাকে দেন। তার কিছু অংশ ছিম থমচে ছেনপা পান এবং তাকে তিনি পুস্তকাকারে বিন্যস্ত করে স্মারক গ্রন্থের রূপ দেন। গাংছেন বা তিব্বতে নারথাং (বিহারে) কুক্কুর- বর্ষে অর্থাৎ সম্ভবত ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।'

পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র দাসের 'ইণ্ডিয়ান পণ্ডিটস ইন দি ল্যাণ্ড অভ স্নো' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই জীবনীটিই যখন প্রকাশ করা হয়, তখন অজ্ঞাত কোনো কারণে এই পাদটীকাটি বর্জিত হয়। গোই লোচাবার গ্রন্থেও কাদমপা সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে নাগছোর এই কাহিনীটি মোটামুটি পাওয়া যায়, কাহিনীটি তাই ভিত্তিহীন নয়।

অবশ্য দীপংকরের জীবনকালের বিবরণ সম্পর্কে তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন, সুমপা বলছেন :

'নেপাল ও তিব্বতে তিনি (দীপংকর) মোট পনেরো বৎসর অতিবাহিত করেন। তিব্বতেই তেরো বৎসর। কিন্তু 'মার্গক্রমে' বলা হয়েছে, তিনি ঙারিতে তিন বছর, ঞেথাং-এ নয় বছর, উই, চাং ও অন্যান্য স্থানে পাঁচ বছর—অর্থাৎ মোট সতেরো বছর কাটিয়েছেন।…এই উক্তিতে প্রথম ও শেষ বৎসরকে দুবার করে গোণা হয়েছে এবং ঞেথাং, উই প্রভৃতিতে বাসকালের সঙ্গে আরও দুটি বছর যোগ করা হয়েছে।'

নাগছো বলেছেন : 'উনিশ বৎসর আমি তাঁর কাছে কাটিয়েছি।…তিব্বতে যাত্রাকালে অতীশ বিক্রমশীলে বলেছিলেন, 'আরও আঠারো বছর পরে আমি আমার নশ্বরদেহ ত্যাগ করব।'

'লাময়িগ সাং খোরমা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, অগ্নি-অশ্ব বর্ষে ভারতে জন্মগ্রহণ করে ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বুদ্ধশিক্ষার দ্বারা ভারতকে রক্ষা করেন।

'নামথর য়িগে'-তে বলা হয়েছে, 'লৌহ-অশ্ব বর্ষে জোবো জন্মগ্রহণ করেন, অগ্নি-ব্যাঘ্র বর্ষে ভারত থেকে তিব্বতে যাত্রা করেন, কাষ্ঠ-শূকর বর্ষ তিনি সামিয়েতে কাটান, অগ্নি-শশক বর্ষে তিনি ঞেথাং-এ উপনীত হন এবং জল-অশ্ব বর্ষে বোডার (তিব্বতের বর্ষপঞ্জীর একাদশ মাস, আমাদের ফাল্গুন মাসের সমসাময়িক) অষ্টাদশ দিনে ঞেথাং-এ তিনি দেহরক্ষা করেন।'

সুমপা কিন্তু বলেছেন, 'অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে জল-অশ্ব বর্ষে তাঁর জন্ম। সুতরাং 'লাম-য়িগে'-র অগ্নি-অশ্ব বর্ষের উল্লেখ সঠিক নয়।…কিন্তু জের (চোং খাপা) 'মার্গক্রমে' যা বলা হয়েছে, তা খুবই ঠিক। অবশ্য নাগছোর 'তোদপা সুমচুপা' এবং ডোলুং-এর 'তোদ্‌পা সুমচুপা' মোটামুটি নির্ভুল।'

অতীশ প্রসঙ্গে তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতভেদের কিছু নমুনা এখানে দেওয়া

গেল। তিব্বতী প্রথায় বর্ষগণনার বৈশিষ্ট্য ও অগ্নি-অশ্ব বর্ষ প্রভৃতি কথার তাৎপর্য পরে বিচার করা যাবে।

৩। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে দীপংকর শ্রীজ্ঞান

ভারত ও তিব্বতের ধর্ম-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবভূমি ভারতবর্ষ, কিন্তু ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবার পরে পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে তিব্বত অনেকদিন পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়েছে।

সেইযুগে কয়েক শতক ধরে ভারতবর্ষ থেকে যে-সব বৌদ্ধ পণ্ডিতরা তিব্বতে গিয়েছিলেন, দীপংকর তাঁদের মধ্যে প্রথম নন। কিন্তু তিব্বতের ধর্মীয় ইতিহাসে খ্যাতি ও সম্মানে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে। সে যুগের তিব্বতে এমন কোনো বিষয় ছিল না, দীপংকর যা আলোচনা করেন নি, সমাজের এমন কোনো শ্রেণী ছিল না যা দীপংকরের ধর্মদেশনায় প্রভাবিত হয়নি। গৃহীকে তিনি ত্রিশরণ গমনের উপদেশ দিয়েছেন, ভিক্ষুকে শীলরক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন, সকলকে জীবে দয়া ও আর্তের সেবা শিখিয়েছেন। প্রাণীমাত্রকেই তিনি গভীর করুণায় অভিসিঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর রচিত শতাধিক ছোটবড় গ্রন্থ তিব্বতী তর্জমায় বর্তমান ; আরও শতাধিক বৌদ্ধগ্রন্থের তিব্বতী তর্জমার সঙ্গে তাঁর নাম সংযুক্ত ; এই দ্বিশতাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তিব্বতের সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। বাহুবলে নয়, মারণ-উচাটনের ভয় দেখিয়ে নয়—প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর মানবমুখী ধর্মের উদাত্ত আহ্বানে অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মজীবনে ও সাধারণভাবে তিব্বতের সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিব্বতের মানুষ যে তাঁকে মহাপ্রভুর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তা অবশ্যই অকারণ নয়।

দীপংকরের পরে ভারতবর্ষে তাঁর সমখ্যাতি সম্পন্ন কোন বৌদ্ধ আচার্যের কথা আমাদের জানা নেই। আধুনিক ঐতিহাসিকরা তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। একাদশ শতকের মধ্যভাগে দীপংকরের তিব্বত যাত্রার কালেই ভারতবর্ষে—বা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের শেষ ঘাঁটি পূর্বভারতে—বৌদ্ধধর্মের অন্তিম সংকট দেখা দিয়েছিল। সে সংকট শুধু বাইরের নয়, অভ্যন্তরীণও। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম পরিবর্তিত হতে হতে যে রূপ ধারণ করে তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যমন্ত্রের ক্রিয়াকর্ম ও মন্ত্রতন্ত্রের বিশেষ কোনো পার্থক্য করা কঠিন। তারনাথ রচিত "ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস" থেকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য উল্লেখ করা যায়। তারনাথের বর্ণনা অনুসারে বিক্রমশীল বিহারে "হোম আচার্য", "বলি আচার্য" প্রভৃতি পদ নির্দিষ্ট ছিল ও যে-সব ক্রিয়াকর্মের জন্য তাঁরা নিযুক্ত ছিলেন তার জন্য বিপুল আয়োজন ও অর্থ বরাদ্দ ছিল। তারনাথের বর্ণনা অনুসারে পালবংশের রাজক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ধর্মপাল যে বিশাল যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন, সেই যজ্ঞে নব্বই লক্ষ তিন হাজার তোলা রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করা হয়। অতএব, নামে বৌদ্ধবিহার হলেও পাল রাজাদের আমলে এবং দীপংকরের আগেই বিক্রমশীল

বিহার যেসব ধর্মানুষ্ঠানের কেন্দ্র হতে চলেছিল তার সঙ্গে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের খুব একটা সঙ্গতি দেখা যায় না। বরং এর মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের চিত্রই আমাদের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে।

অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় ছাড়াও সেই সময় বৌদ্ধধর্মের বাহ্যসংকটও ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। যে পালবংশের চারশত বৎসরব্যাপী রাজত্বকাল পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয় হয়েছিল, দীপংকরের ভারত ত্যাগের শত বৎসরের মধ্যে সেনবংশ সেই পাল শাসনের অবসান ঘটায় ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। বৌদ্ধধর্মের প্রধান ভিত্তি তার সংঘারাম ও ভিক্ষুদল; তাদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজের সম্পন্নশ্রেণীর বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন; এই পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঘটলে বৌদ্ধধর্ম স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়ে। সেন শাসনে এই রাজকীয় আনুকূল্যের অভাব ছাড়াও বৌদ্ধবিহারগুলির উপর বখতিয়ারের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্মের এই সার্বিক সংকটের বিবরণ ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন, বর্তমানে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

দশম-একাদশ শতকে বৌদ্ধধর্মের এই অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি দীপংকরের তিব্বত যাত্রাকালেই প্রত্যক্ষ হয়েছিল; তিব্বতীয় সূত্রেও সে সংবাদ আমরা পাই। তিব্বতে দীপংকরের প্রধান শিষ্য ব্রোম তোনপা বা জয়াকর তাঁর স্তোত্রে বলেছেন, "প্রভু যখন ভারত ত্যাগ করে যান, বৌদ্ধধর্ম তখন সেখানে অন্তিম অবস্থায় পৌঁছেচে।" বৌদ্ধভিক্ষু ছুলঠিম জলবা বা জয়শীল দীপংকরকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন, বেশ কিছুকাল বিক্রমশীল বিহারেও তিনি বাস করেছিলেন। তিনি বলেন, দীপংকরের সময়ে

"ওদন্তপুরীতে ছিলেন ভিক্ষু ত্রিপঞ্চাশৎ
বিক্রমশীল বিহারে প্রায় একশত।"

পরবর্তী দুশো বছরের মধ্যে বুদ্ধগয়া ও নালন্দার মতো বিখ্যাত বৌদ্ধকেন্দ্রগুলিও পরিত্যক্ত ও জনশূন্য হয়ে গেল। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গোই লোচাবা শোননু পাল বা কুমারশ্রী। তাঁর গ্রন্থে আমরা ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে এই বৌদ্ধকেন্দ্রগুলির চিত্র পাই। ছাগ ছোইজে পাল বা ধর্মশ্রী নামে এক তিব্বতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতের ভারত-দর্শনের কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। ছাগ ছোইজে পালের জন্ম ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে; ১২১৬ খ্রিষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে তিনি ভারতে আসেন। তিরহুত হয়ে তিনি বৈশালীতে এসে পেঁছান। বজ্রাসনে এসে তিনি দেখলেন তুরুস্ক সৈন্যের ভয়ে সকলেই পালিয়েছে। এমন কি বিহারদ্বারগুলিও ইঁট গেঁথে বন্ধ করা হয়েছে। বহু কষ্টে তিনি মহাবোধি মূর্তিদর্শন করলেন। বজ্রাসন পরিদর্শনের পরে নালন্দায় পেঁছে পণ্ডিত রাহুলশ্রীভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি বিশদভাবে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করলেন। কিন্তু গারলোগ বা মুসলমান সৈন্যদল সেখানেও এসে উপস্থিত হল। স্থানীয় শাসক ও প্রজারা সকলেই যখন তাদের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল তখন রাহুল ছাগ ছোইজে পালকেও পালাতে বললেন। নিজে তিনি অতি বৃদ্ধ, নব্বই বৎসর বয়স

তাঁর, স্বভাবতই পালাবার ক্ষমতা তাঁর নেই, কিন্তু ছাগ ছোইজে পাল মূর্খের মত পড়ে আছে কেন ? উত্তরে ছাগ বললেন, যদি মরতে হয় তাও ভালো, তবু গুরুকে তিনি ছেড়ে যাবেন না। শিষ্যের এই আনুগত্যে রাহুল বিশেষ প্রীত হলেন। অবশেষে গুরুকে পিঠে বয়ে ছাগ ছোইজে পাল মহাকালের মন্দিরে এসে আশ্রয় নিলেন। গারলোগরা মহাকালকে ভয় করত, তাই গুরুশিষ্যের কোনোও ক্ষতি তারা করল না। মগধে ছাগের জ্বর হল, জ্বর ছেড়ে গেলে অসুস্থ শরীরে শ্লথ গতিতে তিনি স্বদেশ তিব্বতের পথে ফিরে চললেন।

ঐতিহাসিক গোই লোচাবার মতে দীপংকর ১০40 খ্রিষ্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করেন ; এর পরের দুশো বছরের মধ্যেই নালন্দা ও বুদ্ধগয়ার পতন ঘটে। মধ্যবর্তী এই দুশো বছরে ভারতে বৌদ্ধধর্মের যে রূপান্তর ঘটেছিল, তিব্বতী সূত্র থেকে তার বিবরণ আমরা পাই। ভারতবর্ষ থেকে লোকমুখে যে সব কাহিনী তিব্বতে গিয়ে পেঁছেছিল, সেগুলি বহুক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত হয়েছে ; তার ফলে তিব্বতে সংরক্ষিত এই উপাদানের মধ্যেও তথ্যের চেয়ে অলৌকিক কাহিনীই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

৪। তিব্বত অভিযাত্রী আচার্যদল

অতীতে ভারত থেকে যে বৌদ্ধপণ্ডিতরা তিব্বতে গিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র দাস তাঁদের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় ঊননব্বই জনের নাম আছে। তিব্বতে দীপংকরের পূর্বগামীদের মধ্যে শান্তরক্ষিত, কমলশীল ও পদ্মসম্ভবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তরক্ষিত ও কমলশীল—এই প্রখ্যাত দার্শনিকদ্বয় মহাযান দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। শান্তরক্ষিতের সহযোগী পদ্মসম্ভব সম্পর্কে নানা কাহিনী ও লোককথায় বলা হয়েছে যে তিনি যাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিব্বতের বিখ্যাত সামিয়ে বিহার প্রতিষ্ঠায় শান্তরক্ষিতের সঙ্গে তিনিও উদ্যোগ নেন। ভারতবর্ষে যা চিরতরে লুপ্ত হয়েছে এমন বহু মূল্যবান গ্রন্থ তাঁরা উভয়ে সংগ্রহ করে এই বিহারে সুরক্ষিত করে রেখে গেছেন। কমলশীল চীনা মহাযানী উপাধ্যায়কে বিতর্কে পরাভূত করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে এই আচার্যত্রয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সে-দেশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

পদ্মসম্ভব সম্পর্কে ওয়াডেল বলেছেন, তিব্বতে তিনি বুদ্ধের সমস্থানীয়, এমন কি কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কাছে বুদ্ধের চেয়েও তাঁর সম্মান বেশি। তিব্বতে পদ্মসম্ভব সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তার ফলে সেদেশে তিনি প্রায় অদ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের স্থান অধিকার করেছেন। সেদেশের প্রাচীন পোন-ধর্মের ভূত-প্রেত-যক্ষ-রক্ষের বিরুদ্ধে তন্ত্র-মন্ত্র-যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে তিনি তাদের পরাস্ত ও বশীভূত করেছেন। এ জাতীয় কাহিনীর মূলে কোনো ঐতিহাসিক সত্য থাকলে মানতে হবে, তুক-তাক-মারণ-উচাটনের উপর নির্ভরশীল যে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মকে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছে, পদ্মসম্ভবের কীর্তিকলাপ তাকেই প্রকারান্তরে দৃঢ়মূল করেছে।

দীপংকরের পরে যে ভারতীয় পণ্ডিতরা তিব্বতে এসেছিলেন, তিব্বতের অপর এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক বুতোন তাঁর গ্রন্থে তাদের একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় চন্দ্ররাহুল, পরহিতভদ্র, ভব্যরাজ, সুমতিকীর্তি, অমরচন্দ্র, কুমারকলস, কনকবর্মণ, গয়ধর ও কাশ্মীরের পণ্ডিত জ্ঞানশ্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। বুতোন এঁদের সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেছেন যে এঁরা কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন।

গোই লোচাবা কাশ্মীরের পণ্ডিত শাক্যশ্রীভদ্র সম্পর্কে বলেছেন যে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে আটাত্তর বৎসর বয়সে এই পণ্ডিত তিব্বতে এসেছিলেন, দশ বৎসর তিব্বতে কাটিয়ে ১২১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাশ্মীরে ফিরে যান ও ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শাক্যশ্রীভদ্র তিব্বতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

ঐতিহাসিক সুমপা শাক্যশ্রীভদ্র সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি বিক্রমশীল বিহারের সর্বশেষ আচার্য ছিলেন। বিহারটি ধ্বংস হয়ে যাবার ঠিক আগেই তিনি বিহার ছেড়ে যান। তাঞ্জুর সংকলনে তাঁর রচনাবলী তিব্বতী অনুবাদে সংগৃহীত হয়েছে।

গোই লোচাবা বনরত্ন নামে দীপংকরের পরবর্তী এক আচার্যের কথা বলেছেন। তাঁর জন্মভূমি ছিল পূর্ববঙ্গ। ১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তিব্বতে এসেছিলেন, তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে ভারতীয় আচার্যদের তালিকার 'সর্বশেষ পণ্ডিত' বনরত্ন তিব্বতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

কিন্তু তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এঁদের সবার তুলনায় দীপংকর শ্রীজ্ঞানের স্থান অতি ঊর্ধ্বে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছেন, 'তিব্বতে দীপংকর দেবতাজ্ঞানে পূজিত। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দের যা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি-সভ্যতা—এ সমুদয়ের মূল কারণ তিনিই।'

কিন্তু পদ্মসম্ভব যেভাবে দেবতায় পরিণত হয়েছেন, দীপংকর সে অর্থে দেবত্বলাভ করেননি। ইন্দ্রজাল বা যাদুশক্তিতে নয়, বৌদ্ধধর্মকে সকল কলুষমুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করার গৌরবেই দীপংকর তিব্বতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ব্রোম তোনপা এক স্তোত্রে বলেছেন :

'আপনার মতো প্রসিদ্ধ আচার্যের আগমন ব্যতিরেকেও তিব্বতে হয়তো বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব সম্ভব হত ; কিন্তু এর গূঢ় ও গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণের যে সব ভ্রান্তি ছিল, তা দূর করে আপনি যথার্থ উপদেশ দিয়েছেন, আপনার চরণে প্রণাম।'

সমগ্র তিব্বতে দীপংকরের এই অসামান্য প্রভাব ও বিপুল সাফল্যের পটভূমিকাটি এবারে পর্যবেক্ষণ করা যাক।

শান্তরক্ষিত, কমলশীল, পদ্মসম্ভব প্রমুখ আচার্যরা যখন আসেন, তিব্বতে তখন প্রাচীন 'পোন' (বানানে 'বোন') ধর্মের প্রবল প্রতাপ ; তাঁরা তার তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাছাড়া তার মাত্র একশো বছর আগে তিব্বতে বর্ণলিপির সৃষ্টি হয়েছে। তাই বৌদ্ধধর্মের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার মতো অবস্থা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনগ্রসর

তিব্বতে ছিল না। প্রথম যুগের বৌদ্ধাচার্যদের এই প্রতিকূল পরিবেশে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

দীপংকর যখন তিব্বতে আসেন, তখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রাজশক্তির সমর্থনচ্যুত 'পোন'ধর্ম তখন আক্রমণের ক্ষমতা হারিয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রগতির ফলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম সংস্কারে দীপংকরের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্যকালে ওয়াডেলও অবস্থার এই রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন।

পশ্চিম তিব্বতের রাজা ল্হালামা এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম তখন নানা কুসংস্কারে আবিল হয়ে উঠেছে। ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারত থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণেই ১০৩২ খ্রিস্টাব্দে আচার্য ধর্মপাল তিব্বতে এসেছিলেন। এ বিষয়ে তিব্বতের ঐতিহাসিক সুমপার বক্তব্য অনুসরণ করে শরৎচন্দ্র দাস বলেছেন, প্রাচ্যের প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য ধর্মপাল যখন নেপালে তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন, তখন তিব্বতের রাজা এশেওদ তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ধর্মপাল তিব্বতে রাজগুরুর পদ গ্রহণ করে তিনজন তিব্বতীকে দীক্ষা দেন ও তাঁদের ভারতীয় নামে অভিহিত করে নামের অন্তে 'পাল' শব্দটি যুক্ত করে দেন। গোই লোচাবা তাঁর বিপুলায়তন গ্রন্থে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বহু শাখা-প্রশাখার উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা বলে ধর্মপালের নাম পাওয়া যায়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই শাখা বা তার প্রতিষ্ঠাতার তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই।

রাজা এশেওদের অন্তিম অনুরোধে তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর বংশধরেরা বহু প্রচেষ্টায় দীপংকরকে তিব্বতে আনতে সক্ষম হন। দীপংকরের আগমন ও ধর্মপ্রচার অভিযান খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত তিব্বতকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, সমগ্র তিব্বতকে এক নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে, পরবর্তী সহস্র বৎসরেও সে প্রভাব ম্লান হয়নি। অষ্টাদশ শতকে তিব্বতের ঐতিহাসিক থুকান লোসাং ছোইচি ঞিমা তিব্বতের ধর্মসম্প্রদায়গুলির একটি ইতিহাস রচনা করেছেন। দীপংকর শ্রীজ্ঞান যে তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্রষ্টা এই তথ্যটি সেই গ্রন্থে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

দীপংকরের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিব্বতে কাদমপা নামে বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায় থেকে যথাক্রমে গেলুগপা, কাজুদপা ও সাচাপা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কোনো কোনো ধর্ম-ইতিহাসে গেদনপা বা গেলুগপাকে নব্য কাদমপা বলে অভিহিত করা হয়েছে। দীপংকর শ্রীজ্ঞানের উপদেশগুলির ভিত্তিতে কীভাবে কাজুদপা ও সাচাপা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, ছোইচি ঞিমা তার বর্ণনা দিয়েছেন। কাজুদপা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মারপা যখন দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন তখন তিনি অতীশের প্রত্যক্ষ উপদেশ লাভ করেন। সাচাপা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাচা পণ্ডিত গুরুপরম্পরায় দীপংকরের শিষ্য। দীপংকরের উপদেশাবলীর ভিত্তিতেই এই সম্প্রদায়ের মতবাদ গঠিত হয়েছে।

দীপংকরের প্রভাবে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান শাখাগুলি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, ওয়াডেল তার বর্ণনা দিয়েছেন। ওয়াডেল বলেছেন,

"লাংদারমা-র আক্রমণের পূর্বে বা তার পরের দেড়শো বছরের মধ্যে তিব্বতে কোনো সংগঠিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না।...ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য অতীশের ধর্মসংস্কারের মধ্য দিয়েই তার প্রথম উদ্ভব। নবগঠিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রথম বলতে কাদমপা—এই শাখার সঙ্গে অতীশের নাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে চোংখাপার প্রভাবে শাখাটি গেলুগপা নামে রূপান্তরিত হয়। চোংখাপা স্বয়ং অতীশ বা অতীশের অবতাররূপে কল্পিত। কালক্রমে অতীশের উপদেশাবলীতে যে সংমিশ্রণ ও বিকৃতি ঘটেছিল সেগুলি তিনি বিদূরিত করেন।

"কাদমপা বা গেলুগপা সম্প্রদায় থেকে ক্রমে কাজুদপা ও সাচাপা শাখার উদ্ভব, প্রধানত অতীশের উপদেশাবলীর ভিত্তিতেই এই দুটি শাখার মতবাদ গঠিত। অবশ্য অতীশের প্রচারিত ধর্মের নৈতিক আদর্শ অতি উচ্চস্তরের, ভূত-প্রেত-দানবপূজার সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না। সকলের পক্ষে তাঁর পথ অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না, সেই কারণেই পরবর্তীকালে কাজুদপা ও সাচাপা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।"

মধ্যযুগে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা স্বদেশের ইতিহাস বলতে প্রধানত তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকেই বুঝেছেন। সে যুগে তিব্বতের জাতীয় জীবন ও তার ধর্ম-কর্ম সংস্কারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে অতীশ দীপংকরের অভিনব জীবনকথা। তিব্বতে তাঁর উপস্থিতি ও ধর্ম প্রচারের গুরুত্বের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে প্রথমত সে যুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, দ্বিতীয়ত তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সর্বশেষে তাঁর উপাদেশাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন।

অথচ ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের উৎসাদনের সঙ্গে সঙ্গে অতীশ দীপংকর সম্পর্কে সকল তথ্যও এ দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই এক্ষেত্রেও তিব্বতের সাহিত্য ও ইতিহাসের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিব্বতে সংরক্ষিত এই উপাদানসমূহে যথেষ্ট অতিরঞ্জন ও অলৌকিকতার মিশ্রণ ঘটেছে, তাই এই উপাদান ব্যবহারেও যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন।

৫। তথ্য বিকৃতি

এই প্রসঙ্গে চার্লস বেলের রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। চার্লস বেল এক সময়ে তিব্বতে বৃটিশ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন। অতীশের প্রতি তিব্বতবাসীদের গভীর শ্রদ্ধা দেখে তিনি বলেছেন, "অতীতকাল থেকে বর্তমানেও তিব্বতে অতীশকে সাধারণত 'প্রভু' বা 'মহাপ্রভু' বলে সম্বোধন করা হয়, তাঁর মতো শ্রদ্ধা আর কারো প্রতি দেখানো হয় না।" চার্লস বেল এখানে আরও মন্তব্য করেছেন, ' তিব্বতে যে সব পণ্ডিতরা গিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন বা জড়ো হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আর কেউই অতীশের মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।"

ওয়াডেল কিন্তু বেলের এই "ভিড় জমানো" বা "জড় হওয়া" কথাটি মানেন নি।

তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, "সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে ভারতে মুসলিম অভিযানের গ্রাস থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বৌদ্ধরা দলে দলে দেশ ছেড়ে তিব্বতে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের দ্বারাই লামা ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে—কিন্তু এ কথাটির কোনো ভিত্তি নেই।"

অতীশের তিব্বত আগমন একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। তিব্বতের শাসকদল ও পণ্ডিতবর্গের দীর্ঘদিনের প্রয়াসের ফলেই যে অতীশকে তিব্বতে আনয়ন সম্ভব হয়েছিল, তিব্বতের ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতীশ ভারত থেকে পালিয়ে তিব্বতে বৌদ্ধদের 'ভিড় জমাতে' কোনোমতেই যাননি। শুধু উপরের মন্তব্য নয়; চার্লস বেল আরও চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করেছেন। এর পরে দীপংকরের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি এক আস্ফালনস্ফীত দাম্ভিকের চিত্রই এঁকেছেন। তিব্বতে অন্য পণ্ডিতদের তুলনায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের অহংকার দীপংকর কীভাবে প্রকাশ করেছিলেন, চার্লস বেল তারই বর্ণনা দিতে চেয়েছেন।

তিনি বলছেন, "পশ্চিম তিব্বত থেকে যাত্রা করে অতীশ ক্রমে লাসায় এসে পৌঁছলেন। পশ্চিম তিব্বতে আগত পণ্ডিতবৃন্দের যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে স্থানীয় তিব্বতী পণ্ডিতরা অতীশকে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে অতীশ কার কতটা পাণ্ডিত্য তা জানালেন। যখন তাঁর নিজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হোলো তখন তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে, 'টক্! টক্!' এই বিস্ময়সূচক শব্দ করলেন, বললেন; 'তাঁর গুণাবলী! ওঃ তাঁর গুণাবলী!' এইভাবে তিনি তাদের নির্বাক করে দিয়েছিলেন।"

চার্লস বেলের এই বর্ণনায় মনে হয় অতীশ যেন তাঁর অহমিকা প্রকাশ করে তিব্বতের পণ্ডিতদের বিমূঢ় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিব্বতের কোন্ ইতিহাস থেকে চার্লস বেল এই বিবরণ সংগ্রহ করেছেন? এই প্রসঙ্গে তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন; প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোই লোচাবা শোননুপাল রচিত 'দেব-ঙোন' বা The Blue Annals নামে অনূদিত পূর্বোক্ত সেই সুবৃহৎ গ্রন্থ। যে ঘটনাকে ভিত্তি করে চার্লস বেল এই কাহিনী রচনা করেছেন, গোই লোচাবার গ্রন্থের সেই ঘটনাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। গোই লোচাবা বলেছেন,

"পরে প্রভু (দীপংকর) যখন মধ্য তিব্বতে অবস্থান করছিলেন, তখন ল্হালামা তাঁকে দর্শন করতে এলেন। সেই সময় তিব্বতের পণ্ডিতরা ঙারিতে যে পণ্ডিতরা এর আগে এসেছেন, তাঁদের বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে তাঁর (ল্হালামার) কাছে জানতে চাইলেন। উত্তরে ল্হালামা বললেন, 'অমুক পণ্ডিতের এতটা (জ্ঞান), তমুক পণ্ডিতের অতটা—ইত্যাদি।' যখন তাঁরা অতীশের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন ল্হালামা আকাশের দিকে চোখ তুলে মুখে, 'টক্! টক্!' শব্দ করে বললেন, 'ওঃ, তাঁর পাণ্ডিত্য! ওঃ তাঁর পাণ্ডিত্য!' প্রভুর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য যে বর্ণনার অতীত এইভাবে তিনি জানালেন।"

এই বিবরণে অতীশের প্রতি ল্হালামার গভীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে, অথচ

লুহালামার কথাগুলিকে অতীশের উক্তি বলে চার্লস বেল কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, তা আমাদের জানা নেই।

চার্লস বেল কিন্তু এখানেই নিরস্ত হননি। দীপংকর সম্পর্কে তাঁর নাসিকাকুঞ্চন অন্যত্রও প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসের সাক্ষ্যকে সেখানেও তিনি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। তিব্বতে অতীশের প্রেরণায় সৃষ্ট কাদমপা সম্প্রদায় ও তার প্রভাব সম্বন্ধে চার্লস বেল তাঁর মনোমত ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তাঁর মতে সেই সময়কার বিশেষ পারিস্থিতিতে তিব্বতে একটি বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা কিছু কঠিন ছিল না, অজ্ঞ, অনুন্নত তিব্বতবাসীদের দীপংকর অত্যন্ত সুচতুর কৌশলে তাঁর অতি নিম্নস্তরের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন। এইভাবেই কাদমপা সম্প্রদায় সে দেশের জনজীবনে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছিল।

চার্লস বেল আরও বলেছেন, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সবচেয়ে জঘন্য মতবাদ কালচক্রযানই ছিল অতীশের উপদেশাবলীর ভিত্তি। কিন্তু ভারত থেকে রপ্তানী করা মতবাদ সম্পর্কে তিব্বতবাসীদের স্বভাবতই বিরাগ ছিল। দীপংকর মূলতঃ কালচক্রযানের সমর্থক হলেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও পরিণত বয়সে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ—এই দুটি কারণে সাধারণ বুদ্ধিও তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাই তিনি সুচতুরভাবে তিব্বতবাসীদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

চার্লস বেল বলেছেন, কালচক্রযানই অতীশের উপদেশাবলীর ভিত্তি। অন্য প্রসঙ্গ ছেড়ে তাঁর এই বক্তব্যটি তাহলে বিচার করা যাক।

এখানে বলা দরকার, চার্লস বেল তাঁর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। তিব্বতের ঐতিহাসিক সাহিত্যে, অতীশের জীবনী-পুস্তকগুলিতে এবং সর্বোপরি অতীশ দীপংকরের পরিণত বয়সের রচনাসমূহেও এই ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কালচক্রযান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ অবশ্য এখানে নেই। কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রতি দীপংকরের প্রকৃত মনোভাব কী ছিল, সংক্ষেপে সে আলোচনা করা যেতে পারে।

চার্লস বেল গোই লোচাবার রচনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। গোই লোচাবা তাঁর গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে কালচক্রযান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং ভারত ও তিব্বতে এই মতবাদের যে বহুল শাখা-প্রশাখা দেখা দিয়েছিল সেগুলির ও তার গুরু-শিষ্য পরম্পরার একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। দীপংকর শ্রীজ্ঞান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। দীপংকর শ্রীজ্ঞান যদি সত্যই কালচক্রযানী হতেন, তাহলে মানতে হবে যে তিব্বতের এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক সে কথা বিন্দুমাত্রও জানতেন না। এ সম্ভাবনা একান্তই অবিশ্বাস্য।

অপরপক্ষে অতীশ দীপংকরের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত কাদমপা সম্প্রদায়ের মতবাদ ও আচার-আচরণ থেকে আমরা অতীশের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে অতীশ প্রকৃত-পক্ষে প্রাসঙ্গিক-মাধ্যমিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কাদমপা সম্প্রদায়ের 'মূল ষট্‌গ্রন্থ'?

বলে যে ছয়টি গ্রন্থ নির্দিষ্ট, সেগুলির সঙ্গে কালচক্রযানের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, সেই গ্রন্থগুলি বিশুদ্ধ মহাযান ধর্মমতের সুবিখ্যাত শাস্ত্রাবলী রূপেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। দীপংকর যদি সত্যই কালচক্রযানী হতেন, তাহলে এই গ্রন্থগুলি তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের জন্য মূলশাস্ত্র বলে নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট হত না।

এই প্রসঙ্গে দীপংকরের প্রধান রচনাগুলি অনুধাবন করলেও চার্লস বেলের মন্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হবে। স্থান সংক্ষেপের জন্য এখানে তিব্বতী সূত্র থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতিমাত্র উল্লেখ করা গেল।

দীপংকরের সর্বপ্রধান রচনা 'বোধিপথপ্রদীপ'—এই গ্রন্থে কোনো বিকৃত তান্ত্রিক মতবাদ প্রচারের পরিবর্তে তিনি তান্ত্রিক চর্যা বা আচরণ সম্পর্কে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন; বলেছেন:

"ব্রহ্মচারীদের গুহ্যজ্ঞানাভিষেক গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ তা আদিবুদ্ধমহাতন্ত্রে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

এই অভিষেক গ্রহণ করলে নিষিদ্ধ আচরণ হবে এবং তপঃসম্বর থেকে ব্রহ্মচারীর পতন ঘটবে।

সেই ব্রতীর মহাপাতক পতন হবে, নিশ্চিতই তার দুর্গতিপতন হবে এবং কখনই সিদ্ধিলাভ হবে না।"

বাংলার নয়পাল ও পশ্চিম তিব্বতের জনছুবওদ—এই দুই খ্যাতনামা নৃপতির গুরু হবার বিরলগৌরব দীপংকর অর্জন করেছিলেন। তিব্বত যাত্রাপথে নেপাল থেকে তিনি রাজা নয়পালের কাছে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ এক পত্র প্রেরণ করেন। এই বহুখ্যাত পত্রটিই 'বিমলরত্নলেখনাম'। রাজভিক্ষু জনছুবওদের সনির্বন্ধ অনুরোধে দীপংকর তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বোধিপথপ্রদীপ' রচনা করেন।

নয়পালকে তিনি লিখেছিলেন:

"তোমার নিজের যা দোষ তার প্রতি চক্ষুষ্মানের মতই ব্যবহার কর, কিন্তু অন্যের দোষ সম্পর্কে অন্ধ হও।

ঔদ্ধত্য ও অহমিকা ত্যাগ করে সর্বদা শূন্যতা ধ্যান কর। আপন দোষ প্রচার কর, অন্যের ভুল-ত্রুটি সন্ধান কোরো না।

অপরের গুণাবলী প্রচার কর, নিজের গুণগুলি গোপন রাখ। মুনাফা এবং দান গ্রহণ কোরো না। শঙ্কা পরিহার কর। মৈত্রী ও করুণা ধ্যান কর। বোধিচিত্ত দৃঢ় কর। দশ অকুশলকর্ম বর্জন কর।...আকাঙ্ক্ষা খর্ব কর। ধর্মপথে কাজ করবে, এ কথা স্মরণে রেখো।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সমগ্র লিপিটি এই ধরনের নৈতিক উপদেশমালার সংকলনমাত্র।

'বোধিপথপ্রদীপ'-এর মূল সুরটিও এই নৈতিক পবিত্রতার বাণীপ্রচার:

"ব্রহ্মচর্য প্যলনপূর্বক পাপ ও কাম পরিহার করে শীলসম্বরে সন্তোষলাভ কর এবং বুদ্ধশিক্ষায় ব্রতী হও।

স্বয়ং সত্বর বোধিপ্রাপ্ত হবার জন্য উৎসুক হবে না। একটি প্রাণীর জন্য (হলেও)

সংসারের যতদিন অস্তিত্ব আছে, ততদিন সেখানে বাস করবে।

কায়বাক্‌চিত্তের সকল কর্ম পরিশুদ্ধ কর। অকুশল কর্মে কখনও প্রবৃত্ত হবে না।"

উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-নিরক্ষর, ভিক্ষু-গৃহস্থ নির্বিশেষে তিব্বতের সর্বসাধারণের কাছে অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান একটি বাণীই প্রচার করেছেন, সে বাণী সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণার বাণী। তিনি তাদের যে উপদেশ দিয়েছেন, তার মূল কথা হল : উচ্চ ধর্মাদর্শপূর্ণ জীবনযাপন কর। বিশুদ্ধ মহাযান মতবাদ সর্বভাবে অনুসরণ কর। তাঁর সকল রচনাবলীতেও মূলত এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে।

তাছাড়া দীপংকর সম্পর্কে তিব্বতের সর্বত্র প্রচুর জনপ্রবাদ ছড়িয়ে আছে। সেগুলি সে দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্যে পরিণত। ইতিহাস রচনার উপকরণরূপে তিব্বতের পণ্ডিতরা এ জাতীয় উপাদান প্রায়শ ব্যবহারও করেছেন। দীপংকর সম্পর্কে লিখিত-অলিখিত লোকশ্রুতি থেকে একই সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

একদা এক ভিক্ষুণী দীপংকরকে এক বহুমূল্য উপহার নিবেদন করেন, দীপংকর তাঁকে উপদেশ দেন :

"রুগ্ন ও শ্রান্ত ব্যক্তির সেবা, পিতা-মাতা ও বার্ধক্যগ্রস্তের পরিচর্যাই প্রকৃত ধর্ম; বোধিচিত্ত ও শূন্যতা-ধ্যান করে যে পুণ্য লাভ হয়, এই সেবার মধ্য দিয়ে সেই পুণ্যই তুমি লাভ করবে।"

দীপংকর যখন তিব্বতে আসেন তখন তিব্বতের সর্বজনমান্য পণ্ডিত লোচাবা রিনছেন সাংপো বা রত্নভদ্রের পঁচাশি বৎসর বয়স। জ্ঞানগর্বে গর্বিত এই বৃদ্ধ পণ্ডিতের অহমিকা দীপংকর প্রথম দর্শনেই চূর্ণ করেন। দীপংকর তাঁকে সম্বোধন করে বলেন :

"হে মহান লোচাবা! এই ভবসংসারের ক্লেশ দুঃসহ, প্রাণীমাত্রের হিতের জন্য প্রত্যেকেরই প্রয়াস করা উচিত। (অতএব) এখন আপনি অনুগ্রহ করে ধ্যানাভ্যাস করুন।'

দীপংকরের এই উপদেশের ফলে তিব্বতের ওই বিখ্যাত পণ্ডিতের জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিব্বতের ঐতিহাসিকেরা সকলেই একথা বলেছেন।

একদা এক তরুণ ভিক্ষু বিশেষ উপদেশলাভের জন্য দীপংকরের কাছে আসেন, দীপংকর তাঁকে বলেন :

"সাংসারিক বিষয়াদি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে স্পর্শ করবে ততক্ষণ তুমি বিহারে বাস করলেও, 'আমি ভিক্ষু, আমি মঠবাসী'—এ কথা উচ্চারণ কোরো না।

পার্থিব বাসনা-কামনা ও অন্যের ক্ষতিকারক চিন্তা যতক্ষণ তুমি হৃদয়ে পোষণ করবে, ততক্ষণ বোলো না,' আমি ভিক্ষু, আমি মঠবাসী।"

দীপংকরের ধর্মীয় মতবাদের নিদর্শন হিসাবে এই ধরনের বহু উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

৬। নাম প্রসঙ্গে

ভারতবর্ষ ও তিব্বতে দীপংকর একাধিক নামে খ্যাত। আমাদের দেশের ধর্মীয় ইতিহাসে নামকরণের এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য নতুন নয়। পৌরাণিক কৃষ্ণের তাই শতনাম; দীপংকরের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করে চৈতন্যদেবও এমনি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের আদিনাম বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাসদীক্ষাদান কালে গুরু কেশবভারতী তাঁর নামকরণ করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য বা শুধুমাত্র চৈতন্য। বৃহৎ বৈষ্ণবসমাজে তাঁর বিশ্বম্ভর নামটি প্রায় বিস্মৃত, প্রভু বা মহাপ্রভু নামেই তিনি পরিচিত। মহাপ্রভু বলতে বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্যকেই জানে।

দীপংকরেরও আদিনাম চন্দ্রগর্ভ। তাঁর প্রথম দীক্ষা-গ্রহণকালীন নাম গুহ্য-জ্ঞানবজ্র। নামটি তান্ত্রিক—প্রথমজীবনে দীপংকর যে তন্ত্রমতে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তারই পরিচায়ক। দীপংকরের পরবর্তী জীবনের বিবরণে কিন্তু এই দুটি নামের আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ কালে তাঁর দীক্ষানাম হয় দীপংকর এবং এই নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। বিশ্বম্ভর যেভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে পরিণত হলেন, ক্রমে চন্দ্রগর্ভও সেইভাবে দীপংকর নামে খ্যাতিলাভ করলেন।

আমরা জানি দীপংকর এক অতীত বুদ্ধের নাম, বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ ভক্তিপূত এই নামটি আমাদের অতীশ ছাড়াও একাধিক বৌদ্ধভিক্ষু গ্রহণ করেছেন। এই নামকরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন, "ইতিহাসে যে বুদ্ধের নাম আমরা পাই তিনি শাক্যমুনি, তারও বহুপূর্বে দীপংকর নামে এক বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন।······আমাদের অতীশ ভবিষ্যতে বিরাট পণ্ডিত হবেন এই ধারণাতেই তাঁর দীপংকর নামের সঙ্গে শ্রীজ্ঞান যুক্ত করা হয়েছিল।"

রাহুলজীর এই ব্যাখ্যা আমরা কোনো তিব্বতী সূত্রে পাই নি, এবং তিনিও এ বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য উল্লেখ করেন নি। তবে দীপংকর শ্রীজ্ঞান এই সম্পূর্ণ নামটি দীপংকরের দীক্ষাকালের নাম কিনা, সে প্রশ্নের সদুত্তর এখানে নেই।

দীপংকরের প্রধান শিষ্য ব্রোম তোনপা বা জয়াকর তাঁর স্তোত্রে দীপংকরের বিভিন্ন নাম উল্লেখ করে বলেছেন, "আর্য দেশে তিনি দীপংকর নামে পূজিত হতেন।" সাধারণভাবে "দীপংকরশ্রী" বলে তিনি গুরু সম্বোধন করেছেন।

তাঞ্জুরে অতীশের নাম বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যথা—

দীপংকর
শ্রীদীপংকর
দীপংকরজ্ঞান
দীপংকর জ্ঞানপাদ
শ্রীদীপংকর জ্ঞান ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সেখানে আবার একই গ্রন্থে তাঁর নাম বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, 'কায়বাক্‌চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠা নাম' গ্রন্থের লেখক শ্রীদীপংকরজ্ঞান ও তার অনুবাদকদ্বয়

উপাধ্যায় দীপংকর এবং জ্যা লোচাবা চোনডুই সেংগে বা বীর্যসিংহ। গ্রন্থটি বিক্রমশীল বিহারে রচিত এবং তিব্বতী অনুবাদক চোনডুই সেংগে দীপংকরের শিষ্যরূপে বিক্রমশীল বিহারে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীদীপংকরজ্ঞান ও তার অনুবাদক উপাধ্যায় দীপংকর একই ব্যক্তি। 'চর্যাগীতি' ও 'চর্যাগীতি-বৃত্তি'-র লেখকরূপে পণ্ডিত দীপংকর এবং অনুবাদকরূপে গ্রন্থকার ও নাগছো লোচাবার নাম আছে। 'ধর্মধাতু দর্শন-গীতি' নামে গ্রন্থটি তাঞ্জুরে দুবার লিপিবদ্ধ হয়েছে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির পুনর্মুদ্রণ মাত্র। প্রথমটিতে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের নাম গ্রন্থকার বলে উল্লিখিত হয়েছে। 'বজ্রযোগিনী স্তোত্র'-এর পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, পণ্ডিত দীপংকর লিখিত এবং উক্ত পণ্ডিত এবং লোচাবা রিনছেন্ সাংপো কর্তৃক অনূদিত।

এইভাবে তাঞ্জুরে সংরক্ষিত গ্রন্থাবলীতে—দীপংকর, শ্রীদীপংকর, দীপংকরজ্ঞান ইত্যাদি নামে—বহুভাবেই অতীশ উল্লিখিত হয়েছেন। দীপংকরের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'বোধিপথপ্রদীপ', গ্রন্থটির ভাষ্যের নাম 'বোধিমার্গপ্রদীপ-পঞ্জিকা'। এই ভাষ্যের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, "এই কালের বুদ্ধের প্রতিভু দীপংকরশ্রী বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।······ভারতীয় মহাপণ্ডিত গুরু বোধিসত্ত্ব বাঙালী শ্রীদীপংকর জ্ঞানপাদ এবং লোচাবা ছুলঠিম জলবা কর্তৃক অনূদিত ও সংশোধিত।"

অতীশের নাম তাঞ্জুরে দুভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তিব্বতী হরফে ভারতীয় নামটি লিখিত হয়েছে কিংবা তিব্বতী ভাষায় মূল নামটির আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় অনুবাদের নমুনা—

মরমেজদ : অর্থে দীপংকর
পাল মরমেজদ : অর্থে শ্রীদীপংকর
মরমেজদ য়েশে : অর্থে দীপংকরজ্ঞান
মরমেজদ পালয়েশে : অর্থে দীপংকর শ্রীজ্ঞান।

এ ছাড়াও আমরা আগেই বলেছি যে বিশুদ্ধ তিব্বতী প্রথায় দীপংকরকে জোবো বা জোবোজে অর্থে প্রভু এবং জোবো ছেনপো অর্থে মহাপ্রভুও বলা হয়। কখনও বা তিব্বতী হরফে কেবলমাত্র "অতীশ" বলেও অভিহিত করা হয়। এগুলির কিন্তু কোনোটিই তাঁর প্রকৃত নাম নয়, সম্মানসূচক অভিধামাত্র। দীপংকরের জীবিতকালেই তাঁর "অতীশ" নামটি তিব্বতে ও মোঙ্গলিয়ায় বহুল প্রচারিত হয়েছিল।

ব্রোম তোনপা তাঁর স্তোত্রে বলেছেন :

"তুষিত স্বর্গে যিনি বিমল আকাশ নামে
আর্য দেশে যিনি দীপংকর নামে
হিমদেশে (হিমবন্ত বা তিব্বতে) যিনি
শ্রীমৎ অতীশ নামে সর্বত্র পূজিত—
তাঁর চরণে প্রণিপাত।"

দীপংকরের অতীশ নামকরণ তাঁর দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে বা পরে ঠিক কখন হয়েছিল তিব্বতী সাহিত্যে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। তিব্বতীবিশেষজ্ঞ

জাস্কির মতে নামটি সংস্কৃত। মহাপ্রভু, জোবোজে এবং অতি+ঈশ বা অতীশ সমার্থক শব্দ। তিব্বতী অনুবাদে ফুলজুং বা ফুলতুজুংবা অর্থে সর্বগুণান্বিত; শরৎচন্দ্র দাস ও জাস্কি উভয়েই শব্দটির এই অর্থ করেছেন। তিব্বতে একটি শিলালিপিতে এই শব্দটি পেয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ফ্রাকে শিলালিপিটি দীপংকরের নামাংকিত বলে ঘোষণা করেন।

দীপংকরের "অতীশ" নামটি কিন্তু তিব্বতে বা মোঙ্গলিয়ায় প্রচলিত হবার পূর্বেই ভারতেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'অতীশের জীবনী' থেকে জানা যায়, বিক্রমশীল বিহারে একটি ভিখারী বালক দীপংকরকে "বাবা অতীশ" বলে সম্বোধন করেছিল। বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি ধ্বংসস্তূপকে "অতীশের ভিটা" বলে স্মরণ করা হয়, এ উল্লেখ আমরা আগেই করেছি।

মোঙ্গলীয়রা দীপংকরের নামের অনুবাদ করেছেন—

জোল : অর্থে দীপ

বদরাগাছি : অর্থে কর।

কিন্তু অতীশ নামটির ব্যবহারই মোঙ্গলিয়ায় বেশি। দীপংকরের রচনাবলীর মোঙ্গলীয় অনুবাদে অতীশ নামটিই সাধারণভাবে উল্লিখিত হয়েছে। মোঙ্গলিয়ায় অতীশ বলতে একমাত্র দীপংকরকেই বোঝায়। দীপংকরের রচনাবলীর অনুসন্ধানের কাজে এই তথ্যটি বিশেষ মূল্যবান। তাঞ্জুরে সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর পুষ্পিকায় কোথাও হয়তো লেখক বা অনুবাদকের নাম স্পষ্ট করে দেওয়া নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে মোঙ্গলীয় অনুবাদে যদি আমরা অতীশের নাম পাই তাহলে সেই গ্রন্থটি যে দীপংকরের সঙ্গে কোনোভাবে সংপৃক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

৭। একাধিক দীপংকর?

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঞ্জুরের গ্রন্থতালিকার ভিত্তিতে অনুমান করেছেন, দীপংকর দুজন এবং এই দুজনের রচনাই তাঞ্জুরে আছে। এঁদের একজনকে কখনও বাঙালী কখনও বা ভারতীয় বলা হয়েছে ও তাঁর নামের সঙ্গে মহাচার্য, পৈণ্ডপাতিক প্রভৃতি যোগ করা হয়েছে। অপরজনকে বাঙালী বা ভারতীয় বলে উল্লেখ করা হয়নি ও তাঁর নামের সঙ্গে আচার্য, পণ্ডিত, উপাধ্যায় প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত অভিধা ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাই মনে করেছেন তাঞ্জুরে দুজন দীপংকরের গ্রন্থাবলী স্থান পেয়েছে, এঁদের মধ্যে একজন মহাপণ্ডিত, বাংলাদেশ থেকে তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন; আর অন্যজন অত খ্যাতিমান নন।

এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে তাঞ্জুরে গ্রন্থকার ও অনুবাদক সম্পর্কে বিশেষণ ব্যবহারে যেন একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তাঞ্জুর অনুসন্ধান করলে কিন্তু আমরা বিপরীত সংবাদই পাবো। সেখানে কোন গ্রন্থশেষে লেখক বা অনুবাদকের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, কোথাও বা কিছুই বলা হয়নি, কেন দেওয়া হয়নি তার

কারণও বলা হয়নি। যেমন 'মধ্যমক উপদেশ নাম' গ্রন্থটি তাঞ্জুর তিনবার লিপিবন্ধ হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রথমটির অবিকল প্রতিলিপি মাত্র। প্রথমটির লেখক মহাচার্য শ্রীদীপংকরজ্ঞান, অন্য দুটির লেখক আচার্য শ্রীদীপংকরজ্ঞান। তাঞ্জুরে দীপংকরের নাম যে কতভাবে লিপিবন্ধ হয়েছে, এখানে তার একটি আংশিক তালিকা দেওয়া হল :

আর্যতারা স্তোত্র : দীপংকর শ্রীজ্ঞান
কায়বাক্‌চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠানাম : শ্রীদীপংকরজ্ঞান
আর্য অচল ক্রোধরাজস্তোত্র : পণ্ডিত দীপংকরজ্ঞান
চর্যাগীতি বৃত্তি : পণ্ডিত দীপংকর
অক্ষোভ্যসাধন নাম : আচার্য দীপংকরশ্রীজ্ঞান
পঞ্চচৈত্য নির্বপণ বিধি : ভারতীয় উপাধ্যায় দীপংকর শ্রীজ্ঞান
অষ্টভয় ত্রাণ : আচার্য পণ্ডিত শ্রীদীপংকর জ্ঞান
অভিসময় বিভঙ্গ নাম : মহাপণ্ডিত দীপংকরশ্রীজ্ঞান
বজ্রাসন বজ্রগীতি : মহাপণ্ডিত শ্রীদীপংকরজ্ঞান
বোধিপথপ্রদীপ : মহাচার্য শ্রীদীপংকরজ্ঞান
চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ : আচার্য মহাপণ্ডিত শ্রীদীপংকরজ্ঞান
বিমলরত্নলেখ নাম : স্থবির মহাপণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তাঞ্জুরে সংরক্ষিত যে উনআশিটি গ্রন্থের একই সঙ্গে গ্রন্থকার ও অনুবাদকরূপে দীপংকরের নাম আমরা পাই, তাদের পুষ্পিকাতেও এই ধরনের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরে প্রদত্ত প্রতিটি গ্রন্থের তিব্বতীয় ও মোঙ্গলীয় গ্রন্থসূচীতে গ্রন্থকাররূপে জোবোজে বা অতীশের নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাঞ্জুর ও কোর্দিয়ে-র গ্রন্থতালিকার এই সাক্ষ্য থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই গ্রন্থগুলিতে গ্রন্থকারের ভারতীয় নাম যে ভাবে এবং যত বিশেষণেই ভূষিত হোক না কেন, ইনি অবশ্যই আমাদের আলোচ্য দীপংকর।

তাঞ্জুরের সাহায্যে আমরা আর এক ভাবে আমাদের আলোচ্য দীপংকরের সন্ধান পেতে পারি। তাঞ্জুর গ্রন্থতালিকায় প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদকের নামও লিপিবন্ধ আছে। তাই দীপংকরের সঙ্গে যে তিব্বতী পণ্ডিতরা লোচাবা বা অনুবাদকের কাজ করেছেন, তাদের পরিচয়ের সূত্র ধরেও এই অনুসন্ধান সম্ভব। এঁদের মধ্যে কয়েক-জন লোচাবা আমাদের বিশেষ পরিচিত, যেমন নাগছো ছুলঠিম জলবা অর্থে জয়-শীল, জ্যা চোনডুই সেংগে অর্থাৎ বীর্যসিংহ। এঁরা দুজনেই দীপংকরের শিষ্যরূপে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। মহাপণ্ডিত রিনছেন সাংপো বা রত্নভদ্র, পঁচাশি বৎসর বয়সে ইনি দীপংকরের শিষ্য হন এবং তাঁর সঙ্গে অনুবাদকের কাজ করেন। রত্নভদ্র বহু ভারতীয় আচার্যের উপদেশ লাভ করলেও এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় কোন দীপংকর ছিলেন না।

দীপংকরের নাম এই বিখ্যাত লোচাবাদের সঙ্গে কত বিভিন্নভাবে তাঞ্জুরে স্থান পেয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।

'অভিসময় অলংকার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ শাস্ত্রবৃত্তি দুর্বোধ আলোক নাম টীকা' : ভারতীয় উপাধ্যায় পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও মহালোচাবা ভিক্ষু রিনছেন সাংপো কর্তৃক অনূদিত।

'আর্য সহস্রভুজ অবলোকিতেশ্বর সাধন' : ভারতীয় উপাধ্যায় মহাপণ্ডিত দীপংকর-শ্রীজ্ঞান এবং লোচাবা ভিক্ষু রিনছেন সাংপো কর্তৃক অনূদিত।

'একবীর সাধন নাম' : আর্য দীপংকর এবং লোচাবা নাগছো ছুলঠিম জলবা কর্তৃক অনূদিত।

'চক্র উপদেশ নাম' : ভারতের পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান এবং জ্যা লোচাবা চোনডুই সেংগে কর্তৃক অনূদিত। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শাস্ত্রীমহাশয় যে যুক্তিবলে দুজন দীপংকরের অস্তিত্ব ধরে নিয়েছিলেন, তাঞ্জুরের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই তার পরিবর্তে কি দীপংকর নামে কয়েকজন ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতের সন্ধান আমরা পাই? এ সম্পর্কে সুশীলকুমার দে বলেন, "দীপংকর শ্রীজ্ঞান ছাড়াও তাঞ্জুরে দীপংকর, দীপংকরচন্দ্র, দীপংকরভদ্র এবং দীপংকররক্ষিতের বহু সংখ্যক গ্রন্থ আছে, এঁরা সকলে নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি নন।" কিন্তু ডঃ দে হয়তো লক্ষ্য করেন নি, তাঞ্জুরে এই নামগুলি ছাড়াও দীপংকরকীর্তি, দীপংকররাজ এবং দীপংকরজ্ঞানপাদের নামেও গ্রন্থ আছে। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিংবা এঁদের মধ্যে কোনজন একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন, সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করা কঠিন।

তাঞ্জুরের তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করবার আগে এ বিষয়ে তিব্বতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোই লোচাবার মন্তব্য অনুধাবন করা যাক। তিনি বলছেন :

"দীপংকর নামে এক অলৌকিক শক্তিধর বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন। তিনি শূদ্রজাতীয় ছিলেন এবং কোংকন বনের (গুন্টুর জেলার) আচার্য রক্ষিতপাদের শিষ্য ছিলেন। ব্রাহ্মণ গুহ্যপরত (? পত্র), ক্ষত্রিয় মঞ্জুশ্রী, বৈশ্য পূর্ণভদ্র এবং শূদ্র কর্ণপুত্র এবং আলোকী ও দুঃশীলা নামে দুজন বারনারী—এরা সকলেই তাঁর ধর্মসঙ্গী ছিলেন।"

গোই লোচাবা বর্ণিত এই "শূদ্রজাতীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক" দীপংকর কোনো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কিনা এবং সেই রচনা তাঞ্জুরে স্থান পেয়েছে কিনা, এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে গোই লোচাবার গ্রন্থের এই সংবাদের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে কোনো গ্রন্থে দীপংকর নামটি দেখলেই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পেলে তিনি যে আমাদের দীপংকর, সে সিদ্ধান্ত করা চলবে না।

এবারে তাহলে আমাদের আলোচ্য দীপংকরের পরিচয় উদ্ধারের জন্য তাঞ্জুরের সাক্ষ্য পুনর্বিচার করা যাক।

আমরা আগেই বলেছি তাঞ্জুরে যে সকল গ্রন্থে দীপংকরের নামের সঙ্গে তিব্বতীতে

'জোবোজে' বা—মোঙ্গলীয় গ্রন্থসূচীতে 'অতীশ'-এর নাম আছে সেই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহেই আমাদের অতীশের বা দীপংকরের। সেই ধরনের কয়েকটি মাত্র গ্রন্থের নাম এখানে দেওয়া হল :

ধর্মধাতু দর্শনগীতি : গ্রন্থকার মহাচার্য দীপংকর
একবীর সাধন : অনুবাদক আর্য দীপংকর
বোধিসত্ত্ব চর্যাবতার পিণ্ডার্থ : অনুবাদক উপাধ্যায় দীপংকর
বোধিসত্ত্ব চর্যাবতার ষট্‌ত্রিংশৎ পিণ্ডার্থ : অনুবাদক পণ্ডিত দীপংকর
বজ্রযোগিনী স্তোত্র : লেখক পণ্ডিত দীপংকর ; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটিতেই জোবোজে ও অতীশের নাম আছে এবং অনুবাদক ও সহ-অনুবাদকগণও পরিচিত লোচাবা ছুলঠিম জলবা, চোনডুই সেংগে, রিনছেন সাংপো প্রভৃতি। তাই দীপংকরের নামের সঙ্গে বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহৃত হলেও ইনি আমাদেরই দীপংকর ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন না।

কেবলমাত্র তাঞ্জুরেই নয়, তিব্বতের বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা—গোই লোচাবা শোননুপাল বা কুমারশ্রী প্রভৃতি—তাঁদের গ্রন্থে দীপংকরকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন। গোই লোচাবা তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে অতীশকে বোঝাতে শুধু দীপংকর নামটিও ব্যবহার করেছেন।

তাঞ্জুরে মরমেজদ সাংপো বা দীপংকরভদ্র নামে এক আচার্যের উনচল্লিশটি তান্ত্রিক গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। এখানে ত্রিশটি গ্রন্থের শেষে রচয়িতার নাম দীপংকরভদ্র বলে উল্লিখিত হয়েছে, কোথাও কোথাও নামের সঙ্গে আচার্য বা মহাচার্য যুক্ত হয়েছে, বাকি নয়টি গ্রন্থে শুধুমাত্র দীপংকর বা শ্রীদীপংকর বলে গ্রন্থকারের নাম আছে।

তাঞ্জুরে এই উনচল্লিশটি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র তিনটিতে অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়, কোনটিতেই দীপংকরভদ্র অনুবাদক নন। তিনি নিজে বা তিব্বতী কোন লোচাবার সহায়তায় কোন গ্রন্থ অনুবাদ করেন নি, তিনি কখনও তিব্বতে যান নি। তিনি যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, এই গ্রন্থগুলি তার নিদর্শন। তবে তিনি যে আমাদের দীপংকরের বহু পূর্ববর্তী—তিব্বতের ঐতিহাসিকরা সে সংবাদ বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন।

গুহ্যসমাজ তন্ত্রে সুপণ্ডিত বুদ্ধশ্রীজ্ঞান প্রসঙ্গে গোই লোচাবা বলছেন, "বুদ্ধ-শ্রীজ্ঞানের আঠারোজন সুযোগ্য শিষ্যের মধ্যে চারজন—দীপংকরভদ্র, প্রশান্তমিত্র, রাহুলভদ্র, ও মহাসুখতাবজ্র।"

গুহ্যসমাজ তন্ত্রের ঐতিহ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে গোই লোচাবা অন্যত্র বলেছেন, "এই দীক্ষিতকুলের কয়েকজন ছিলেন—মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানপাদ (বুদ্ধ জ্ঞানপাদ), দীপংকরভদ্র, আনন্দগর্ভ, থগন, শান্তিপা, শ্রদ্ধাকর ও পদ্মাকর।"

বুদ্ধশ্রীজ্ঞান ও তাঁর শিষ্য দীপংকরভদ্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক তারনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গোই লোচাবা ও তারনাথ উভয়েই বুদ্ধশ্রীজ্ঞানকে ধর্মপালের সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন। দীপংকরভদ্র বুদ্ধশ্রীজ্ঞানের সাক্ষাৎ শিষ্য। ধর্ম-

পালের রাজ্যকাল ৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দ হলে দীপংকরভদ্র অবশ্যই দীপংকর শ্রীজ্ঞানের পূর্ববর্তী। সুমপা বিক্রমশীল বিহারের স্থবিরদের একটি তালিকা দিয়েছেন, সেখানে বলেছেন, বুদ্ধশ্রীজ্ঞানের পরেই দীপংকরভদ্র এই বিহারের স্থবির হয়েছিলেন।

দীপংকরচন্দ্র নামে এক ভারতীয় পণ্ডিতের নাম তাঞ্জুরে বোধিগর্ভের 'শ্রীহেবজ্র নাম সাধন' গ্রন্থের অনুবাদকদের তালিকায় পাওয়া যায়। তিব্বতী সূচীতে এঁকে দীপংকররাজ বলা হয়েছে। কোর্দিয়ে-র গ্রন্থতালিকা ও তাঞ্জুরের পিকিং সংস্করণের পুষ্পিকা অনুসারে তিব্বতের প্রতাপশালী সম্রাট মুনিরাজ বা লুহাচানপো মুনেরাজ এই গ্রন্থের অন্যতম লোচাবা বা অনুবাদক ছিলেন। ইনি সম্ভবত ঠিস্রোং দেচান-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। গোই লোচাবার মতে সতেরো মাস রাজ্যশাসনের পরে ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বৎসর বয়স্ক এই তরুণ রাজাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়।

• রাজা ঠিস্রোং দেচান-এর রাজত্বকাল ৭৫৫-৭৮০ খ্রিস্টাব্দ। তিব্বতে তাঁর প্রেরণা ও আনুকূল্যে ভারতীয় গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ হয়। তাঁর বংশধর রলপাচনের মৃত্যু পর্যন্ত (৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ) এই ধারা বিশেষ প্রবল ছিল। তিব্বতের রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ এই শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদেও অংশ নিয়েছেন। সন তারিখের হিসাব থেকে দেখা যায়, মুনেচানপো যে ভারতীয় পণ্ডিত দীপংকরচন্দ্র বা দীপংকররাজের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তিনি আমাদের দীপংকরের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ববর্তী। মুনেচানপো, মুনেরাজ বা মুনিরাজ ভারতে আসেন নি, সম্ভবত এই ভারতীয় পণ্ডিতই তিব্বতে গিয়েছিলেন।

তাঞ্জুরে দীপংকরকীর্তি, দীপংকররক্ষিত ও শ্রীদীপংকরজ্ঞানপাদের রচনা পাওয়া যায়। তাঞ্জুরের তথ্যপ্রমাণ বিচার করে আরও জানা যায় যে দীপংকরকীর্তি সম্পর্কে সংশয় থাকলেও দীপংকররক্ষিত ও শ্রীদীপংকরজ্ঞানপাদ আসলে দীপংকরশ্রীজ্ঞানেরই নাম।

বক্তব্য সংক্ষেপের জন্য দু'একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাক। 'বোধিমার্গ প্রদীপ পঞ্জিকা' নাম গ্রন্থটির রচয়িতা বাঙালী দীপংকরশ্রীজ্ঞান অথবা দীপংকরশ্রীপাদ। গ্রন্থটি জোবোজে রচিত 'বোধিমার্গপ্রদীপ' গ্রন্থের ভাষ্য। অনুবাদক শ্রীদীপংকর-জ্ঞানপাদ ও লোচাবা নাগছো ছুলঠিম জলবা। এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহেই আমাদের দীপংকর বা জোবোজে অতীশের।

তাঞ্জুরে দীপংকররক্ষিতের নাম একাধিকবার পাওয়া যায়। তাঞ্জুর গ্রন্থাবলীতে আচার্য জয় রচিত 'প্রমাণ বার্তিক অলংকার টীকা' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ আছে। থোলিং-এর অনুপম নিরাভোগ বিহারে বিক্রমশীলের ভারতীয় উপাধ্যায় শ্রীদীপংকর রক্ষিত ও মহালোচাবা সাংস্থং-এর বনদে জনছুব শেরব গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। তিব্বতরাজ শাক্যভিক্ষু শিবাওদের অনুরোধে এই অনুবাদ সম্পন্ন হয়। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব তিব্বতের ইতিহাসে দীপংকরের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকরূপেই রাজা শিবাওদ খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঞ্জুর গ্রন্থাবলীর পুষ্পিকাগুলিতে এই বক্তব্যের সমর্থনে বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় দেখা গেল যে তাঞ্জুরে অতীশ দীপংকরের নাম দীপংকর-পাদ, দীপংকরজ্ঞানপাদ ও দীপংকররক্ষিত ইত্যাদি বিভিন্নভাবে লিপিবন্ধ হয়েছে। তাছাড়া দীপংকরচন্দ্র বা দীপংকররাজ অতীশ দীপংকরের পূর্ববর্তী। তবে পূর্ববর্তী তান্ত্রিক লেখক দীপংকরভদ্র ও অতীশ দীপংকর উভয়ের নামই তাঞ্জুরে কোথাও কোথাও দীপংকর বলে লিপিবন্ধ হলেও এঁরা দুই ভিন্ন যুগের ব্যক্তি।

৮। বংশ-পরিচয়

দীপংকর কি বাঙালী?

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন, "বাংলাদেশ অথবা বিহার কোথায় দীপংকর জন্ম নিয়েছিলেন, এ নিয়ে এক অহেতুক মতবিরোধ প্রচলিত আছে। তিনি যে ভাগলপুরে জন্মেছিলেন, নির্ভরযোগ্য তিব্বতী সূত্র থেকে সন্দেহাতীতভাবে এ সংবাদ পাওয়া যায়।" দুঃখের বিষয় তাঁর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি কোনো তিব্বতী সূত্রই উল্লেখ করেন নি। তাই রাহুলজীর মত অতি বড় তিব্বতবিশেষজ্ঞের মন্তব্যও নির্বিচারে মেনে নেওয়া কঠিন।

তবে এ বিষয়ে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা কী বলেন, তা প্রথমেই জানা দরকার। দীপংকরের বংশ-পরিচয় নির্ধারণে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা দীপংকরের উদ্দেশ্যে রচিত দুটি স্তোত্রের উল্লেখ করেন। প্রথমটি অতীশের সর্বাগ্রগণ্য শিষ্য ব্রোম তোনপা ও দ্বিতীয়টি তাঁর অপর শিষ্য ছুলঠিম জলবা দ্বারা রচিত।

ব্রোম তোনপা তাঁর স্তোত্রে বলেছেন:

"ত্রি-সম্পন্ন বঙ্গের সাহোর রাজকুলের
যে মহান জীববংশে শান্তিজীব (শান্তরক্ষিত)
জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সেই বংশজাত
দীপংকরশ্রীর চরণে প্রণিপাত।"

নাগছো ছুলঠিম জলবা তাঁর স্তোত্রে বলেছেন:

"পূর্বের (দেশে) অত্যাশ্চর্য সাহোরে
এক মহান নগর ছিল,
নাম তার বিক্রমপুর।
এক রাজগৃহ ছিল তার কেন্দ্রস্থলে—
বিরাট বিস্তৃত সে প্রাসাদ
'স্বর্ণধ্বজ' তার নাম।
(সে দেশের) নৃপতি ছিলেন
রাজস্ব-ধনে-জনে চৈনিকরাজ তোঙ্খুনের
সমান্।
কল্যাণশ্রী সেই রাজার নাম

আর তাঁর রাজ্ঞীর নাম প্রভাবতী—
(রাজদম্পতীর) তিনপুত্র—
পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ আর শ্রীগর্ভ।
মধ্যম সেই সন্তান চন্দ্রগর্ভ—
বর্তমানের মহামান্য গুরু (অর্থাৎ অতীশ)।"

ঐতিহাসিক বুতোন বলেছেন, "দীপংকর শ্রীজ্ঞান বঙ্গাধিপতি কল্যাণশ্রীর পুত্র।"

ঐতিহাসিক গোই লোচাবা বলেছেন, "ভারতীয়রা যাকে সাহোর এবং তিব্বতীরা জাহোর বলত, সেই বিশাল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন কল্যাণশ্রী···রাজ্ঞী শ্রীপ্রভার গর্ভে তাঁর তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।···এই মধ্যমপুত্র চন্দ্রগর্ভই আমাদের মহামান্য প্রভু।"

ঐতিহাসিক সুম্‌পা বলেছেন, "তিনি (দীপংকর) পূর্বভারতে সাহোরে বিক্রমপুর নগরের কেন্দ্রস্থানে স্বর্ণধ্বজবিশিষ্ট প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শান্তিজীবেরও সেই মহান কুলে জন্ম। তাঁর (দীপংকরের) পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতার নাম পদ্মপ্রভা, তাঁদের তিনটি পুত্রের মধ্যমপুত্র চন্দ্রগর্ভ (রূপে তাঁর জন্ম)।"

শরৎচন্দ্র দাস অনূদিত 'অতীশের জীবনী'তে বলা হয়েছে, "বজ্রাসনের পূর্বদিকে বাংলার বিক্রম(ণি)পুরে গৌড়ের রাজবংশে দীপংকর জন্মগ্রহণ করেন।"

ওয়াডেল, জাস্কি এবং কোর্দিয়ে প্রভৃতি পাশ্চাত্যের তিব্বত-বিশেষজ্ঞরাও এই মত সমর্থন করেন। তাঞ্জুরের 'একবীরসাধন' এবং 'বলিবিধি' নামের গ্রন্থ দুটির পুষ্পিকা অনুসরণ করে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং সুশীলকুমার দে প্রমুখ পণ্ডিতরা দীপংকর বাঙালী ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঞ্জুরের বহু প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। স্থান সংক্ষেপের জন্য কয়েকটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা হল। 'প্রজ্ঞাপারমিতা পিণ্ডার্থপ্রদীপ' গ্রন্থের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, "বঙ্গদেশজাত ভিক্ষু দীপংকর শ্রীজ্ঞান···এটি রচনা করেছেন।" 'বোধিসত্ত্বপ্রদীপ পঞ্জিকা'-র পুষ্পিকায় আছে, "বাঙালী রাজার বংশধর দীপংকর শ্রীজ্ঞান। · এই কালে বুদ্ধের প্রতিভু দীপংকর শ্রীজ্ঞান বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" 'একবীরসাধন' গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, "আর্য পৈণ্ডপাতিক বাঙালী দীপংকর শ্রীজ্ঞান' গ্রন্থটির লেখক। 'চণ্ডমহারোষণসাধন পরমার্থ নাম' গ্রন্থের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের মহাচার্য পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান কর্তৃক লিখিত।" ..'বলিবিধি' গ্রন্থের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, "বঙ্গদেশজাত দীপংকর শ্রীজ্ঞান তাঁর গুরুর আশীর্বাদে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।"

'নিকায়ভেদ বিভঙ্গ ব্যাখ্যান' গ্রন্থের পুষ্পিকায় আছে, "বংগাল (বঙ্গ)-এর মহাপণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞানরূপে খ্যাত আচার্য পণ্ডিত কর্তৃক অনূদিত ও সংশোধিত।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। দীপংকর শ্রীজ্ঞান যে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রকৃতই বাঙালী ছিলেন, তাঞ্জুরে সংগৃহীত গ্রন্থাবলীতে তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে।

তবে বাংলাদেশ বলতে তিব্বতীরা কী বুঝতেন, তা আমাদের জানা দরকার। অনেক সময় তিব্বতীরা বাংলাদেশ বলতে 'ভংগল' বলেছেন। কোর্দিয়ে প্রমুখ পণ্ডিতরা 'ভংগল' বলতে বাংলাদেশকেই বুঝেছেন। এই প্রসঙ্গে জাস্কি বলেছেন যে

তিব্বতী ভাষায় কখনও কখনও 'ব'-এর পরিবর্তে 'ভ' লেখা হয়ে থাকে ; অজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্যমন্যতা এর কারণ হতে পারে। যেমন : "ভঙ্গলপা থমচে মগতু টাননে"—(রাজা দেবপাল) সকল বাঙালীকে যুদ্ধে (সমবেত হবার জন্য) আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঞ্জুরের 'নিকায়ভেদ বিভঙ্গব্যাখ্যান' গ্রন্থেও 'ভংগল' বলতে বংগল বা বাংলাকেই বোঝাচ্ছে।

ঐতিহাসিক তারনাথের ছোইজুং-এ 'ভংগল' শব্দটি বেশ কয়েকবার পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন এই 'ভংগল' পালরাজাদের রাজ্য ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন 'ভংগল' বলতে সাধারণত দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ বোঝাত।

দীপংকরের জন্মভূমি বিক্রমপুর। নাগছো ছুলঠিম জলবা ও ঐতিহাসিক সুম্পা তাঁদের রচনায় তিব্বতী হরফে বিক্রমপুর বা তার বিকৃত রূপ বিক্রমণিপুর ব্যবহার করেছেন।

জনপ্রবাদ মতে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে অতীশের আদি বাসস্থান। শশিভূষণ বিদ্যালংকার প্রমুখ পণ্ডিতরাও এই মত পোষণ করেন। কোনো বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মতে গোপালের রাজ্যলাভের পূর্বে, পূর্ববঙ্গের বজ্রযোগিনী ছিল বাংলার রাজধানী। শামলবর্মণের বজ্রযোগিনী তাম্রলিপিতে বজ্রযোগিনী ও বিক্রমপুরের অতীত গৌরব কীর্তিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র দাসের 'অতীশের জীবনী'তে দীপংকর যে বাঙালী ছিলেন তার একটি সুন্দর বিবরণ আছে। অতীশ যখন তিব্বতের পথে যাত্রা করেছেন তখন তাঁর বয়স ষাট বৎসর। সৌম্যসুন্দর মূর্তিতে সস্মিত মুখে তিনি অনর্গল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পথ চলেছেন। গম্ভীর উদাত্ত সে কণ্ঠস্বর। প্রতি চরণ আবৃত্তির শেষে তিনি নিজ ভাষায় বারবার বলছেন, "অতি ভাল! অতি ভাল! অতি মঙ্গল! অতি ভাল হএ (হয়)।"

ভারত ও তিব্বতে অতীশের দীর্ঘদিনের শিষ্য নাগছো ছুলঠিম জলবা অর্থাৎ জয়শীলের কাছে থেকেই ছাগ সোরপা অতীশের জীবনী রচনার তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিব্বত যাত্রাপথে অতীশের এই আনন্দ-অভিব্যক্তি জয়শীলের পক্ষেই দেখা ও পরে বর্ণনা করা সম্ভব।

তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে, অতীশের পিতা সাহোর (তিব্বতী জাহোর)-এর অধিপতি ছিলেন। এই সাহোর ওয়াডেল-এর মতে লাহোর, শরৎচন্দ্র দাসের মতে যশোর এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে পূর্ববাংলার সাভার। ফ্রাঁকে তাঁর গ্রন্থে সাহোর শব্দটির পরে বন্ধনীর মধ্যে 'মণ্ডি' বলেছেন। জাম্কি 'পদ্মসম্ভব উপাখ্যান'-এর ভিত্তিতে বলেছেন সাহোর উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

তবে দীপংকরের জন্মভূমি উত্তর-পশ্চিম ভারতে হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ তিব্বতের ঐতিহাসিকরা শুধু জাহোর কথাটিই ব্যবহার করেননি, তিনি যে পূর্বভারতে, বাংলায় বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, একথাও স্পষ্ট করে বলেছেন। সাহোর বা জাহোর তাহলে কোথায় হতে পারে ?

চোমা দ্য কোরো ও শরৎচন্দ্র দাসের মতে সহর বা নগর বোঝাতে তিব্বতীতে সাহোর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গোই লোচাবা শোননুপাল বলেছেন তিব্বতী Za-এর উচ্চারণ অনেকটা ভারতীয় 'স'-এর মত বলেই ভারতীয়দের সহর তিব্বতীদের কাছে জাহোর।

প্রকৃতপক্ষে সহর শব্দটি পারসিক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে পূর্ব ভারতে সপ্তম শতক থেকেই পারসিক শব্দ প্রচলিত ছিল। তিব্বতী ভাষাও এই সময়েই গড়ে উঠেছে। সপ্তম শতকে তিব্বতী বর্ণলিপির স্রষ্টা থোনমি সম্ভোট তিব্বত ও ভারত এই দুই দেশের উচ্চারণ পার্থক্য লক্ষ্য করে তিব্বতী বর্ণমালায় নতুন কয়েকটি অক্ষর যুক্ত করেন, Za অক্ষরটি তার অন্যতম। জাহোর শব্দটির প্রকৃত অর্থ আজও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

দীপংকর যে রাজকুলে জন্ম নিয়েছিলেন, তিব্বতের ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত। সুম্পা বলেছেন, পূর্বভারতে জাহোরের রাজকুলে শান্তরক্ষিতের বংশে দীপংকরের জন্ম। বুতোন, গোই লোচাবা ও নাগছো লোচাবাও একই বিবরণ দিয়েছেন। অতীশের রচিত কোনো কোনো গ্রন্থের পুষ্পিকায় ভিক্ষু দীপংকরকে রাজপুত্র বলা হয়েছে। দীপংকরের উক্তি বলে শরৎচন্দ্র দাস একটি তিব্বতী বিবরণী দিয়েছেন, দীপংকর এখানে বলছেন:

"আমার সময়ে ভুইন্দ্রচন্দ্র নামে এক রাজা বাংলায় রাজত্ব করতেন।"

চন্দ্ররাজবংশ দীর্ঘদিন বাংলায় রাজত্ব করেছিল। ৯০০-১০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে ছয়জন চন্দ্রবংশীয় রাজা পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেন, তাঁদের মধ্যে ভুইন্দ্রচন্দ্র নামে কোনো রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। দীপংকর এই সময়ে জীবিত ছিলেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দীপংকর এই চন্দ্রবংশেই জন্ম নিয়েছিলেন।

নালজোরপা ছেনপো-র বর্ণনায় অতীশ দীপংকর তাঁকে বলেছেন, "আমাদের ভারতবর্ষে প্রকৃত রাজা ও রাজবংশীয় - এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তরা নিজেরা রাজ্যশাসন করেন, শেষোক্তরা তা করেন না। আমার জন্মও রাজকুলে মাত্র, আমার পিতা গৃহী উপাসক মহাবোধিসত্ত্ব ছিলেন।"

নালজোরপা ছেনপো অতীশের ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন, ব্রোম তোনপার মৃত্যুর পরে তিনি রাডেং বিহারের আচার্য নিযুক্ত হন।

দেখা গেল যে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা একযোগে বলেছেন যে রাজকুলে দীপংকরের জন্ম। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, অভিজাত বংশে জন্মের ফলে দীপংকরের বাল্যশিক্ষায় বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। বালক চন্দ্রগর্ভের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে আচার্য জেতারি তার পরিচয় জানতে চাইলে চন্দ্রগর্ভ বলেন, সেই দেশের প্রভু তার পিতা। উত্তরটি অহমিকাপূর্ণ মনে করে জেতারি বললেন, "আমাদের মধ্যে কেউ প্রভুও নেই, দাসও নেই, তুমি যদি এই দেশের শাসকের পুত্র হও, তাহলে চলে যাও।" চন্দ্রগর্ভ অতি বিনীতভাবে তখন তাঁকে সংসার-ত্যাগের বাসনা জানালেন। জেতারিও অবস্থা বিবেচনা করে চন্দ্রগর্ভকে তার পিতার

রাজ্য থেকে দূরে নালন্দায় যাবার উপদেশ দিলেন।

শরৎচন্দ্র দাস বলেছেন, দীপংকর ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ফ্রাঁকে ও ওয়াডেলও এই মত সমর্থন করেন। রাহুলজী বলেন, জল-অশ্ব-বর্ষে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দীপংকরের জন্ম। তিব্বতের পণ্ডিতেরা ও দীপংকরের বিভিন্ন জীবনীকার কিন্তু এ ব্যাপারে একমত নন। তাঁরা দীপংকরের জন্মবর্ষ বলে যে ভিন্ন ভিন্ন বৎসর নির্দেশ করেছেন, সুম্‌পা তাঁর গ্রন্থে তার একটি তালিকা দিয়েছেন। সুম্‌পা নিজে জল-অশ্ব-বর্ষকেই দীপংকরের জন্মবর্ষ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই জল-অশ্ব-বর্ষ অর্থে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

সঠিক কালনির্ঘণ্ট নির্দেশের জন্যে গোই লোচাবার গ্রন্থটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। গোই লোচাবা বিভিন্ন ঘটনা বিচার করে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দ জল-অশ্ব-বর্ষকেই দীপংকরের জন্মবর্ষ বলে গ্রহণ করেছেন। দীপংকরের জীবনের পরবর্তী ঘটনা সমূহের সন তারিখের সঙ্গে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জন্মবর্ষ রূপে বিশেষভাবেই সঙ্গতিযুক্ত।

সংক্ষেপে, রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ, পরবর্তী জীবনে দীপংকর নামে খ্যাত, ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী অথবা শ্রীপ্রভা। কল্যাণশ্রী সম্ভবত একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন রাজন্য ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই বংশেই আচার্য শান্তরক্ষিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৯। প্রথম জীবন

দীপংকরের প্রথম বয়সের শিক্ষাদীক্ষা ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে তিব্বতীয় সূত্রগুলি থেকে যে সংবাদ আমরা পাই তার মধ্যে কিছুটা পরস্পরবিরোধিতা আছে। যেমন 'অতীশের জীবনী'তে বলা হয়েছে দীপংকরের মাতাপিতা অতি অল্প বয়সেই তাঁকে শিক্ষালাভের জন্য জেতারির কাছে প্রেরণ করেন। জেতারির নিকট বিদ্যালাভের ফলে পরবর্তী জীবনে ধর্ম ও দর্শনচর্চার পথ তাঁর সুগম হয়।

রাহুলজী কিন্তু বলেছেন, রাজপুত্রের যখন প্রায় এগারো বছর বয়স তখন একদিন বেড়াতে বেড়াতে তিনি কাছের একটি জঙ্গলে ঢুকে পড়েন এবং জেতারির দেখা পান। সেখানে জেতারি একটি কুটিরে বাস করতেন। জেতারি তাঁকে নালন্দায় যেতে উপদেশ দেন।

সুম্‌পার গ্রন্থে দীপংকরের গুরুদের একটি তালিকায় রাহুলগুপ্ত, শীলরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, ধর্মকীর্তি, শান্তিপা, নারোপা, দ্বিতীয় কুশলিপা, অবধূতিপা এবং ডোম্বিপা-র নাম পাওয়া যায়, জেতারির নাম এখানে নেই।

রাহুলগুহ্যবজ্র, অবধূতিপা, শীলরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, রত্নাকরশান্তি, ধর্মকীর্তি—এঁদের প্রত্যেকের কাছেই দীপংকর বহুবিধ বিষয় অধ্যয়ন করেছেন। এঁদের নাম

ছাড়াও গোই লোচাবা তাঁর গ্রন্থে দীপংকরের আরও চোদ্দজন গুরুর একটি তালিকা দিয়েছেন : জ্ঞানশ্রীমিত্র, দ্বিতীয় কুশলি, জেতারি, কৃষ্ণপাদ বা বল্যাচার্য, দ্বিতীয় অবধূতিপা, ডোম্বিপা, বিদ্যাকোকিল, মতিজ্ঞানবোধি, নারো, পণ্ডিত মহাজন, ভুতকোটিপা, মহাপণ্ডিত দানশ্রী, প্রজ্ঞাভদ্র ও বোধিভদ্র। দীপংকরের গুরু বলে উল্লিখিত এই চোদ্দজনের মধ্যে নারোপা এবং জেতারি দীপংকরের সমসাময়িক ও বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু অন্যদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই আমাদের জানা নেই।

কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ নয়। তিব্বতীয় সূত্র থেকে দীপংকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের চারটি পৃথক পৃথক বিবরণ পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র দাসের বিবরণ মতে, ওদন্তপুরীর মহাসাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট উনিশ বৎসর বয়সে তিনি পুণ্যসম্বর গ্রহণ করেন এবং দীপংকর শ্রীজ্ঞান এই নাম প্রাপ্ত হন।

রাহুলজী বলেন, জেতারি বালক দীপংকরকে নালন্দায় বোধিভদ্রের কাছে পাঠান। কিন্তু কুড়ি বছর বয়স না হলে ভিক্ষুদীক্ষা দেওয়া হয় না। তাই দীপংকরকে প্রায় নয় বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। এই সময়ে আচার্য বোধিভদ্রের নির্দেশে দীপংকর শ্রমণদীক্ষা লাভ করে সন্ন্যাস বেশ ধারণ করেন এবং তাঁর নাম হয় দীপংকরশ্রীজ্ঞান।

গোই লোচাবার বিবরণে, দীপংকর বজ্রাসনের মতিবিহারে স্থবির মহাসাংঘিক শীলরক্ষিতের নিকট উনত্রিশ বৎসর বয়সে ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণ করেন। শীলরক্ষিত বুদ্ধজ্ঞানপাদের শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আর সুমপা বলেছেন, দীপংকর তাঁর গুরুবৃন্দ ও কুলদেবীর নির্দেশে উনত্রিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরীতে মহাসাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

কোন্ গুরুর নিকট, কোন্ বিহারে, কত বৎসর বয়সে অতীশ দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এই মতপার্থক্যের কারণও আছে। অতীশের জীবনীকারেরা সকলেই তাঁর কয়েক শতাব্দী পরের লোক, ভারত থেকে তিব্বতে যে কাহিনীগুলি পৌঁছেছিল বা লোকমুখে প্রচলিত ছিল সেই উপাখ্যান-গুলিকে ভিত্তি করেই তিব্বতের ঐতিহাসিকরা অগ্রসর হয়েছেন। তাই অতীশের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য তাঁদের কাছে আশা করাও যায় না।

যাই হোক, তিব্বতের ইতিহাসে প্রদত্ত বিবরণগুলির ভিত্তিতে অতীশের শিক্ষা-জীবনকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

প্রথম, তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণ ;

দ্বিতীয়, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও হীনযান ও মহাযান উভয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ;

তৃতীয়, বহির্ভারত যাত্রা এবং সুবর্ণদ্বীপগুরু ধর্মকীর্তির নিকট শাস্ত্রশিক্ষা লাভ।

১০। তান্ত্রিক দীক্ষা

তান্ত্রিক দীক্ষার মাধ্যমেই যে অতীশের ধর্মজীবন শুরু হয়েছিল, তিব্বতের ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে সকলেই একমত। তিব্বতে অতীশের প্রথম সারির সাক্ষাৎ-

শিষ্যের মধ্যে মহাযোগী বা নালজোরপা ছেনপো অন্যতম। তাঁর বিবরণে অতীশ বলছেন যে সর্বপ্রথম তাঁর পিতার নিকটেই অতীশ তান্ত্রিক দীক্ষা লাভ করেন।

গোই লোচাবা বলেছেন, শিশুকালেই অতীশ তাঁর ইষ্টদেবী আর্যতারার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর প্রভাবে রাজত্বের প্রতি তাঁর বিরাগ জন্মায় ও যোগ্য গুরুর সন্ধানে অতীশ দেশান্তর যাত্রা করেন। কৃষ্ণগিরির যোগী রাহুলগুহ্যবজ্রের কাছে তিনি হেবজ্রচক্র দীক্ষা ও তন্ত্র উপদেশ লাভ করেন।

'অতীশের জীবনী'তে বলা হয়েছে, রাহুলগুপ্তের উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি কৃষ্ণগিরি পর্বতে যান। সেখানেই তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা এবং গুহ্যজ্ঞানবজ্র নাম লাভ করেন।

সুমপা বলেছেন, রাজত্বের প্রতি দৃক্‌পাত না করে তিনি ধর্ম (শিক্ষা) সন্ধানে কৃষ্ণগিরিতে যান এবং সেখানে গুরু রাহুলগুপ্তের নিকট অভিষেক লাভ করেন। জ্ঞানগুহ্যবজ্র এই নামে দীক্ষান্তে তিনি মন্ত্রাচার্য হন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই কৃষ্ণগিরিকে (Black Mountain) বর্তমান বোম্বাই-এর নিকটবর্তী কানহেরি বলে চিহ্নিত করেছেন। বিমলাচরণ লাহা অবশ্য রাজগৃহের প্রসিদ্ধ সাতটি পর্বতের অন্যতম কালশিলাকে কৃষ্ণগিরি বলে নির্দেশ করেছেন। অন্য তিব্বতীয় সূত্রেও কৃষ্ণগিরি নিবাসী রাহুলগুহ্যের নাম অতীশের সমকালীন এক তান্ত্রিক যোগী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

গোই লোচাবা অতীশের জীবনের এই পর্যায়ের কাহিনী বিস্তৃত করেই দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, 'উৎপন্নক্রম' ও 'সম্পন্নক্রম'-এ সন্নিবিষ্ট হবার পরে দীপংকর-শ্রীজ্ঞান প্রবাস যাত্রা করলেন। সাত বৎসর ধরে তিনি আচার্যশ্রেষ্ঠ অবধূতিপার পরিচর্যা করেন। পরবর্তী তিন বৎসর তাঁর ওড্ডিয়ান দেশে ডাকিনীদের সঙ্গে গণচক্রে যোগদান, অগণিত গুহ্যবজ্রগীতি শ্রবণ এবং কঠোর মানসিক অনুশীলনে অতিবাহিত হয়।

রাহুল সাংকৃত্যায়নও বলেছেন, বারো বৎসর বয়স্ক অতীশ আঠারো বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অবধূতিপার কাছে ছিলেন। গোই লোচাবা বলেছেন, পূজ্যপাদ বিরূপার কাছে মহাপণ্ডিতপাতিক অবধূতিপা বরাহী ষণ্ঠধারণী ও অন্যান্য ক্রিয়াচর্যা আয়ত্ত করেছিলেন। বিরূপা আবার ইন্দ্রভুতির ভগ্নী লক্ষ্মীংকরার কাছে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন। অবধূতিপা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, জাতিতে কায়স্থ।

রাহুলজীর মতে এই অবধূতিপা বা অদ্বয়বজ্র এবং নালন্দাবিহারে বোধিভদ্রের গুরু মৈত্রিপা একই ব্যক্তি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং ডঃ সুশীলকুমার দে অবধূতিপা ও অদ্বয়বজ্রকে একই ব্যক্তি বলেছেন। সম্ভবত অবধূতিপা সে যুগে দীপংকরের বয়োজ্যেষ্ঠ এক বিখ্যাত আচার্য ছিলেন। তাঞ্জুরে সংরক্ষিত রচনাবলী দেখে মনে হয় একাধিক অবধূতিপার অস্তিত্বও অসম্ভব নয়।

গোই লোচাবা দীপংকরের তন্ত্রচর্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ওড্ডিয়ানে

দীপংকর তিনবৎসর ছিলেন এবং সেখানে ডাকিনীদের তান্ত্রিক ভোজে তিনি অংশ নিতেন। এই ওড্ডিয়ানকে তিব্বতী সূত্রে উড্ডিয়ান, উডিয়ান, ও-রজিয়ান বা উ-রগিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সিলভ্যাঁ লেভি, এফ. ডবলু. টমাস প্রভৃতি আধুনিক গবেষকদের অনেকেই এই দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। পিতৃদেব হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুসরণে বিনয়-তোষ ভট্টাচার্য উড়িষ্যাকেই ওড্ডিয়ান বলেছেন। অপরপক্ষে, সিলভাঁ লেভি ওড্ডিয়ানকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দেশ করেছেন। য়ুয়ান-চাং-এর সময়েও এই দেশের অধিবাসীরা যাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

গোই লোচাবা আবার মগধের আড়াই শত যোজন উত্তরে ওড্ডিয়ান দেশের স্থান-নির্ণয় করেছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বলেন যে, পাগসাম জোনসাং অনুসারে প্রথম সিদ্ধাচার্য লুইপা জাতিতে মৎস্যজীবী ছিলেন। তিনি ওড্ডিয়ান-রাজের লিপিকর ছিলেন। তাঞ্জুর সংকলনে তাঁকে বাঙ্গালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লুইপা রচিত কয়েকটি বাংলা গানও পাওয়া যায়। তার ফলে ওড্ডিয়ান বাংলাদেশে অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে।

তিব্বতী সূত্র অনুসারে, ওড্ডিয়ান তন্ত্রচর্চার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ওড্ডিয়ান-রাজ ইন্দ্রভূতি ও তাঁর ভগ্নী লক্ষ্মীংকরার উদ্যোগে গুহ্যসমাজতন্ত্র এই দেশ থেকেই প্রথমে আর্যাবর্তে প্রচলিত হয়েছিল।

তবে দীপংকর এমন একটি যুগে জন্ম নিয়েছিলেন এবং এমন এক পরিবেশে বড় হয়েছিলেন যে তার সবটাই ছিল তান্ত্রিকপ্রভাবে আচ্ছন্ন। দীপংকরের ধর্মশিক্ষা শুরু হয়েছিল তান্ত্রিক দীক্ষা ও তন্ত্রচর্চার মধ্য দিয়েই, তন্ত্রবিদ্যায় গভীর জ্ঞানও তিনি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালের একটি ঘটনায় তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিব্বতের বিখ্যাত পণ্ডিত ও লোচাবা রিনছেন সাংপো বা রত্নভদ্র ভারতের খ্যাতনামা তান্ত্রিক আচার্যদের কাছে শিক্ষালাভ করে-ছিলেন ও তিব্বতে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক আচার্য বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করে-ছিলেন। কিন্তু প্রথম দর্শনেই শাস্ত্রালোচনার মাধ্যমে দীপংকর সমসাময়িক এই বয়োজ্যেষ্ঠ তান্ত্রিকের পাণ্ডিত্যাভিমান অবলীলাক্রমে চূর্ণ করেছিলেন, পরবর্তী আলোচনায় তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

১১। প্রব্রজ্যাগ্রহণ

তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ দীপংকরের জীবনে এক গভীর রূপান্তর সূচনা করেছিল।

তান্ত্রিক অভিষেক গ্রহণকালে অতীশের নামকরণ হয় জ্ঞানগুহ্যবজ্র বা গুহ্যজ্ঞান-বজ্র আর প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে নাম হয় দীপংকর বা দীপংকর শ্রীজ্ঞান। পরবর্তীকালে তাঁর

এই দ্বিতীয় নামটিই সারাজীবনের সঙ্গী হয়েছে আর তান্ত্রিক নামটি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে,। তাঞ্জুরে জ্ঞানগুহ্যের অনূদিত পনেরোটি রচনা পাওয়া যায়, এই জ্ঞানগুহ্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং সম্ভবত ইনি কাশ্মীরের এক পণ্ডিত।

তান্ত্রিক অভিষেকের পরে দীপংকর আবার কেন প্রব্রজ্যাগ্রহণ করলেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণের ফলে তাঁর তান্ত্রিক মতবাদ পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তন্ত্র-মন্ত্র-ক্রিয়া-প্রক্রিয়া—তান্ত্রিকের যা অবশ্য পালনীয় আচার-আচরণ তারও বিরতি ঘটেছিল। অতীশ বৌদ্ধধর্মের প্রতি কীভাবে আকৃষ্ট হলেন, সে সম্পর্কে তিব্বতীসূত্রে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। বজ্রযান চর্চায় যখন তিনি নিরত ছিলেন তখন একরাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, অসংখ্য শিষ্যপরিবৃত হয়ে ভগবান শাক্যমুনি যেন তাঁকে প্রশ্ন করছেন, "এই জীবনের প্রতি তোমার আসক্তি কেন? কেনই বা তুমি বৌদ্ধদীক্ষা গ্রহণ করনি?" এই কাহিনীমতে স্বয়ং শাক্যমুনির প্রেরণাতেই অতীশ বজ্রযানচর্চা পরিত্যাগ করে বৌদ্ধদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষান্তে ডাকিনীদের গণচক্র ও তন্ত্রাচার্যদের সান্নিধ্য বর্জন করে প্রব্রজ্যাধারী দীপংকর গভীর একাগ্রতায় ও প্রগাঢ় নিষ্ঠায় বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন।

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা বলেন, প্রব্রজ্যাগ্রহণের পরে একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত দীপংকর মহাসাংঘিক, সর্বাস্তিবাদী, সম্মিতীয় ও স্থবিরবাদী এই চারটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক অনুশীলন করেন। ওদন্তপুরী মহাবিহারে শ্রাবক ধর্মরক্ষিতের শিক্ষায় দুই বৎসরে তিনি মহাবিভাষা আয়ত্ত করেন। এই মহাবিভাষা, অভিধর্মবিভাষা বা শুধুমাত্র বিভাষা বলেও উল্লিখিত হয়। কাত্যায়নীপুত্রের জ্ঞানপ্রস্থান গ্রন্থের টীকাভাষ্যরূপে এই বিভাষা রাজা কনিষ্কের আহ্বানে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে রচিত হয়। চীনা ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ আছে, কিন্তু মূল সংস্কৃত রচনাটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থটির গুরুত্ব সর্বাস্তিবাদীদের কাছে অত্যন্ত বেশি, বিভাষার প্রতি একান্ত আনুগত্যের জন্য এই সম্প্রদায়ের অপর নামকরণ হয়েছে বৈভাষিক। প্রব্রজ্যাগ্রহণের পরে দীপংকর ত্রিপিটক, মহাবিভাষা প্রভৃতি বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ গভীর নিষ্ঠায় অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তান্ত্রিকতার সঙ্গে এ সব গ্রন্থের কোনো সম্পর্কই নেই।

প্রসঙ্গত বলা যায়, দীপংকর যে বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তিব্বতের ঐতিহাসিকরা উৎসাহভরে তার বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু শাস্ত্রচর্চায় তাঁর গুরু বলতে একাধিক আচার্যের নাম করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে রাহুল সাংকৃত্যায়ন যাঁকে শীলরক্ষিত বলেছেন, গোই লোচাবা, সুমপা এবং শরৎচন্দ্র দাস তাঁকেই সম্ভবত ধর্মরক্ষিত বলেছেন। বুতোনের গ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বুতোন মহাযান বৌদ্ধধর্মের খ্যাতিমান প্রবক্তারূপে শান্তিদেবের পরে আর কারও নাম করতে পারেন নি। শান্তিদেবের (সম্ভবত সপ্তম শতক) বিবরণের পরে এই গ্রন্থে ভারতীয় ব্যাকরণশাস্ত্রসমূহ ও যে ধর্মশাস্ত্রগুলি ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সংক্ষেপে তার আলোচনা আছে। ভারত থেকে এর পরে বৌদ্ধধর্ম

কীভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরের অধ্যায়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে দীপংকরের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। বুতোন সপ্তম শতকের পরে ভারতে মহাযান মতের প্রসিদ্ধ আচার্য বলতে বিশেষ কারও নাম উল্লেখ করেননি বা করতে পারেননি। এদেশে তখন মহাযান শাস্ত্রচর্চার ধারা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই কারণেই পরবর্তী একাদশ শতকে দীপংকরের শিক্ষাগুরুদের তালিকায় ভারতে প্রসিদ্ধ মহাযানী আচার্য বলতে আমরা বিশেষ কাউকে পাই না।

গোই লোচাবা ও সুমপার মতে দীপংকর ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং তারপরে মাত্র দুই বৎসর তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। দীপংকরের রচনাবলীতে যে গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, মাত্র দুই বৎসরে সে পাণ্ডিত্য অর্জন সম্ভব কিনা বলা কঠিন। কিন্তু তিব্বতের ঐতিহাসিকরা বলেছেন তিনি এই দুই বৎসরেই বিভিন্ন শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। সম্ভবত অন্য কারণে দীপংকরের এই একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমটিকে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এই একত্রিশ বৎসর বয়সেই মহাযান বৌদ্ধধর্মে গভীরতর, বিপুলতর জ্ঞানের সন্ধানে দীপংকর ভারত ত্যাগ করে প্রবাসযাত্রা করেন। সুবর্ণদ্বীপের আচার্য ধর্মকীর্তির নিকট একাগ্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের তৃতীয় পর্যায় এই সময়েই শুরু হয়।

১২। সুবর্ণদ্বীপ ও ধর্মকীর্তি

অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে শিক্ষালাভের জন্য ভারত থেকে সুবর্ণদ্বীপে গিয়াছিলেন।

এই সুবর্ণদ্বীপ কোথায়, দীপংকর কিভাবে সেখানে গিয়েছিলেন, বৌদ্ধধর্ম চর্চার কেন্দ্ররূপে এই দেশের প্রসিদ্ধি কতটা ছিল, বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তারূপে আচার্য ধর্মকীর্তির খ্যাতিই বা কেমন ছিল, কিসের আকর্ষণে সুদূর পূর্বভারত থেকে অতীশ দীপংকর এদেশে এসেছিলেন—সাধারণ পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নগুলি জাগে।

সুবর্ণদ্বীপের গুরুর কাছে দীপংকর বোধিচিত্ত উপদেশ লাভ করেছিলেন। ব্রোম তোনপা তাঁর স্তোত্রে এবং থুকান লোসাং ছোইচি ঞিমা বা ধর্মসূর্য তাঁর 'কাদমপা সম্প্রদায়ের ইতিহাসে' একথা বলেছেন। গোই লোচাবা শোননুপালও এর বেশি কিছু বলেন নি।

সুবর্ণদ্বীপের গুরু সেরলিংপার প্রকৃত নাম ধর্মকীর্তি বা ছোইচি ডাগপা। তবে বিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি ও দীপংকরের গুরু সুবর্ণদ্বীপী ধর্মকীর্তি এক নন। দুজন দুই শতকের মানুষ। কোনো কোনো গ্রন্থে আবার সুবর্ণদ্বীপের ধর্মকীর্তিকে ভুল করে চন্দ্রকীর্তি বলা হয়েছে।

সুমপা বলেছেন, দীপংকর একত্রিশ বৎসর বয়সে সুবর্ণদ্বীপে যান ও ধর্মকীর্তির কাছে বারো বছর উপদেশ গ্রহণ করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন, ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মামুদ গজনভির ভারত আক্রমণের শেষ পর্যায়ের (১০২৩ খ্রিস্টাব্দ) দশ বছর আগেই দীপংকর ভারত ত্যাগ করে যান। জলপথে তাঁর চোদ্দমাস কেটে যায়। সমগ্র বৌদ্ধজগতে তখন সুবর্ণদ্বীপের ধর্মকীর্তি তাঁর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

'অতীশের জীবনী'-তে বলা হয়েছে যে বহুমুখী বিদ্যার্জনের পরে দীপংকর সুবর্ণদ্বীপের গুরুশ্রেষ্ঠ আচার্য ধর্মকীর্তির দর্শন লাভের সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ জলযানের যাত্রীদের সঙ্গে তিনি সুবর্ণদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। পূর্ব এশিয়ায় সুবর্ণদ্বীপ তখন বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রধান কেন্দ্র এবং সে দেশের আচার্য ধর্মকীর্তি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। বিশুদ্ধ বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে দীপংকর বারো বৎসর ধর্মকীর্তির সান্নিধ্যে কাটান।

সুবর্ণদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তিব্বতী একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, জম্বুদ্বীপের সন্নিকটে সুবর্ণদ্বীপ নামে বহুমূল্য রত্ন ও ধাতুময় একটি দেশ ছিল। এই দেশের রাজবংশে গুরু সেরলিংপা বা সুবর্ণদ্বীপী জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজকুমার একদিন এক পর্বতগুহায় বুদ্ধ শাক্যমুনির একটি মূর্তি পান। রাজপুত্র পরম ভক্তিভরে মূর্তিটিকে পূজা করতে থাকেন। তারপরে বৌদ্ধধর্মে সম্যক্ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে পিতার অনুমতি নিয়ে বজ্রাসন দর্শন করেন। তিনি যখন সেখানে ছিলেন মহাবোধি পূজার জন্য রাক্ষসরাও (সম্ভবত সিংহলবাসী) সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রখ্যাত আচার্যরাও সেখানে সম্মিলিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মহাচার্য মহাশ্রীরত্নও ছিলেন। যোগবলে তিনি সুদীর্ঘ আয়ুলাভ করেন। দর্শনমাত্র তাঁর প্রতি রাজকুমারের প্রগাঢ় ভক্তি জাগ্রত হল। অনন্যশরণ হয়ে তিনি সাতদিন গুরুর সান্নিধ্যে বাস করলেন, ফলে তাঁর গুরুভক্তি দৃঢ়তর হল। সাত বৎসর ভারতে বাস করে বহু আচার্যের কাছে তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এক রাতে গুরু তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, রাজা হওয়া ধর্মবিরুদ্ধ কাজ।

তারপর তাঁর গুরুদত্ত নাম হল সুবর্ণদ্বীপের ধর্মকীর্তি। সকলের প্রতি গভীর মৈত্রীভাবের জন্য তাঁর অপর নাম হল মৈত্র। বৌদ্ধভিক্ষুরূপে সুবর্ণদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে সেদেশের সকল তীর্থিকদের তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুবর্ণদ্বীপ থেকে জম্বুদ্বীপ ও অন্যান্য দেশে পরিব্যাপ্ত হল।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ইত্যাদি পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ নাম ছিল সুবর্ণদ্বীপ। আরব ও চীনের ভ্রমনকারীদের বিবরণীসমূহ ও সুমাত্রায় প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় সুবর্ণদ্বীপ ও সুবর্ণভূমি উভয় নামেই এই দ্বীপাঞ্চল পরিচিত ছিল। তাঞ্জুরে সংরক্ষিত ধর্মকীর্তির রচনাবলীর তিব্বতী অনুবাদের একটি পুষ্পিকায় সুবর্ণদ্বীপ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে, সুবর্ণদ্বীপের বিজয়নগরে রাজা চূড়ামণিবর্মণের রাজত্বকালের দশম বৎসরে, রাজা

চূড়ামণিবর্মণের অনুরোধে ধর্মকীর্তি গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'অভিসময় অলংকার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ শাস্ত্রবৃত্তি দুর্বোধ আলোক নাম টীকা'। কোর্দিয়ে-এর রচিত তাঞ্জুরের গ্রন্থতালিকায় আমরা এই পুষ্পিকার উল্লেখ পাই।

সপ্তম শতকে সুবর্ণদ্বীপের শ্রীবিজয় একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। দূরদূরান্তে ছড়িয়ে থাকা এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কাম্বোডিয়া, শ্যাম, সিংহল, যবদ্বীপের অধিকাংশ এবং বোর্নিওর সমুদ্র- তীরবর্তী অঞ্চল সমূহ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ভূভাগ এই শ্রীবিজয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নামও ছিল শ্রীবিজয়। শ্রীবিজয় ও তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিল এবং দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে শ্রীবিজয় বৌদ্ধ ধর্মচর্চার একটি প্রখ্যাত কেন্দ্র ছিল। চীন থেকে যে বৌদ্ধভিক্ষুরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধর্মোপদেশ লাভের জন্য ভারতে যেতেন, তাঁদের অনেকেই প্রথমে এদেশে বৎসরাধিক কাল বাস করে শাস্ত্রীয় আচার আচরণ আয়ত্ত করতেন, তারপর ভারতের পথে অগ্রসর হতেন। শ্রীবিজয় রাজাদের অনুশাসনে ও চীনা ভিক্ষুদের বিবরণী থেকে এ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

দীপংকরের সময়ে অর্থাৎ দশম-একাদশ শতকে শৈলেন্দ্র সম্রাটদের শাসনকালে মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দিকে ভারতের রাজাদের সঙ্গে এই শৈলেন্দ্র বংশের বেশ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের কোন রাজবংশের সঙ্গে এই রাজ্যের এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ দেখা দেয়। রাজেন্দ্র চোল তাঁর রাজ্যকালের ত্রয়োদশ বৎসরে অর্থাৎ ১০২৪—২৫ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রের পরপারে এক অভিযান পরিচালনা করেন এবং সম্ভবত তার ফলেই শৈলেন্দ্ররাজ্যের পতন ঘটে। আর এই সময়ে সুবর্ণদ্বীপের আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে অধ্যয়নশেষে অতীশ ভারতে ফিরে আসেন। মনে হয় শ্রীবিজয়ের রাজনৈতিক দুর্যোগের কারণেই অতীশ ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসবার জন্য সুবর্ণদ্বীপ ত্যাগ করেন। সুমপা বলেছেন, আচার্য ধর্মকীর্তি অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন, তিনি একশো পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতীশ যখন বিক্রমশীল বিহারের আচার্য নিযুক্ত হন, তখনও ধর্মকীর্তি জীবিত ছিলেন।

ধর্মকীর্তির শিষ্যদের মধ্যে দীপংকর ছাড়াও কমলরক্ষিত, শান্তি, জ্ঞানশ্রীমিত্র ও রত্নকীর্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঞ্জুরে ধর্মকীর্তির রচিত গ্রন্থাবলীর তিব্বতী অনুবাদ আমরা পাই। এই গ্রন্থগুলির নাম :

অভিসময় অলংকার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ শাস্ত্রবৃত্তি দুর্বোধ আলোক নাম টীকা ;
বোধিসত্ত্ব চর্যাবতার পিণ্ডার্থ ;
বোধিসত্ত্ব চর্যাবতার ষট্‌ত্রিংশৎ পিণ্ডার্থ ,
শিক্ষা সমুচ্চয় অভিসময় নাম ,

আর্য অচল সাধন নাম ;
ক্রোধ গণপতি সাধন।

এই তালিকার প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের অনুবাদকদের মধ্যে দীপংকরের নাম আ। 'আর্য অচল সাধন নাম' গ্রন্থটি দীপংকর অন্য কোনো তিব্বতীয় লোচাবার সাহায্য ছাড়া নিজেই অনুবাদ করেন। তালিকার প্রথম গ্রন্থটি ধর্মকীর্তির প্রধান ও শ্রেষ্ঠ রচনা। গ্রন্থটির মোট চরণসংখ্যা দু হাজার চুয়াল্লিশ। মহাযান দর্শনের শ্রেষ্ঠ পারমিতা প্রজ্ঞা পারমিতার ব্যাখ্যামূলক এই গ্রন্থটি অনুবাদে দীপংকরের সঙ্গে তিব্বতের শ্রেষ্ঠ লোচাবা রত্নভদ্র বা রিনছেন সাংপোর নাম পাওয়া যায়।

নাগার্জুন, মৈত্রেয়নাথ ও চন্দ্রকীর্তির ঐতিহ্যবাহক ধর্মকীর্তি দশম-একাদশ শতকে বৌদ্ধদর্শন ও মতাদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। ধর্মকীর্তির রচিত গ্রন্থগুলিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান, ধর্মকীর্তির গভীর বিদ্যাবত্তার আর এক উজ্জ্বল প্রমাণ। ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণের পরে দীপংকর দুই বৎসর ভারতে থাকেন, তারপরে তিনি সুবর্ণদ্বীপী গুরু ধর্মকীর্তির সন্ধানে ভারত ত্যাগ করে যান। পরবর্তী বৎসরগুলিতে তিনি ধর্মকীর্তির প্রত্যক্ষ উপদেশে মহাযান ধর্মের সকল শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন। ধর্মকীর্তির নিকট শিক্ষালাভের ফলেই পরবর্তী জীবনে দীপংকর ভারত ও তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অদ্বিতীয় দার্শনিক ও গুরুরূপে সম্মানিত হন। দীপংকরের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সত্যদ্বয় অবতার' ও 'বোধিচিত্ত অবতার ভাষ্য' নামক গ্রন্থদুটি ধর্মকীর্তির প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রচিত।

১৩। ভারতে প্রত্যাবর্তন—শান্তি প্রচেষ্টা

সুবর্ণদ্বীপ থেকে চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে দীপংকর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিব্বত যাত্রার পূর্বে আরো পনেরো বৎসর ভারতে অতিবাহিত করেন। দীপংকরের জীবনের এই পনেরো বৎসরের দুটি ঘটনা তিব্বতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথম, পশ্চিম ভারতের তীর্থিকরাজ কর্ণ এবং মগধরাজ নয়পালের মধ্যে যুদ্ধে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা।

দ্বিতীয়, বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষরূপে নিয়োগ। তিব্বত যাত্রার পূর্বে পরিণত জীবনের অধিকাংশ কালই দীপংকর এই বিহারে কাটান।

'অতীশের জীবনী'তে বলা হয়েছে, সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফিরে আসবার পর অতীশ বজ্রাসনের মহাবোধি বিহারে কিছুকাল থাকেন এবং সেখানে ধর্মীয় বিতর্কে তিনবার তীর্থিকদের পরাভূত করে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। এর পরে রাজা নয়পালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। এই সময় কার্ণ্যরাজ (সম্ভবত কনৌজ) মগধ আক্রমণ করেন। নয়পালের সৈন্যবাহিনী প্রথমে

পরাজিত হয় এবং শত্রুদল রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আসে। কিন্তু পরে মগধরাজ জয়লাভ করেন এবং শত্রুপক্ষ শান্তির আবেদন জানালে একটি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শান্তি প্রচেষ্টায় দীপংকর প্রধান ভূমিকা নেন এবং মুখ্যত তাঁরই চেষ্টায় উভয় রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

তিব্বতী বিবরণীর অন্যত্র এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "অতীশ যখন বজ্রাসনে বাস করছিলেন তখন পালরাজ নয়পাল এবং পশ্চিমের কার্ণ্যরাজ্যের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয় এবং মগধ আক্রান্ত হয়। নগর দখল করতে না পেরে কার্ণ্যরাজের সৈন্যরা কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মস্থান লুণ্ঠন করে এবং চারজন ভিক্ষু ও একজন উপাসক—এই মোট পাঁচজনকে হত্যা করে। বিহারের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি যখন তারা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেই দৃশ্য দেখেও অতীশের কোন ভাবান্তর হল না, তিনি শান্তভাবে, একাগ্রচিত্তে সর্বজীবে করুণা ও মৈত্রী ধ্যান করতে লাগলেন। পরে যখন মগধরাজের জয় হল এবং তাঁর বিজয়ী সৈন্যদল কার্ণ্যসৈন্যদের হত্যা করতে উদ্যত হল, তখন অতীশ বিজিত সৈন্যদের আশ্রয় দিয়ে তাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেন। কার্ণ্যরাজ অতীব শ্রদ্ধায় অতীশের ভক্তে পরিণত হলেন। অতীশকে স্বদেশে আমন্ত্রণ করে তিনি নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন। অতীশও এই যুধ্যমান দুই রাজার মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করালেন। যুদ্ধের সময় পরস্পরের যা কিছু লুণ্ঠিত কিংবা অপহৃত হয়েছিল, যথাসম্ভব তার ক্ষতিপূরণ করা হল। নিজের স্বাস্থ্য এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন করেও অতীশ দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী নদীগুলি বারবার পারাপার করে সকল জীবের জন্য শান্তি আনয়ন করেন। তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অতীশের যে ভূমিকা তিব্বতের ঐতিহাসিকরা নির্দেশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মগধরাজ নয়পালের সঙ্গে অতীশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঞ্জুরে রক্ষিত 'বিমল রত্নলেখ নাম' পত্রটি তিনি তিব্বত যাত্রাপথে নেপাল থেকে নয়পালকে লিখেছিলেন। প্রিয় শিষ্যের প্রতি গুরুর সহজ অথচ গভীর ভাবসমৃদ্ধ উপদেশমালাই এই রচনাটিতে স্থান পেয়েছে।

তবে অতীশ যখন ভারতে ছিলেন তখন মগধরাজ নয়পালের সঙ্গে যিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং যাঁদের বিরোধে অতীশ শান্তি স্থাপন করেন—সেই কার্ণ্যরাজের ইতিহাস-সম্মত পরিচয় জানতে স্বভাবতই কৌতুহল জাগে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে ইনি কলচুরিরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণ এবং এঁর সঙ্গে দীর্ঘ সংঘর্ষ নয়পালের রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বলা হয়ে থাকে ১০৩৯, মতান্তরে ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পরে তাঁর পুত্র কর্ণ পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। প্রথম তারিখটি গ্রহণ করলে কর্ণ ও নয়পালের সংঘর্ষে দীপংকর মধ্যস্থতা করেছিলেন, এ বিবরণ মেনে নিতে অসুবিধা হয় না; কিন্তু আমরা জানি ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে অতীশ তিব্বত যাত্রা করেন, তাই ১০৪১ খ্রিস্টাব্দকে এই শান্তি দৌত্যের কাল হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না।

এই সমস্যার সমাধান অবশ্য দুভাবে হতে পারে। প্রথমত, রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে, কর্ণের রাজ্যলাভের বহু পূর্ব থেকেই পাল ও কলচুরি বংশের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। গাঙ্গেয়দেবের সময় থেকে এই দুই রাজবংশের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ চলেছিল, তিব্বতের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত এই যুদ্ধ সম্ভবত তারই এক পর্যায়।

দ্বিতীয়ত, যদি ধরে নেওয়া যায় যে ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে নয়, অতীশ ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করেছিলেন তাহলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। শরৎচন্দ্র দাসও কোথাও কোথাও তাই বলেছেন।

কলচুরিদের বিবরণ মতে, গাঙ্গেয়দেব অঙ্গরাজকে পরাজিত করেছিলেন এবং বারাণসী অধিকার করেছিলেন; কলচুরিদের এই প্রাথমিক সাফল্যের স্বীকৃতি তিব্বতী কাহিনীতে আছে। যুদ্ধের শেষভাগে বিপর্যয় এবং পালরাজদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি প্রধানত গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পরেই ঘটেছিল।

তবে ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে অতীশের তিব্বত যাত্রার পূর্বে এবং কর্ণের রাজ্যলাভের পূর্বেই যদি এই সংঘর্ষ ঘটে থাকে, তাহলে এই সংঘর্ষকে কিভাবে কর্ণ ও নয়পালের যুদ্ধ বলা যায়? কিন্তু যদি কর্ণ রাজা হবার আগে যুবরাজ হিসাবে এই যুদ্ধ পরিচালনা করে থাকেন, তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না, তিব্বতের ঐতিহাসিকদের বিবরণ মেনে নিতে অসুবিধাও দূর হয়।

১৪। ভারতের বৌদ্ধবিহারসমূহ

সুবর্ণদ্বীপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ভারতবাস শেষে তিব্বতযাত্রা—অতীশের জীবনের এই মধ্যবর্তী পনেরো বৎসর ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধবিহারেই কেটেছে। তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে এই বিহারগুলির মধ্যে বিক্রমশীল বিহার সর্বপ্রধান। অতীশের পরিণত জীবনের কার্যাবলী মুখ্যত এই বিহারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানেই তিনি তিব্বতযাত্রার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। তবে কোনো সময়েই বিক্রমশীল তাঁর কার্যকলাপের একমাত্র কেন্দ্র ছিল না। তাঁর অনূদিত একটি গ্রন্থের পুষ্পিকায় নালন্দা মহাবিহারের অলিন্দের উল্লেখ আছে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় বজ্রাসন, ওদন্তপুরী ও সোমপুরী বিহারের নামও বারবার উল্লিখিত হয়েছে। অতীশের কর্মাবলীর কেন্দ্ররূপে বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী ও সোমপুরী—এই তিনটি বিহারই প্রধানত ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই বিহারগুলি সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধধর্ম প্রায় শেষ পর্যায়ে পেঁছেছে। পূর্ব ভারতে পালরাজরা তখন দেশ শাসন করছেন। সেই সময়েই এই তিনটি বিহার বিশেষ প্রাধান্যলাভ করেছিল। যে সব চৈনিক পরিব্রাজক তার আগে ভারতে এসেছেন, তাঁদের বিবরণীতে এই বিহারগুলির তাই কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। নালন্দা প্রভৃতি

প্রাচীন বৌদ্ধবিহারগুলি সম্পর্কে চীনা বিবরণীতে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী বা সোমপুরী সম্পর্কে সেখানে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। নালন্দা বা অন্যান্য প্রাচীন বিহারগুলি সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণও পাওয়া যায়, কিন্তু বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী ও সোমপুরী—এই তিনটি বিহারের মধ্যে একমাত্র সোমপুরী সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে রাজশাহী জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) পাহাড়পুরের বিশাল ধ্বংসস্তূপটিই অতীতের সোমপুরী বিহার ; পাল রাজাদের সময়ে এটি একটি বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার ছিল। কিন্তু তিব্বতী বিবরণে সোমপুরী নয়, বিক্রমশীল ও ওদন্তপুরী—এই বিহার দুটিই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আবার সোমপুরী ও ওদন্তপুরী সম্পর্কে একই লোককাহিনী তিব্বতী সূত্রে প্রচারিত হয়েছে, এ দুটি বিহারের নাম নিয়েও সেখানে বিভ্রান্তি দেখা গেছে। তাই মনে হয় এই বৌদ্ধবিহারগুলির যে বিবরণ আমরা তিব্বতী সূত্র থেকে পাই, তা বিশেষভাবে বিচার করে দেখবার দরকার আছে। তবে দীপংকরের কর্মকেন্দ্ররূপে এই বিহারগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে যা কিছু সংবাদ তা আমরা একমাত্র তিব্বতীয় সূত্র থেকেই পাই। তাই তিব্বতে সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে আমাদের এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

১৫। বিক্রমশীল বিহার

বিক্রমশীল বিহারটির প্রকৃত নাম কি ছিল, তা নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতরা বিক্রমশীলের বদলে একে বিক্রমশীলা বিহার বলেছেন। শরৎচন্দ্র দাস তাঁর একটি গ্রন্থে বিক্রমশীলা বলেছেন, পরবর্তী পণ্ডিতদের অনেকেই এক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। আবার শরৎচন্দ্র দাসই তাঁর তিব্বতী-ইংরেজি অভিধানে এবং তাঁর সম্পাদিত সুমপা-র গ্রন্থের অনুক্রমণীতে বিক্রমশীলা নয়, বিক্রমশীল বিহারই বলেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গল'-এর সর্বত্র বিক্রমশীল বলেই বিহারটির উল্লেখ করা হয়েছে। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এই বিহারটির নাম বিক্রমশীলা বলেছেন ; কিন্তু যে দুটি সংস্কৃত উদ্ধৃতি তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তাতে দেবনাগরী হরফে বিক্রমশীলই আছে। যেমন, 'স্রগ্ধরাস্তোত্র' টীকায় বলা হয়েছে, "শ্রীমদ্-বিক্রমশীলদেব-মহাবিহারীয়…" এবং 'বৃহৎ-স্বয়ম্ভূ-পুরাণে' "তদা বিক্রমশীলসি বিহারে…" ইত্যাদি।

আর একজন গবেষক বলেছেন যে খাড়া পাহাড়ের উপর বিহারটি তৈরি হয়েছিল বলে এর নাম বিক্রমশীলা। কিন্তু শিলা অর্থে পাথর হলেও শীলা-র সঙ্গে পাহাড়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই দুরারোহ পর্বতে অবস্থানের জন্য নয়, এই বিখ্যাত বিহারটির নামকরণের কারণ অন্যত্র সন্ধান করতে হবে। তবে সে কাজ সহজ নয়। কারণ এই নামের শেষাংশটি অর্থাৎ শীলা একটি তৎসম শব্দ হলেও, বিক্রমশীলা নামকরণের কোনো সঙ্গত অর্থ করা যায় না। মনে রাখা দরকার এক্ষেত্রে এই বিহারটি

সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মূলত তিব্বতী সূত্র থেকেই সংগৃহীত। তাই তিব্বতবাসীরা কিভাবে এই বিহারটির নাম উল্লেখ করেছেন, প্রথমে তা জানা দরকার।

তিব্বতী সূত্রে দীপংকরের নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে, এই বিহারটি সম্পর্কেও সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন,

১। মূল শব্দটি তিব্বতী হরফে লেখা ;

২। তিব্বতী ভাষায় শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ। তিব্বতী সূত্রে কোথাও কোথাও বিক্রমলশীল বা ব্রিকমলশীল বলে কিছুটা বিকৃতি ঘটলেও বেশীর ভাগ জায়গাতেই অবিকৃতভাবে বিক্রমশীল নামটিই পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক গোই লোচাবা শোননুপাল ও তারনাথ দুজনেই বিক্রমশীল বলে এই বিহারটির উল্লেখ করেছেন। তাঞ্জুরের কয়েকটি গ্রন্থের পুষ্পিকাতেও বিক্রমশীল নামটিই পাওয়া যায়।

তিব্বতী লেখায় 'অ' বা 'আ' কিংবা 'ই' এবং 'ঈ'র বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সাধারণত অনুবাদকরা ভারতীয় শব্দের দীর্ঘস্বর বোঝাতে সেই বিশেষ বর্ণটির নীচে একটি দীর্ঘ চিহ্ন ব্যবহার করেন। তিব্বতী গ্রন্থে তিব্বতী অক্ষরে বিক্রমশীল শব্দটি লেখবার সময়ে লেখক সবসময়ই 'শীল'-এর 'শী' শব্দটির দীর্ঘস্বর বোঝানোর জন্য তার নীচে দীর্ঘ চিহ্ন দিয়েছেন। পরের অক্ষরটি যদি 'ল'-এর বদলে 'লা' হোতো, তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে দীর্ঘচিহ্ন দেওয়া হত। শব্দটি যে বিক্রমশীল, বিক্রমশীলা নয় এটা তিব্বতীরা ভালভাবেই জানতেন।

বিক্রমশীল শব্দটির তিব্বতী অনুবাদ লক্ষ্য করলে আরও নিঃসংশয় হওয়া যায়। বিক্রমশীল—তিব্বতী ভাষান্তরে—নামনোন্ ঙৎছুল। প্রথম দুটি শব্দের অর্থ বিক্রম ও দ্বিতীয় দুটি শব্দের অর্থ স্বভাব, প্রকৃতি বা শীল। তিব্বতী 'দো' বা 'রি' কিংবা 'ডাগ' শব্দে শিলা, পাহাড়, পাথর ইত্যাদি বোঝায়। বিক্রমশীল শব্দটির তিব্বতী ভাষান্তরে শিলা বা পাহাড় অর্থে কিছু পাওয়া যায় না। বরং এমন একটি শব্দ পাওয়া যায় যার সংস্কৃত প্রতিশব্দ শীল।

দৃঢ় চরিত্রগৌরব ও নৈতিক শৃঙ্খলার কেন্দ্র ছিল এই বিহার ; এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভবত তার বিক্রমশীল নাম হয়েছিল। শরৎচন্দ্র দাস প্রমুখ পণ্ডিতরা এই অনুমান করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই নামকরণের অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মহারাজ ধর্মপাল এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বিহারটিকে শ্রীমৎ বিক্রমশীলদেব মহাবিহার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপালের অন্য নাম ছিল বিক্রমশীল। 'রামচরিত' গ্রন্থেও এই অনুমানের সমর্থন মেলে। সেখানে বলা হয়েছে, হারবর্ষ পালবংশের যুবরাজ ছিলেন। যুবরাজের পিতা বিক্রমশীল। তাঁর আর এক নাম ধর্মপাল। তিনি বিক্রমশীল বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হারবর্ষ ও দেবপাল একই ব্যক্তি।

শৈলেন্দ্ররাজ চূড়ামণি বর্মণের নাম থেকে দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিহারের নাম চূড়ামণি বিহার হয়েছিল। সেইভাবেই হয়তো বিহারটির প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ধর্মপালের নাম থেকে বিক্রমশীল বিহারটির নামকরণ হয়েছিল। তিব্বতী সূত্রে

রাজা ধর্মপালই যে বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠাতা একথা বারবার বেশ জোর দিয়েই বলা হয়েছে। তবে ধর্মপালের অন্য নাম বিক্রমশীল ছিল এবং তাঁর নাম থেকেই বিহারটির নামকরণ হয়েছে, তিব্বতী সূত্রে এ কথা বলা হয় নি। বরং সেখানে এই নামকরণ সম্পর্কে কয়েকটি কাল্পনিক কাহিনী বলা হয়েছে। যেমন সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে, বিক্রম নামে একটি যক্ষকে এখানে দমন করা হয়েছিল বলে এই বিহারের নাম বিক্রমশীল। তিব্বতী সূত্রে আরও একটি কাহিনী বলা হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে কাহিনীটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হয়েছে, বিহারটি চতুর্দিকে চারটি নামে বিখ্যাত ছিল। (আর) তিব্বতে বিক্রমশীল নামে এই বিহারটি প্রসিদ্ধ ছিল। শরৎচন্দ্র দাস তাঁর গ্রন্থের টীকায় বলেছেন, সম্ভবত ক্ষুদ্র বিক্রমশীল বিহারের পাশে একটি বৃহৎ ধর্মসংস্থান গড়ে উঠেছিল এবং পরে এই দুটি একত্রিত হয়ে গিয়েছিল।

কালক্রমে উপরোক্ত এই চারটি নামের মধ্যে বিক্রমশীল নামটি সর্বাধিক প্রখ্যাত হয়, আর বিক্রমশীল নামেই তিব্বত বা হিমবৎ দেশের মানুষেরা বিহারটিকে জানেন। দুঃখের বিষয় শরৎচন্দ্র দাস বিক্রমশীল বিহারের অন্য তিনটি নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। কোন তিব্বতী গ্রন্থে এই নামগুলি পেয়েছিলেন; তাও বলেন নি। তিব্বতে বিক্রমশীল বিহার নামে প্রসিদ্ধ এই বিহারটি ভারতে কোন নামে বিখ্যাত ছিল তাও তিনি জানান নি। ফলে বিক্রমশীল বিহারের নাম সংক্রান্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানও মেলে না।

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা এই বিহারটি সম্পর্কে কি বলেছেন, এবারে তা দেখা যাক। তারনাথ বলেন, "তারপরে সেই রাজার পুত্র ধর্মপাল রাজা হলেন। তিনি চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করলেন। পূর্বদিকে কামরূপ, তিরহুতি গৌড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে দিল্লী পর্যন্ত, উত্তরে জালন্ধর, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সিংহভদ্র ও জ্ঞানপাদ (উভয়েই) তাঁর গুরু ছিলেন। তিনি দশদিক থেকে প্রজ্ঞাপারমিতা ও গুহ্যসমাজের গুরুদের সংগ্রহ করেছিলেন। যখন তিনি রাজা হলেন তখন বাংলাদেশে সিদ্ধাচার্য কুক্কুরিপা সর্বপ্রাণী হিতার্থে কাজ করছিলেন। এই ইতিহাস অন্যত্রও জানা যাবে। প্রকৃতপক্ষে (ধর্মপাল) সিংহাসনে আরোহণ করার সময় থেকেই আচার্য সিংহভদ্র প্রমুখ প্রজ্ঞাপারমিতার পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করতে শুরু করেছিলেন। রাজা সর্বসমেত পঞ্চাশটি বৌদ্ধসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা পঠন-পাঠনের জন্য পঁয়ত্রিশটি নির্দিষ্ট ছিল। মগধের উত্তরে গঙ্গাতীরে এক পর্বতচুড়ায় শ্রীবিক্রমশীল বিহার (নির্মিত হয়েছিল)। তার কেন্দ্রে মহাবোধির এক পূর্ণাবয়ব মূর্তি সহ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার চতুর্দিকে গুহ্যতন্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিপান্নটি ছোট মন্দির ও আরও চুয়ান্নটি সাধারণ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সর্বসমেত ১০৮টি মন্দির ও তার বহির্ভাগে প্রাচীর। তিনি (রাজা ধর্মপাল) ১০৮ জন পণ্ডিতের জীবিকার সংস্থান করেছিলেন।"

তিব্বতের অন্যতম ঐতিহাসিক সুমপা বলেছেন, "সেই সময়ে রাজার ছেলে ধর্মপাল

কামরূপ, তিরহুতি, গৌড় ইত্যাদি নিয়ে পূর্বে সমুদ্রতট পর্যন্ত, উত্তরে জালন্ধরী পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত শাসন করতেন। প্রজ্ঞাপারমিতায় তাঁর গভীর ভক্তি ছিল। তিনি চৌষট্টি বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ্যকালেই তিনি হরিভদ্র ও তাঁর শিষ্য বুদ্ধজ্ঞানপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।…মগধের উত্তরে গঙ্গাতীরে এক পাহাড়ের শিখরে তিনি বিক্রমশীল বিহার নির্মাণ করেন। তার গর্ভগৃহের চতুর্দিকে ১০৭টি মন্দির ছিল এবং তারপরে একটি বহিঃপ্রাচীর ছিল। এখানে ১০৮ জন পণ্ডিতের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা ছিল। সেই সময়ে প্রজ্ঞাপারমিতা ও গুহ্যসমাজ-এর খুব বেশি প্রাধান্য ছিল। তখন পশ্চিমে রাজা চক্রায়ুধ এবং উত্তরে তিব্বতে রাজা ঠিস্রোং দেচান রাজত্ব করছিলেন। মোটামুটি এইটুকু বলা চলে।"

উপরের দুটি বিবরণের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। ধর্মপালের রাজত্বকালকে অবশ্য দুটি বিবরণেই অযথা দীর্ঘ করা হয়েছে। তা ছাড়া, তারনাথ যাঁকে সিংহভদ্র বলেছেন, স্নুমপা বোধ হয় তাঁকে হরিভদ্র বলেছেন। দুজনেই অবশ্য তাঁকে আচার্য জ্ঞানপাদ বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপাদের গুরু বলেছেন। তাহলে এই হরিভদ্র ও বুদ্ধজ্ঞানপাদ দুজনেই ধর্মপালের শুধুমাত্র সমসাময়িক নন, তাঁরা রাজানুকূল্যও ভোগ করতেন।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। উভয় ঐতিহাসিকই ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত একটি বিহারের নামই করেছেন, সেটি হচ্ছে বিক্রমশীল বিহার। স্নুমপা ও তারনাথ উভয়েই বলেছেন, রাজা ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত এই বিখ্যাত বিহারটি মগধের উত্তরে কোনো একটি স্থানে গঙ্গার তীরে একটি পাহাড়ের উপরে ছিল এবং তিব্বতবাসীরা এটিকে বিক্রমশীল বিহার বলে জানতেন। 'অতীশের জীবনী'—যা শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতী থেকে অনুবাদ করেছেন—সেখানেও বিক্রমশীল বিহারের বর্ণনা এইভাবেই দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে অবশ্য আরও কিছু বিবরণ আছে।

বিক্রমশীল বিহারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ধর্মপাল না দেবপাল? এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, অন্য এক সূত্র অনুসারে দেবপালই এই বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "অন্য এক সূত্র" বলতে তিনি কোর্দিয়ে-রচিত গ্রন্থতালিকার এক বিশেষ অংশ উল্লেখ করেছেন। এখানে 'রত্ন করণ্ড উদ্ঘাট নাম মধ্যমক উপদেশ' গ্রন্থটির নাম করা হয়েছে। তাঞ্জুরে তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত এই গ্রন্থটি দীপংকরের রচনা। এই তিব্বতী অনুবাদের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, দীপংকর বিক্রমশীল বিহারে শিষ্য ছুলঠিম জলবার কাছে গ্রন্থটি বিবৃত করেন। এই বিহারটির বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য 'থুগদম' এই তিব্বতী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোর্দিয়ে তার অর্থ করেছেন, দেবপালের সংস্থান বা দেবপালের দানে সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। 'থুগদম' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিজ্ঞা, পবিত্র সংকল্প, প্রার্থনা ইত্যাদি, কিন্তু প্রতিষ্ঠা নয়। সম্ভবত দেবপাল এখানে কোনো পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন কিংবা বিহারটির উন্নতির জন্য কিছু করেছিলেন। কিন্তু এই পুষ্পিকার তথ্য থেকে দেবপালকে কোন মতেই বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বলে নির্দিষ্ট করা যায় না।

শরৎচন্দ্র দাস তাঁর অনুবাদে বলেছেন, "শ্রী নালন্দার বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের

সুপণ্ডিত আচার্য কম্পল মহামুদ্রার গুহ্যসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি একদিন গঙ্গার তীরে একটি পাহাড়ের আকৃতি দেখে চমৎকৃত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে স্থানটি বিহার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সর্বভাবেই যোগ্য, রাজানুকুল্য পেলে সংঘের জন্য এখানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করা যায়। দিব্যজ্ঞানবলে তিনি জানলেন যে ভবিষ্যতে এখানে একটি প্রসিদ্ধ বিহার নির্মিত হবে। কথিত আছে যে এই কম্পল পরে বিখ্যাত নৃপতি ধর্মপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই পাহাড়ের উপর বিক্রমশীল বিহার নির্মাণ করেন। বিহারে তিনি চারটি সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের চারটি প্রধান শাখার প্রতিটির সাতাশ জন করে ভিক্ষু এর এক একটি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।"

তিব্বতী সূত্র অনুসারে ধর্মপালই বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। তিব্বতের ঐতিহাসিকরা অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মপাল ও দেবপালকে এক করে ফেলেছেন, এঁদের জন্ম-বিবরণী প্রসঙ্গে একই কিংবদন্তী উল্লেখ করেছেন। কোর্দিয়ে তাঁর গ্রন্থপঞ্জীর পুষ্পিকায় দেবপালকে এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বলে চিহ্নিত করলেও ঐতিহাসিকভাবে ধর্মপালই এই বিহারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

বিক্রমশীল বিহারটি ঠিক কোথায় ছিল, সে বিষয়েও পণ্ডিতেরা একমত নন। কানিংহামের মতে প্রাচীন নালন্দা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে এবং প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগীরের ছয় মাইল উত্তরে পাটনা জেলায় বর্তমান সিলাও গ্রামটিতেই হয়তো এই বিহারটি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শরৎচন্দ্র দাস বলেন ভাগলপুরের নিকটে আধুনিক সুলতানগঞ্জেই সম্ভবত এই বিহারটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মোটামুটি এই মত সমর্থন করেন। তিব্বতী পণ্ডিত গেনদুন ছোইফেলও এই অঞ্চলেই বিক্রমশীল বিহারের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

'কলকাতা থেকে গয়া যাবার পথে সুলতানগঞ্জ নামে একটি (রেল) স্টেশন পড়ে। এই সহরের কাছে গঙ্গার মধ্যবর্তী একটি ছোট পাহাড়ের উপরে একটি মন্দির আছে। গঙ্গার এই দিকে (অর্থাৎ সুলতানগঞ্জের দিকে) একটি প্রস্তরস্তূপ আছে। এটিই বিক্রমশীল বিহারের ধ্বংসাবশেষ (বলে মনে হয়)।'

অপর এক গবেষক ভাগলপুর জেলায় বর্তমান পাথরঘাটাকেই বিক্রমশীল বিহার বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ এই মত সমর্থন করেন, অনেকে আবার করেন না।

প্রধানত তারনাথ, সুমপা প্রমুখ তিব্বতী ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসরণ করে এই বিখ্যাত বিহারটির সঠিক স্থান-নির্দেশ করবার চেষ্টা হয়েছে। নাগছো ছুলঠিম জল্‌বা অর্থাৎ জয়শীল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই বিহারের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা তাঁদের খননকার্যের ফলে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহারের অবস্থান সম্পর্কে যেরকম নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন, বিক্রমশীল বিহার সম্পর্কে সেরকম অকাট্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এখনো আমরা পাইনি। তাই বিক্রমশীল বিহার ঠিক কোথায় ছিল এ নিয়ে এখনো পণ্ডিতমহলে নানা অনুমান ও গবেষণা চলেছে, কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করা এখনো সম্ভব হয়নি।

১৬। ওদন্তপুরী ও সোমপুরী

তিব্বতের ঐতিহাসিকদ্বয় তারনাথ ও সুমপার মতে ধর্মপাল যে বৌদ্ধবিহারগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে বিক্রমশীল বিহারই সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তিব্বতের অপর ঐতিহাসিক বুতোনের মতে ধর্মপাল একটিমাত্র বিহারই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই বিহারটির নাম ওদন্তপুরী বিহার। এই বিহার প্রতিষ্ঠা ও ধর্মপালের জন্মের কথা বলতে গিয়ে তিনি একটি গল্প বলেছেন। বুতোন বলেছেন, গোপালকে বশ করবার জন্য তাঁর রাণী এক ব্রাহ্মণের কাছে জাদুমন্ত্র চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হিমালয় থেকে বশীকরণের ওষুধ এনে রাণীর দাসীর হাতে দেন। সে একটি সেতু পার হবার সময়ে পড়ে যায় আর ওষুধটিও তার হাত থেকে পড়ে ভেসে গিয়ে সমুদ্রের জলে পেঁছায়। নাগরাজ সেটি পেয়ে খেয়ে নেন। তারপর সেই ওষুধের প্রভাবে তিনি রাণীর বশীভুত হয়ে পড়েন। তাঁদের উভয়ের মিলনে শ্রীমৎ ধর্মপাল জন্ম নেন। ধর্মপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন। তখন তিনি একটি সর্বোত্তম মন্দির নির্মাণ করতে চাইলেন। সেই উদ্দেশ্যে দৈবজ্ঞদের পরামর্শ নিলেন। দৈবজ্ঞরা বললেন, যোগী ও ব্রাহ্মণদের সুতো (সুতী কাপড়) থেকে পলিতা তৈরি করতে হবে, রাজা ও বণিকদের গৃহ থেকে তেল সংগ্রহ করতে হবে, পূজাস্থান থেকে দীপ সংগ্রহ করতে হবে। তারপর সেই দীপটি জ্বালিয়ে কুলদেবতার সম্মুখে রাখতে হবে। সেই সময় রাজা প্রার্থনা করতে থাকবেন, তাহলে ধর্মপালের (?) সর্প এসে প্রদীপটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যেখানে প্রদীপটি গিয়ে পড়বে, সেইখানেই মন্দিরটি নির্মাণ করতে হবে।

সেইভাবে করা হলে সেখানে হঠাৎ কোথা থেকে এক দাঁড়কাক এসে উপস্থিত হল। সে প্রদীপটিকে তুলে নিয়ে হ্রদে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তখন সেই তরুণ রাজা খুবই মুস্কিলে পড়লেন, মর্মাহতও হলেন। রাত্রে নাগরাজ তাঁর পাঁচটি সর্পশির সহ তাঁকে দর্শন দিয়ে (সান্ত্বনা দিলেন), বললেন যে তিনিই ধর্মপালের পিতা। হ্রদটি তিনি জলশূন্য করিয়ে দেবেন। ধর্মপাল সেখানেই মন্দির নির্মাণ করবেন। সেজন্য সেইস্থানে সাত সপ্তাহ ধরে পূজার্চনা করতে হবে। ধর্মপাল সেইভাবে করলেন। তারপর একুশ দিনে হ্রদটি শুকিয়ে গেল এবং ওদন্তপুরী বিহারটি সেখানে নির্মাণ করা হল।

ধর্মপালের জন্ম এবং ওদন্তপুরী বিহার নির্মাণ সম্পর্কে বুতোন যে কাহিনী দিয়েছেন, তারনাথ ও সুমপা আবার সেই একই কাহিনী দেবপালের জন্ম ও সোমপুরী বিহার সম্পর্কে বলেছেন। তারনাথ বলছেন,

"রাজা দেবপাল। কেউ কেউ তাঁকে নাগসন্তান বলে থাকেন। আমার ধারণায় তিনি গোপালেরই বংশধর। যাই হোক, প্রচলিত কাহিনী মতে, গোপালের কনিষ্ঠা মহিষী মন্ত্রবিদ্যাধর এক ব্রাহ্মণের কাছে রাজাকে বশীকরণের উপকরণ চেয়েছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ হিমালয় থেকে ঔষধি সংগ্রহ করে তাকে মন্ত্রপূত করলেন, বললেন, 'এই

ঔষধি খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে একটি মুখবন্ধ পাত্রে করে সেটি রাজার কাছে পাঠাতে হবে।' রাণী সেইভাবে আহার্য তৈরি করে রাজার কাছে পাঠালেন। এক দাসী সেই পাত্রটি নিয়ে যাচ্ছিল, নদী পার হবার সময় তার হাত থেকে সেটি জলে পড়ে ভেসে গেল। জলের স্রোতে সেটি নাগলোকে এসে পেঁছিল। নাগরাজ সাগরপাল সেই পাত্রটি তুলে খাবারটি খেয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপালের রাণীর বশীভূত হয়ে পড়লেন। গোপালের মূর্তি ধারণ করে তিনি এলেন ও রাজমহিষীর সঙ্গে মিলিত হলেন। রাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হওয়াতে গোপাল তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। রাণী রাজাকে বললেন, সেই বিশেষ সময়ে রাজা স্বয়ং তাঁর কাছে এসেছিলেন। রাণীর সন্তান জন্মাবার পর দেখা গেল তার মস্তকটি নাগের এবং তার আঙুলে একটি আংটি—আংটিতে নাগ বর্ণলিপির একটি অক্ষর খোদিত ছিল। তখন জানা গেল যে সে নাগরাজের সন্তান। গোপালের মৃত্যুর পরে তাকে রাজা করা হল। পূর্ববর্তী রাজাদের চেয়ে তাঁর খ্যাতি ও সমৃদ্ধি অনেক বেশি হল। তিনি বরেন্দ্র আপন শাসনভুক্ত করলেন। তাঁর ইচ্ছা হল যে তিনি একটি বিশেষ মন্দির নির্মাণ করবেন। সোমপুরী বিহার এইভাবেই নির্মিত হল।'

সোমপুরী বিহার নির্মাণ প্রসঙ্গে অধিকাংশ তিব্বতী সূত্রে একই কাহিনী পাওয়া যায়। এই কাহিনী মতে, জ্যোতিষী রাজাকে বলেছিলেন: শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের বস্ত্র থেকে সলিতা প্রস্তুত করুন; রাজা ও বণিকদের প্রাসাদ থেকে তৈল সংগ্রহ করুন, আশ্রম থেকে প্রদীপ সংগ্রহ করে সেটিকে জ্বালিয়ে কুলদেবতার সম্মুখে রাখুন, তারপর প্রার্থনা করুন। (আপনার প্রার্থনা শুনে) ধর্মপালের অবতার এসে সেই প্রদীপটিকে তুলে যেখানে ফেলবেন, সেখানেই মন্দিরটি নির্মাণ করবেন। (এই কার্যের) ফলে রাজার শক্তি ও খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে, তিনি পরোপকারী বলে কীর্তিত হবেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্মপাল ও ওদন্তপুরী বিহার এবং দেবপাল ও সোমপুরী বিহার—এই উভয় প্রসঙ্গেই তিব্বতে একই কাহিনী প্রচলিত আছে। শুধু তাই নয়, তিব্বতী সূত্রে কাশ্মীরে সমুদ্রগুপ্ত মন্দির নির্মাণ সম্পর্কেও একই ধরনের কাহিনী আমরা পাই; আবার দেবপাল ও সহজলীলার জন্ম বিবরণও একই রকম পাওয়া যায়! ঐতিহাসিক তারনাথ তাই বলেছেন, এগুলি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। সুমপাও এই কাহিনীগুলি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

যাই হোক, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান ভারতে যে বৌদ্ধবিহারগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওদন্তপুরী তার মধ্যে অন্যতম।

এবারে ওদন্তপুরী বিহারের কথা বলা যাক। ওদন্তপুরী বিহার সম্পর্কে তারনাথ বলছেন,

গোপাল ও দেবপালের মধ্যবর্তী সময়ে শ্রীওদন্তপুরী বিহার নির্মিত হয়েছিল। মগধের সন্নিকটে কোনোস্থানে নরদ নামে বিশুদ্ধস্বভাব এক যোগী ছিলেন। শবসাধনা করবার জন্যে তাঁর একজন সুস্থ, সবলদেহী, সাহসী, সত্যনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণধী, সকল বিদ্যা ও চারুকলায় পারদর্শী সহযোগীর প্রয়োজন হল। এমন সর্বগুণান্বিত মানুষ বলতে

তিনি এক বৌদ্ধ উপাসককেই পেলেন। শবসাধনার জন্যে সেই উপাসককে অনুরোধ করলে তিনি উত্তরে বললেন যে তীর্থিকের সহযোগী তিনি হবেন না। নরদ তাঁকে বললেন উপাসককে তীর্থিক হতে হবে না। তবে তীর্থিককে সাহায্য করলে তিনি অগাধ ধন লাভ করবেন এবং সেই ধন তিনি স্বধর্ম প্রচার ও প্রসারে ব্যয় করতে পারবেন। উপাসক তখন তাঁর গুরুর অনুমতি নিয়ে এলেন।

যখন সেই শবসাধনা প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে তখন নরদ বললেন যে শবটি তার জিহ্বা বার করা মাত্র সেই জিহ্বাটি ধরতে হবে। প্রথমবারে ধরতে পারলে মহাসিদ্ধি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে আনুপাতিকভাবে সিদ্ধির মাত্রাও কমবে। তৃতীয়বারেও যদি ধরতে না পারা যায় তাহলে শবটি প্রথমে উপাসক ও তীর্থিক এই দুজনকে ভক্ষণ করবে তারপর সমস্ত প্রাণীজগৎ নিঃশেষ করবে। উপাসক প্রথম ও দ্বিতীয়বারে ব্যর্থ হলেন। তৃতীয়বারে তিনি শবের মুখের কাছে মুখ রেখে নিজের দাঁত দিয়ে জিহ্বাটি চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে শবদেহটি স্বর্ণদেহ হয়ে গেল আর জিহ্বাটি তরবারিতে পরিণত হল।

তরবারিটি হাতে নিয়ে উপাসক প্রথমে শবদেহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করলেন, তারপর শূন্যে উড়ে গিয়ে সুমেরুশিখর, চতুর্দ্বীপ ও উপদ্বীপসমূহ প্রদক্ষিণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে তিনি তরবারিটি তীর্থিকের হাতে তুলে দিলেন। তীর্থিক বললেন, "এই স্বর্ণদেহটি তুমি নাও। এই স্বর্ণ তুমি তোমার প্রয়োজনে কোনো সৎকাজে ব্যয় করবে। তাহলে দিনে তুমি এই স্বর্ণদেহের যে অংশটি কেটে নেবে রাতে আবার তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে।"

এই বলে তীর্থিক তরবারিটি হাতে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন আর উপাসক সেই বেতালের স্বর্ণ দিয়ে ওদন্তপুরী নামে বিশাল বিহারটি নির্মাণ করলেন। ওদন্ত অর্থে 'ফুরজ্যেদ' বা এই তিব্বতী শব্দটির বাংলা অনুবাদে 'উড়ন্ত'। উপাসক আকাশে উড়ে গিয়ে চতুর্দ্বীপসহ পর্বত দেখেছিলেন। তার অনুকরণেই তিনি ওদন্তপুরী বিহার নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর নাম হয়েছিল উন্ন উপাসক।

কোনো রাজা বা মন্ত্রী এই মন্দির নির্মাণ করেন নি। এই মন্দির ও মূর্তি ইত্যাদি যে কারিগর ও শিল্পীরা নির্মাণ করতেন, বেতালের স্বর্ণ থেকেই তাদের আহার ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হত। পাঁচশো ভিক্ষু ও পাঁচশো উপাসকের ভরণপোষণও এই স্বর্ণ থেকে হত। এই স্বর্ণ অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না বলে মৃত্যুর পূর্বে উপাসক সেই স্বর্ণবেতালটি মাটিতে পুঁতে ফেললেন; প্রার্থনা করলেন, যেন ভবিষ্যতে সকল জীবের কল্যাণে এই স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়। (ওদন্তপুরী) মন্দিরটি তিনি দেবপালকে দিলেন।

সুমপা ওদন্তপুরী নির্মাণ সম্পর্কে এই ধরণেরই একটি গল্প বলেছেন; (বেতালের) সেই স্বর্ণ দিয়ে উন্ন চতুর্দ্বীপ সমন্বিত সুমেরুর অনুকরণে নালন্দার নিকটে ওদন্তপুরী বিহার নির্মাণ করলেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। বুতোন বলেছেন, ওদন্তপুরী

ধর্মপাল নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু তারনাথ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন, যে ওদন্তপুরী কোনো রাজা বা মন্ত্রী নির্মাণ করেন নি। এক বৌদ্ধ উপাসক অলৌকিক ভাবে স্বর্ণ সংগ্রহ করে এই বিহারটি নির্মাণ করেন এবং রাজা দেবপালকে এই ওদন্তপুরী বিহার সমর্পণ করেন। আবার সোমপুরী বিহার যে ধর্মপালের দ্বারা নির্মিত, তিব্বতের ঐতিহাসিকরা তা কোথাও বলেন নি। তিব্বতী কাহিনীতে দেবপালকেই এই বিহারের নির্মাতা বলা হয়। তারনাথ ও সুমপাও তাই বলেছেন। অথচ আমরা জানি সোমপুরী বিহারই একমাত্র বিহার যা ধর্মপাল নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিকভাবে তা প্রমাণিতও হয়েছে।

রাজসাহী জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের) পাহাড়পুরে খননকার্যের ফলে সোমপুরী বিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে একটি মৃৎফলকে উৎকীর্ণ এই চরণটি পাওয়া গেছে ·

—"শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহারীয়-আর্যভিক্ষুসংঘস্য" ইত্যাদি অর্থাৎ "ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত শ্রীসোমপুর মহাবিহারের আর্য ভিক্ষু সংঘ" দ্বারা প্রচারিত। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ নিঃসন্দেহ ভাবেই পাওয়া গেছে। নিকটবর্তী ওমপুর গ্রামের নামের মধ্যেও এই বিহারের নামটি রক্ষিত হয়েছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন সিলমোহরের লেখনে জানা যায় যে ধর্মপাল সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

বিক্রমশীল বিহারের মতোই ওদন্তপুরী বিহারের সঠিক স্থানটি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা এখনও খুঁজে পাননি। সুমপার বিবরণ উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র দাস এই প্রসঙ্গে বলেছেন, এই বিহারটি বর্তমান বিহার শহরের কাছে একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত হয়েছিল। তিব্বতের পণ্ডিত গেনদুন ছোইফেল বলেন, "পাটনা থেকে রাজগীর—এই রেলপথের মধ্যে বিহার-শরিফ নামে একটি স্টেশন পড়ে। এই স্টেশনে এসে পশ্চিমে দৃষ্টি ফেরালে একটি নীচু মাটির ঢিবি চোখে পড়বে। বলা হয়ে থাকে এখানেই ওদন্তপুরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানেই ভারতের এক বিখ্যাত বিহার ছিল এবং তারই অনুকরণে আমাদের সামিয়ে বিহার নির্মিত হয়েছিল। এইখানেই নারোপা থাকতেন ; (তখন) এর নাম ছিল ফুল্লহরি।" নালন্দার উত্তরে এই পাহাড়টিতে ফুল্লহরির অবস্থান ছিল বলে ছাগ লোচাবা তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। মিলারেপা-র বর্ণনার সঙ্গেও এই বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়।

বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী ও সোমপুরী—পরিণত বয়সে দীপংকর এই তিনটি বিহারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিব্বতীদের মতে এদের মধ্যে বিক্রমশীলই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল আর ভারতীয়দের মতে সে যুগে সোমপুরীই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। সোমপুরীর উত্থান ও পতনের যে বিবরণ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দেন, বিক্রমশীল বিহার সম্পর্কে প্রায় তার অনুরূপ

কাহিনী তিব্বতে প্রচলিত আছে। তিব্বতী মতে, ধর্মপাল ও দেবপালের পরে প্রথম মহীপালের ও নয়পালের রাজত্বকালে বিক্রমশীল বিহারের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরে আসে। অতীশকে এই বিহারের অধ্যক্ষরূপে এঁরাই নিয়োগ করেন, দ্বাদশ শতকের শেষে মুসলমান আক্রমণে এই বিহারটি ধ্বংস হয়। ভারতীয় বিবরণে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে দশম শতকের শেষে প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে এই বিহারের সুদিন আবার ফিরে আসে। সেই সমৃদ্ধির কালে বিহারটির আমূল সংস্কার করা হয়। মহীপাল ও তাঁর পুত্র নয়পালের পরে পালসাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়। একে একে চেদীরাজ কর্ণ, চোলরাজ রাজেন্দ্র ও কৈবর্তরাজ দিব্যর আক্রমণে বাংলাদেশ পর্যুদস্ত হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে মুসলমান আক্রমণে এই মন্দির ও বিহারটি পরিত্যক্ত ও জনশূন্য হয়ে যায়।

বিক্রমশীল বিহার সম্পর্কে তিব্বতে এই ধরনের কাহিনীই প্রচলিত আছে। সম্ভবত পূর্বভারতে পালরাজারা যে বিহারগুলি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, তাদের সবগুলিরই এই পরিণতি ঘটেছিল। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যে সময়ে মহীপাল ও নয়পাল বিহার সংস্কার করেছেন সেই কালেই সম্ভবত অতীশ সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফিরে এসেছেন (আনুমানিক ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং তার কিছুদিন পরেই তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। এই সাদৃশ্যের জন্যই হয়তো দুটি বিহারের ঘটনাবলীর বিবরণ একরকম হয়েছে।

তিব্বতের কাহিনীগুলিতে সোমপুরী বিহারে দীপংকরের কার্যকলাপের বিশেষ উল্লেখ নেই। অন্য দুটি সূত্র থেকে এ সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। কোর্দিয়ে-র গ্রন্থতালিকার পুষ্পিকা থেকে জানা যায়, জ্যা লোচাবা চোনডুই সেংগে এবং নাগছো ছুলঠিম জলবা—এই সোমপুরী বিহারেই দীপংকরের অধীনে ভব্য বা ভাববিবেকের 'মধ্যমকরত্নপ্রদীপ' গ্রন্থটি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই দীর্ঘ ও দুরূহ গ্রন্থটি অনুবাদ করতে নিশ্চয়ই বেশ কিছুকাল গুরু ও তাঁর শিষ্যদ্বয়কে সোমপুরী বিহারে কাটাতে হয়েছিল।

নাগছো ছুলঠিম জলবা তাঁর স্তোত্রে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "সোমপুরী বিহারে যখন আপনি 'তর্কজ্বালা' উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন বলেছিলেন তার কুড়ি বৎসর পরে তিব্বতে আপনি দেহরক্ষা করবেন। তার দুবছর পরে তিব্বতযাত্রার জন্য যখন আপনি বিক্রমশীল ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন আবার বলেছিলেন যে তার আঠারো বছর পরে আপনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করবেন।" অতীশের এই দুই তিব্বতী শিষ্য বিক্রমশীল বিহারে শিক্ষার্থী হয়ে বাস করেছেন।

ছুলঠিম জলবা ভারতবর্ষে দুবৎসর ছিলেন। এই দুই বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তিনি বিক্রমশীল বিহারে কাটান। তাঁর স্তোত্রে তিনি 'তর্কজ্বালা' নামে যে গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন, সেই গ্রন্থটি মাধ্যমিক-স্বাতন্ত্রিক আচার্য ভব্য বা ভাববিবেকের রচনা। তাঁর মূলগ্রন্থ 'মধ্যমক-হৃদয়কারিকা'-র এটি স্বরচিত ভাষ্য। তিব্বতী তর্জমায় ভাষ্যটির চরণসংখ্যা ৫৩৮৫। দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও লোচাবা ছুলঠিম জলবা

গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।

ওদন্তপুরীর সঙ্গে দীপংকরের সম্পর্ক কী ছিল, তিব্বতের বিভিন্ন কাহিনীতে তার আভাস পাওয়া যায়। সুম্‌পা বলেছেন, "ভেয়পাল বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন, সেই সময়ের মধ্যে (বিক্রমশীলের) ছয় দ্বারপণ্ডিত দেহরক্ষা করেন। তাঁদের পরে জোবোজে (প্রভু) দীপংকর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীলের উপাধ্যায় হলেন। তিনি ওদন্তপুরী বিহারও দেখাশোনা করতেন।" তারনাথও বলেন, 'তারপর রাজা ভেয়পাল। এই রাজার রাজত্বকালে ছয় দ্বারপণ্ডিতের পরে অতীশ বিক্রমশীলের উপাধ্যায়ের পদে বৃত হলেন ; ওদন্তপুরীও তিনি তত্ত্বাবধান করেছেন।"

দীপংকর বিক্রমশীল বিহারের উপাধ্যায় ছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি ওদন্তপুরী বিহারের প্রতিপালকও ছিলেন। এই দুটি পদ যে ভিন্ন ছিল তা বোঝাবার জন্যই তিব্বতের ঐতিহাসিকরা উপাধ্যায় ও প্রতিপালক অর্থে দুটি পৃথক তিব্বতী শব্দও এখানে ব্যবহার করেছেন।

এবারে বিক্রমশীল বিহারে দীপংকরের কার্যাবলীর সন্ধান নেওয়া যাক।

১৭। বিক্রমশীলে দীপংকর

তিব্বতী সূত্র থেকে আমরা জানি যে ওদন্তপুরী ও সোমপুরী বিহারের সঙ্গে অতীশের নাম যুক্ত থাকলেও, ভারতে বিক্রমশীল বিহারই তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। মহীপাল ও নয়পাল উভয় নৃপতিই তাঁকে বিক্রমশীল বিহারের প্রধান আচার্যের পদে বরণ করেছিলেন। মহীপাল যখন অতীশকে এই পদে নিয়োগ করেন, তখন বিক্রমশীল বিহারে আরও সাতান্নজন দিক্‌পাল পণ্ডিত ছিলেন।

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, রাজা প্রথম মহীপাল আনুমানিক ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এবং নয়পাল ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা হয়েছিলেন। দীপংকর ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে সুবর্ণদ্বীপ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে ভারত ত্যাগ করে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিব্বতী সূত্র অনুসারে ছুলঠিম জলবা-র নেতৃত্বে যখন তিব্বতরাজ-এর প্রতিনিধিদল অতীশকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ভারতে আসেন, অতীশ তখন বিক্রমশীল বিহারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নয়পাল রাজা হবার পরে তিনি দীপংকরকে বিক্রমশীলের আচার্যপদে নিয়োগ করেন একথা যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফেরার পরে দীপংকরের পরিণত জীবনের তেরো বছরের কার্যকলাপের কোনো হিসাব আমরা পাই না। তাই মনে হয় নয়পাল নয়—প্রথম মহীপালের রাজত্বকালেই অতীশ বিক্রমশীল বিহারের আচার্য হয়েছিলেন। তিব্বত যাত্রাপথে নেপাল থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ অতীশ 'বিমলরত্নলেখনাম' গভীর স্নেহপূর্ণ পত্রটিতে তরুণ নৃপতি নয়পালকে প্রকৃত রাজধর্ম পালনের উপদেশও দিয়েছিলেন।

বিক্রমশীল বিহারে অতীশ ঠিক কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে সম্পর্কে বলতে

গিয়ে গোই লোচাবা তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, অতীশ অধিকাংশ সময় বিক্রমশীল ভিক্ষুবিদ্যায়তনের মহাস্থবির রূপে কাটান। আবার গ্রন্থের অন্যত্র গোই লোচাবা অন্য কথাও বলেছেন : অতীশ যখন তিব্বত যাত্রা করেন তখন আচার্য শীলাকর বিক্রমশীলের মহাস্থবির ছিলেন। সুমপার মতে অতীশ শুধুমাত্র বিহারের উপাধ্যায়ই ছিলেন না, উপাধিবারিক পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন : অর্থাৎ বিক্রমশীল বিহারের শিক্ষাদীক্ষা, পরিচালনা ও শৃংখলারক্ষার গুরুদায়িত্বও তিনি বহন করেছেন।

তিব্বতে অতীশের আমন্ত্রণ ও বিক্রমশীল বিহার থেকে অতীশ কর্তৃক জনৈক তান্ত্রিকের বহিষ্করণ—এই দুটি ঘটনা আলোচনা করলেই বিক্রমশীল বিহারে অতীশের এই দ্বৈত ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে।

গোই লোচাবার সংক্ষিপ্ত বিবরণে তিব্বত রাজের আদেশে নাগছো ছুলঠিম জলবা অতীশকে আমন্ত্রণ জানাতে ভারতে এসেছিলেন। জ্যার চোনড়ুই সেংগে তখন বিক্রমশীল বিহারে শিক্ষার্থীরূপে বাস করছিলেন। তাঁরা উভয়েই তিব্বতে যাবার জন্য অতীশকে অনুনয়বিনয় করলেন। অতীশ অবশেষে সম্মত হলেন, কিন্তু বললেন বিক্রমশীলের স্থবির সম্ভবত তাঁকে যেতে দিতে চাইবেন না। নাগছোকে অতীশ আরও বললেন, তিনি যে অতীশকে নিয়ে যেতে এসেছেন, একথা যেন কেউ জানতে না পারেন। বরং তিনি শিক্ষালাভের জন্য এদেশে এসেছেন একথা প্রচার করে যেন অধ্যয়নে মন দেন। নাগছো সেই মত করলেন।

বিক্রমশীলের স্থবির সম্মত হবেন না এই আশংকায় অতীশ তাঁর তিব্বত যাত্রার সিদ্ধান্ত সর্বাংশে গোপন রেখেছিলেন। তাঁর যাত্রার পূর্বমুহূর্তে স্থবির শীলাকর তা জানতে পারেন ; নাগছোকে তিনি বলেন, "হে আয়ুষ্মন্, ধারণা ছিল যে এখানে তুমি অধ্যয়নের জন্যই এসেছো, কিন্তু কার্যত তুমি আমাদের পণ্ডিতকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছো, আর পণ্ডিতও যেন তাতে বেশ খুশিই হয়েছেন। তাঁর যাত্রায় আমি বাধা দেব না। কিন্তু তিন বছরের বেশি যেন তিনি তিব্বতে না থাকেন, তার পরে পণ্ডিতকে অবশ্যই ভারতে ফিরিয়ে দিতে হবে।" শরৎচন্দ্র দাস অনূদিত অতীশের জীবনী'তে একই ধরণের বিবরণ পাওয়া যায়, শুধু সেখানে বিক্রমশীলের স্থবিরের নাম বলা হয়েছে রত্নাকর। এখানে আরও বলা হয়েছে, বীর্যসিংহ বা চোনড়ুই সেংগের সঙ্গে নাগছো ছুলঠিম জলবার দেখা হল। বীর্যসিংহ তাঁকে বললেন, "ভারতে রত্নকীর্তি, বৈরোচনরক্ষিত, নেপালের কনকশ্রী ইত্যাদি বহু পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের মত অতীশের চারপাশে আছেন, কিন্তু তিব্বতে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। সুপ্রাজ্ঞ ও নৈতিকগুণে ভূষিত অতীশকে যদি আমরা তিব্বতে নিয়ে যেতে পারি, তবেই কাজ হবে। তুমি যে অতীশকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছো, একথা প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।" তিনি নাগছোকে স্থবির রত্নাকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, "এই বিহারে স্থবির রত্নাকর সবচেয়ে প্রভাবশালী, সংঘারামের তিনি সর্বাধ্যক্ষ এবং অতীশের চেয়ে উচ্চপদাধিষ্ঠিত। তুমি তাঁর কাছে

অধ্যয়ন করবে। তোমার ব্যবহার ও অধ্যয়নে নিষ্ঠা দ্বারা তাঁর বিশ্বাস অর্জন করবে। অতীশ যখন আসবেন তখন আমাদের দেশ পরিদর্শনের জন্য আমরা তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাব।"

এখানে বিক্রমশীল থেকে তিব্বতযাত্রার প্রস্তুতিপর্বের শেষ স্তরের বর্ণনায় আমরা পাই, অতীশ বীর্যসিংহ ও জয়শীলকে উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা এই যাত্রার সংবাদ যেন গোপন রাখেন।

শেষ পর্যন্ত অতীশ তাঁর ব্যবহারসামগ্রী মিত্রবিহারে নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন এবং তাঁর বিবিধ কার্যভার বিহারের কর্তৃপক্ষকে প্রত্যর্পণ করতে লাগলেন। যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, কিন্তু স্থবির রত্নাকরের বিরক্তি উৎপাদনের আশংকায় তাঁরা নিঃশব্দে, সবার অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। নাগছো ত্রিশটি ভারবাহী বৃষের কাঁধে তাঁদের ষাটটি মোট চাপালেন। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই মধ্য রাত্রে গঙ্গা পার করে তাদের রওনা করা হল। তিনি ভারত ত্যাগ করে যাচ্ছেন, এ সন্দেহ যাতে কেউ না করেন, তাই অতীশ অষ্ট বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করবার ইচ্ছা জানালেন। একদিন সকালে তিনি স্থবির রত্নাকরের বাসস্থানে গিয়ে বললেন, "হে শ্রদ্ধেয়, তিব্বতের এই আয়ুষ্মানদের ভারতের পবিত্র মহাতীর্থগুলি দর্শন করানো প্রয়োজন।" স্থবির বললেন, "উত্তম প্রস্তাব। আপনি যদি সে উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব এবং প্রতিটি তীর্থ দর্শন করে আমরা উভয়ে একত্রে ফিরে আসব।" নাগছোর পরিকল্পনামত অতীশ যাত্রা করছেন বুঝতে পেরে বিক্রমশীলের এক তরুণ ভিক্ষু বললেন; "আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কাছে গুরু অতীশ নয়নের মণির মত; তাঁর অন্তর্ধান আমাদের কাছে অন্ধত্বেরই সমান, তিনি চলে গেলে আমরা দৃষ্টিহীন হয়ে যাব। আমাদের রাজার কাছে আপনাদের এই মতলবের কথা যদি জানিয়ে দিই, তাহলে আপনাদের প্রাণ সংশয় হবে; কিন্তু আমি কিছু বলব না। আমাদের গুরুকে নিয়ে তিব্বতে যাবেন, দেখবেন পথে যেন কোন দুর্ঘটনা বা তাঁর কষ্ট না হয়। যে উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন, সেই উদ্দেশ্য সার্থক হলে তাঁকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।"

অতীশ গোপনে নাগছোকে বললেন, "আমাদের আসন্ন তিব্বত যাত্রার পথে আমরা প্রথমে বজ্রাসনে যাব।" বজ্রাসন ও অন্যান্য তীর্থে পূজাদান সেরে তাঁরা বিক্রমশীলে ফিরে এলেন। স্থবির রত্নাকর ও ষাট জনের মত সঙ্গীও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলেন। অতীশ তখন স্থবির রত্নাকরের কাছে নেপালে স্বয়ম্ভূচৈত্যে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্থবির রত্নাকর স্পষ্টই বুঝতে পারলেন সে তিব্বত যাত্রার উদ্দেশ্যেই অতীশ নেপালে যেতে চান। এর পরের বিবরণ গোই লোচাবা প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ।

সুমপাও এই স্থবিরের নাম রত্নাকরই বলেছেন। এঁর কাছেই নাগছো ছুলঠিম জলবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিন বৎসর পরে অতীশকে তিনি ভারতে ফিরিয়ে আনবেন।

এই বিবরণগুলি থেকে স্পষ্টই মনে হয় দীপংকরের সময়ে বিক্রমশীল বিহারের

স্থবির অন্য কেউ ছিলেন এবং দীপংকর তাঁর তিব্বত যাত্রার পরিকল্পনা এই স্থবির ও অন্যান্যদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। স্থবির রত্নাকরের বিশেষ অনুজ্ঞায় এবং তিব্বতের রাজদূতের অনুনয়-বিনয়ে অতীশ তিব্বত পরিদর্শন করেছিলেন—জনৈক পণ্ডিতের এই মন্তব্য তাই যুক্তিসহ নয়।

সেই সময় অতীশ হয়তো সংঘারামে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু সংঘের শৃংখলারক্ষার জন্য তাঁকে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়েছে! সুমপার গ্রন্থ থেকে তার একটি উদাহরণ দেখা যাক। সুমপা বলেছেন, সেই সময় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত নারোপার দর্শন পেয়ে বৌদ্ধদীক্ষা গ্রহণ করলেন। রত্নাকরশান্তির কাছে অধ্যয়ন করে তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করলেন। বিক্রমশীলে তিনি তন্ত্র ও সূত্র উভয়ই অধ্যয়ন করলেন। শিক্ষালাভ কালে তিনি দুধকে মদে রূপান্তরিত করে পান করতেন। সেই সংঘের উপাধিবারিক তাকে সংঘ থেকে বহিষ্কৃত করলেন। তারপর (সেই ব্রাহ্মণ) চর্মের উপর বসে গঙ্গা পার হওয়া ইত্যাদি সিদ্ধির অনেক লক্ষণ দেখালেন তাঁর চারজন বিখ্যাত শিষ্যের নাম নটকেন, দেবাকরচন্দ্র রামপাল এবং বজ্রপাণি।

ইনি মৈত্রীগুপ্ত ও পরে সর্বেশ্বর নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রভূত প্রভাবশালী ছিলেন। শ্রীপর্বতে গিয়ে তিনি শবরীর রামধনুদেহ (প্রাপ্তি) দেখে ফিরে এলেন। ষষ্ঠ দ্বারপালের তিরোধানের অব্যবহিত পরের ঘটনা এটি।

অন্যত্র 'অতীশের জীবনী'তে এই বহিষ্কারের এক বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই বিহারে এক শ্রেণীর তান্ত্রিক ছিলেন, তাদের কিংসুখ বলা হত। কোন সময়ে সেই দলের মৈত্রী নামের একজনকে আচার-আচরণের নিয়মভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অন্য এক সময়ে মৈত্রীর কাছে মদ পাওয়া গেল; এক যোগিনীর সঙ্গে সাধনার সময়ে তাকে দেবার জন্য সে গোপনে ঐ মদ রেখেছিল। সংঘ ঘটনাটি জেনে প্রচণ্ড রুষ্ট হলো এবং মৈত্রীকে বিতাড়িত করবার সিদ্ধান্ত নিলো। মৈত্রী সেই সিদ্ধান্ত মানলেন না। তার ফলে সংঘের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। একদল মৈত্রীর পক্ষ নিলেন, অন্যরা তার প্রবল বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মৈত্রীর বহিষ্কার কার্যকর করা হল। গুরুতর অপরাধের জন্য তাকে বিহারের প্রধান দ্বার দিয়ে নয়, প্রাচীরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে হল।

সুমপার বিবরণ থেকেও জানা যায় যে অতীশ যে তান্ত্রিক বৌদ্ধভিক্ষুকে বহিষ্কার করেছিলেন, তিনি বিশেষ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

এই ঘটনা থেকে আরও বোঝা যায় যে অতীশ বিক্রমশীল বিহারের সর্বাধ্যক্ষ না হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। চোনডুই সেংগে বা বীর্যসিংহ এবং ছুলঠিম জলবা অর্থাৎ জয়শীল অতীশকে তিব্বতে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য তাঁরা প্রথমেই বিহারের সর্বাধ্যক্ষের কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেন। উত্তরে অধ্যক্ষ রত্নাকর বলেন, "হে আয়ুষ্মন্, অতীশের অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পণ্ডিতই এখানকার ভিক্ষুদের নৈতিক শৃংখলা রক্ষা করতে পারবেন না। মগধের বহু সংঘারামের গুরুদায়িত্বপূর্ণ

পদে তিনি অধিষ্ঠিত। এই সব কারণেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন।"

এখানে 'অতীশের জীবনী'র তিব্বতী বিবরণ থেকে কিছুটা সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। নাগছো ছুল্‌ঠিম জলবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে। বিবরণটি অনেক বিশদ। তাই তার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এখানে দেওয়া হল :

অতীশের দর্শনলাভের জন্য নাগছো ছুল্‌ঠিম জলবা তাঁর স্বদেশবাসী চোনডুই সেংগের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

চোনডুই সেংগে বললেন, "আগামীকাল বিক্রমে (বিক্রমশীলে) সর্বস্তরের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এক বিরাট সমাবেশ হবে। আট হাজার ভিক্ষু সেখানে সমবেত হবেন। তাঁদের মধ্যে রাজোচিত মহিমায় সমন্বিত, উজ্জ্বলকান্তি, শ্রদ্ধার্হ যে ব্যক্তি তাঁকেই অতীশ বলে জানবে।"

নাগছো তারপর বলছেন, "তখন আমি চোনডুই সেংগের সঙ্গে স্থবির রত্নাকরের কাছে গেলাম, গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে প্রণাম জানিয়ে স্বর্ণখণ্ড প্রণামী দিলাম। সকালে ভিক্ষুদের সমাবেশে স্থবির আমাকে শ্রমণদের মধ্যে একটি আসন দিলেন। যখন সব আসনগুলি পূর্ণ হয়ে গেল তখন পরম শ্রদ্ধেয় অতীশ এলেন। তাঁর সুঠাম দেহসৌষ্ঠব ও লাবণ্যময় সস্মিত মুখ দর্শনে সকলে বিমুগ্ধ হল। তাঁর কটিদেশ থেকে একগুচ্ছ চাবি ঝুলছে। তাঁকে দর্শন করে ভারতীয়, নেপালী ও তিব্বতী অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের প্রত্যেকেরই মনে হল, তিনি যেন বিশেষ করে তার নিজের দেশেরই মানুষ।

"তার পরের দিন সকালে এই আচার্য যেখানে দরিদ্রভোজন ও ভিক্ষাদান করছিলেন, সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। একটি ভিখারী বালক তার অংশ না পেয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, 'ভালা হো, ও নাথ অতীশ, ভাত-ওনা, ভাত-ওনা।' (হে নাথ অতীশ, তোমার কল্যাণ হোক, আমাকে ভাত দাও।)

"এই কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হল, আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল। তিনি যখন স্বস্থানে ফিরে চলেছেন, তখন আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। এমনই তন্ময় হয়ে চলেছিলাম যে একটি সেতু পার হবার সময় প্রায় নীচে পড়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে তিব্বতী বলে চিনে তিনি বললেন, 'হে তিব্বতী আয়ুষ্মন্, তোমাদের আন্তরিকতা ও আগ্রহ (আমি জানি), অশ্রুবিসর্জন কোরো না। তিব্বত-বাসীদের—তাদের রাজা ও মন্ত্রীসহ সকলের—প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। নিরুদ্যম না হয়ে আমার জন্য আবার তুমি এসেছো। ত্রিরত্নের কাছে তোমার প্রার্থনা জানাও।' তাঁর মুখনিঃসৃত এই বাণী শোনামাত্র আশা ও আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হল।"

উপরের বর্ণনার প্রামাণিকতা আমাদের জানা নেই, কিন্তু বিক্রমশীলে অতীশের কার্যকলাপের এই বর্ণনা তাঁর এক নিকটতম শিষ্যর কাছ থেকে পাওয়া যায়। বিক্রমশীলে অতীশের অবস্থানকালীন আর একটি বিবরণও একই সঙ্গে পাওয়া যায়। নারোপা এসে এখানে বিক্রমশীলে অতীশকে প্রধান আচার্যপদে নিয়োগ করছেন :

"এই সময়ে গুরু নারোপান্ত বিক্রমশীল বিহার পরিদর্শনে এলেন। ভিক্ষুরা সকলে তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন।

"অতীশ তাঁকে দক্ষিণহস্তে ধরলেন ও জ্ঞানশ্রীমিত্র তাঁর বামহস্ত ধারণ করে ডুলি থেকে নামালেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'প্রভু দীপংকর, সদ্ধর্মের দায়িত্বভার এখন তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।' এই বলে সে দায়িত্বভার তিনি অতীশকেই অর্পণ করলেন। বিনম্রভাবে অতীশ বললেন, 'শ্রদ্ধেয়, চন্দ্রসূর্যের মতো আপনি যেখানে উপস্থিত সেখানে তুলনায় আমি জোনাকিমাত্র—পৃথিবীকে কীভাবে আমি আলোকিত করব ?'

'গুরু নারো বললেন, 'আমি আর বেশিদিন জীবিত থাকবো না, তাই তোমাকে সদ্ধর্মের এই দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে'।"

এরপরে নারো যে আরও কুড়িদিন বিক্রমশীলে ছিলেন, তার মধ্যে একবারও তিনি অতীশের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে কোনো আলোচনা করেন নি। তারপর তিনি দক্ষিণে যাত্রা করলেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর দেহাবশেষের কিছু অংশ অতীশ তিব্বতে নিয়ে এসেছিলেন। ঞেথাং-এর পবিত্র 'ওর' স্তূপে এখনও তা রক্ষিত আছে, বলা হয়। কিন্তু নারো ও অতীশের এই বিবরণটি সম্পর্কে গোই লোচাবা সংশয় প্রকাশ করেছেন।

যাই হোক, বিক্রমশীলে অতীশের কর্মাবলী সম্পর্কে তাঞ্জুরের সাক্ষ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাঞ্জুরে সংগৃহীত অতীশের গ্রন্থরাজির মধ্যে কোনগুলি বিক্রমশীল বিহারে রচিত বা অনূদিত গ্রন্থগুলির পুষ্পিকায় তা পরিষ্কার উল্লিখিত হয়েছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

'কায়বাক্‌চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠা নাম' গ্রন্থের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, "দীপংকর শ্রীজ্ঞান লিখিত, ভারতীয় উপাধ্যায় দীপংকর ও জ্যার লোচাবা চোনড়ুই সেংগে কর্তৃক বিক্রমশীলে সুচারুভাবে অনূদিত ও পুনর্বিচারপূর্বক সংশোধিত।" 'রত্নকরণ্ড উদ্ঘাট মধ্যমক উপদেশ' গ্রন্থের দীর্ঘ পুষ্পিকার একাংশে বলা হয়েছে : "সুশিষ্য ছুলঠিম জলবার অনুরোধে বিক্রমশীলের মন্দিরে দীপংকর শ্রীজ্ঞান কর্তৃক রচিত।"

সূত্র সমুচ্চয় পিণ্ডার্থ" গ্রন্থের পুষ্পিকাটির প্রথমে বলা হয়েছে : "বিক্রমশীলে দীপংকর কর্তৃক সংগৃহীত এবং তাঁর নির্দেশে ও অধীনে চোনড়ুই সেংগে কর্তৃক অনূদিত।" এর পরের অংশটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে বলা হয়েছে : "আচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে ১৪ পল স্বর্ণ ও পুষ্প নিবেদন করে তিব্বতীয় ভিক্ষু ছুলঠিম জলবা তাঁকে তিব্বতে যাবার অনুরোধ জানালেন। তিব্বতে যাত্রাকালে তাঁর (দীপংকরের) প্রিয় শিষ্যরা তাঁর কাছে শেষ উপদেশ চাইলেন। সকল সূত্রের সার এই উপদেশ তিনি তাদের দিলেন। তখন তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে চোনড়ুই সেংগে এই উপদেশগুলি (তিব্বতীতে) অনুবাদ করলেন।"

(তিব্বতে) 'কেরু' মন্দিরে শিষ্যদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে অন্যান্য উপদেশের সঙ্গে দীপংকর এই উপদেশ (মালা) পুনরায় প্রদান করেছিলেন।

"বিক্রমশীল বিহারে জ্যা লোচাবা চোনডুই সেংগে দীপংকরের অধীনে দীপংকরের 'সংসার মনোনির্যানীকার নামসঙ্গীতি' গ্রন্থটি তিব্বতীতে অনুবাদ করেন। এই বিহারেই দীপংকরের অধীনে তাঁর অপর শিষ্য ছুলঠিম জলবা চন্দ্রগোমী রচিত 'আর্য তারাদেবীস্তোত্র মুক্তিকামালা' নামে গ্রন্থটি এবং অন্য এক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ত্রিরত্ন তারাস্তোত্র' অনুবাদ করেন। জ্যা লোচাবা চোনডুই সেংগে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে বিক্রমশীল বিহারে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছেন। তারপরে নাগছো ছুলঠিম জলবা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ভারতীয় কোনো বৌদ্ধপণ্ডিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্য ছুলঠিম জলবা তিব্বতরাজের প্রতিনিধি হয়ে ভারতে এসেছিলেন। তিব্বতের এই কাহিনীগুলির ঐতিহাসিকতা তাঞ্জুরের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়।

তিব্বতে দীপংকরের আমন্ত্রণ ও আগমন কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। তিব্বতের ঐতিহাসিকরা একে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। সেদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের পটভূমিকায় তাঁরা অতীশকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন আর তাঁদের দেশের ইতিহাসকে এক্ষেত্রে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও আমাদের জানা দরকার।

১৮। তিব্বত ও তিব্বতের ঐতিহাসিকগণ

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিব্বতের ইতিহাস বলতে তাঁরা সেদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের বিস্তৃত ইতিহাসই রচনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায়, তিব্বতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, এমনকি তার লিখিত ভাষার উদ্ভাবন—এ সব কিছুই বৌদ্ধধর্মের সর্বাত্মক প্রভাবের ফলে ঘটেছে। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে তিব্বত বৌদ্ধধর্মের স্পর্শেই মুক্ত হয়। তাই সে দেশের ঐতিহাসিকদের রচনায় দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা পেয়েছে ভারত ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ঘটনাবলী।

অষ্টম শতকে চীন ও মধ্য এশিয়ায় সামরিক অভিযানে তিব্বত জয়লাভ করে ও অস্ত্রবলে এশিয়ার অন্যতন প্রধান শক্তিরূপে গণ্য হয়। ঐতিহাসিক বুতোন কিন্তু এইসব যুগান্তকারী ঘটনাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি: অন্যদিকে ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য কমলশীলের কাছে চৈনিক পণ্ডিত কীভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, পাতার পর পাতায় সেই ঘটনাটিকে তিনি অসামান্য গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিব্বতের সফল চীন অভিযান, তুর্কিস্তান দখল, ভারত অভিযান ইত্যাদি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ আমরা প্রধানত চীন থেকে পাই। ঐতিহাসিক গোই লোচাবা কিন্তু এসব ঘটনাগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নি। অথচ বিপুল উৎসাহে তিনি তিব্বতের বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত রিনছেন সাংপোর সঙ্গে দীপংকরের প্রথম

সাক্ষাৎ ও দীপংকর কর্তৃক পন্ডিতের দর্পচূর্ণের বিবরণ প্রভৃতি সবিস্তারে লিখেছেন। বুতোন রিনছেন ড্রুব এবং গোই লোচাবা শোননু পাল এঁরা দুজনেই কিন্তু তিব্বতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বলে সমাদৃত।

এক কথায়, তিব্বতের ইতিহাস বলতে সে দেশের ঐতিহাসিকরা মূলত তার ধর্মীয় ইতিহাসই বুঝেছেন। তাই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তাঁদের রচনায় যথোচিত মর্যাদা পায় নি। বরং সে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে এই সমস্ত ঘটনাবলী কতটা সাহায্য করেছে বা বাধাসৃষ্টি করেছে সেই মানদণ্ডেই তাঁরা এদের বিচার করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁরা প্রথম সম্রাট স্রোংচানগামপো থেকে বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী লাংদারমার রাজত্বকালকে বিচার করেছেন, সপ্তম শতক পর্যন্ত দীর্ঘকালের রাজনৈতিক ইতিহাসকে তাঁরা একেবারেই গুরুত্ব দেন নি। এই সময়টাকে প্রধানত তিব্বতের নবলব্ধ বৌদ্ধধর্ম ও পুরাতন ধর্মবিশ্বাস বোন বা পোন ধর্মের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের কাল বলেই তাঁরা চিত্রিত করেছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা অবশ্য তিব্বতের ঐতিহাসিকদের এই ধর্মনির্ভর মনোভাবের তীব্র সমালোচনাও করেছেন।

কিন্তু তিব্বতের ঐতিহাসিকদের এই বিশেষ প্রবণতার পরোক্ষ সুফলও দেখা গেছে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। তার নির্ভরযোগ্য ইতিহাসও এদেশে আমরা পাই না, কিন্তু তিব্বতের ইতিহাসে ভারত, তিব্বত, চীন ও মোঙ্গলিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের ধারাবাহিক বিবরণ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

ভারতীয় শাস্ত্র-পুরাণসমূহ অনুসরণ করে সেই আদর্শে সৃষ্টিরহস্য, সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার অলৌকিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে তিব্বতের ইতিহাসে নানা পৌরাণিক কাহিনী শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছে। এইগুলি কিন্তু শুধু তিব্বতের ঘটনা নয়—ভারতের মাটিতে যা ঘটেছে, তিব্বতে সেই ঘটনার ধারাকেই ক্রমপ্রসারিত করা হয়েছে। তাই তিব্বতের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে তিব্বতের ইতিহাস ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেরই অবিচ্ছেদ্য অনুবৃত্তি মাত্র। তিব্বতের ইতিহাসে আড়ম্বরপূর্ণ সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য, বিভিন্ন কালের কাহিনী, শাক্যসিংহের বংশবৃত্তান্ত, ইত্যাদি– এগুলির উৎসস্থান ভারত, তিব্বত নয়। ভারতে পরবর্তী কালের বৌদ্ধধর্মেও অলৌকিকতার প্রাবল্য ঘটেছে। এই সময়েই ভারতে বিপুল পরিমাণ মহাযান-সূত্র বা বৈপুল্য-সূত্র রচিত হয়েছে। 'ললিতবিস্তরে' বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী বাস্তবতা বর্জন করে একান্ত অলৌকিক রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এইসব অতিপ্রাকৃত কাহিনীতে আচ্ছন্ন হয়ে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে রূপান্তর ঘটেছে, তিব্বতবাসীরা তাকেই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম বলে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি ভক্তির প্রাবল্যে তাঁরা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্ষ ও স্বদেশ তিব্বতকে অভিন্ন বলে ভেবেছেন, স্বদেশের ইতিহাসকেও ভারতীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত করে তাদের স্বাভাবিক অনুবৃত্তি বলে বিশ্বাস করেছেন। এমন কি তিব্বতের প্রথম রাজা ভারতীয়, ভারত থেকেই তিনি তিব্বতে এসেছিলেন, তাঁদের এই বিশ্বাসের সপক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থনও তাঁরা খুঁজেছেন।

১৯। তিব্বতের প্রথম রাজা

'দেবাতিশয়-স্তোত্র'-এর টীকা উল্লেখ করে বুতোন বলেছেন, "কৌরবদের দ্বাদশ বাহিনীর সঙ্গে যখন পঞ্চপাণ্ডবের সংগ্রাম চলছিল, তখন রাজা রুপতি তাঁর সহস্র যোদ্ধাসহ নারীর ছদ্মবেশে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। তিব্বতবাসীরা এদেরই বংশধর।" শরৎচন্দ্র দাসও একই ধরণের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তিব্বতবাসীরা সাধারণত রুপতিকে তাঁদের আদিপুরুষ ও ঞাঠি চানপোকে তাদের দেশের প্রথম রাজা বলে গণ্য করেন।

সুমপার মতে তিব্বতবাসীদের আদিপুরুষ হনুমান এবং এই হনুমান হচ্ছেন স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর। গোই লোচাবার মতেও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ে রুপতি নারীবেশে তুষারপর্বতে পলায়ন করেছিলেন এবং তাঁর উত্তরপুরুষরাই তিব্বতের প্রথম অধিবাসী। আচার্য প্রজ্ঞাবর্মণ বলেছেন, বর্তমানে তাঁর বংশধরদেরকেই "বোদ" বলা হয়। 'বিনয়বিভঙ্গ' ও 'কালচক্র'-এও এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সুমপার গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এই প্রজ্ঞাবর্মণ কাশ্মীরের এক বৌদ্ধাচার্য, তাঞ্জুর গ্রন্থসংকলনে তাঁর কয়েকটি রচনা সংরক্ষিত আছে। তিব্বতের আদিপুরুষ ভারতীয়, তার প্রথম রাজা ভারতীয়, প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝাবার জন্যই—এই কাহিনীগুলি সে দেশের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বুতোন তাঁর গ্রন্থে তিব্বতের রাজবংশ সম্পর্কে তিব্বতে প্রচলিত বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিব্বতের রাজাদের বংশতালিকা দিতে গিয়ে কেউ বলেছেন, কোশলরাজ প্রসেনজিতের পঞ্চম বংশধরই তাঁদের আদিপুরুষ; কেউবা রাজা বিম্বিসারের কনিষ্ঠ পুত্রের পঞ্চম বংশধরকেই তিব্বতবাসীদের পূর্বপুরুষ বলেছেন। অন্যেরা আবার বলেন, তিব্বত যখন যক্ষ-রক্ষ-দানবদের কবলে ছিল, সেই সময় বৎসরাজ উদয়নের একটি পুত্র হয়। তার চোখের পাতা ঝুলে পড়া, হাতের আঙুলগুলি জোড়া। ছেলের এই বীভৎস চেহারা দেখে রাজা ভয় পেয়ে গেলেন। রাজার আদেশে ছেলেটিকে একটি ধাতুপাত্রে ভরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হল। এক কৃষক জল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে তাকে লালনপালন করল। বড় হয়ে যখন সে এই কাহিনী শুনল, তখন সে মনের দুঃখে হিমালয়ে চলে গেল। ক্রমে সে লহারি ওলপা পার হয়ে চানথাং গোশি-তে এসে পৌঁছোল। সেখানে মুথাগ ও মুগে থেকে "বোন" (পোন) পুরোহিতরা এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে তার দেখা হল। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?" উত্তরে সে বলল, "আমি মহাশক্তিধর"।

তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?" তখন সে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। পুরোহিতরা তাকে দেবতা বলে ঘোষণা করলেন। তারা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারলেন না; "বোন" (পোন) পুরোহিতরা তাকে এক কাঠের সিংহাসনে বসিয়ে নিয়ে চললেন, বললেন, "ইনি আমাদের প্রভু, একে আমাদের রাজা করব।" তাঁর নাম হল, ঞাঠি চানপো বা স্কন্ধবাহিত শক্তিধর। তিব্বতের তিনিই প্রথম রাজা।

তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশ্য তিব্বতের এই প্রথম রাজার বংশধারা নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ বলেছেন, তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের বংশধর। গোই লোচাবা আবার 'মঞ্জুশ্রীমূলতন্ত্র' উল্লেখ করে তিব্বতের রাজাদের লিচ্ছবি বংশোদ্ভূত বলেছেন। শরৎচন্দ্র দাস প্রমুখ কয়েকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তিব্বত-বিশেষজ্ঞরা এ মত মানলেও, রোয়েরিখ তা গ্রহণ করেন নি। ফ্রাঁকের মতে, ঞাঠি চানপোর প্রকৃত ভারতীয় নাম বুদ্ধশ্রী, কোশলরাজ প্রসেনজিতের যে পাঁচজন পুত্র ছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। ফ্রাঁকে তাঁর সংগৃহীত নয়টি শিলালিপিতে লাদাকের রাজাদের পূর্বপুরুষরূপে ঞাঠি চানপো-র নাম পেয়েছেন। ঞাঠিচানপো-র কালবিচার করতে গিয়ে স্মিড্‌ট বলেছেন তিনি ৩১৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মানুষ ; চোমা-দ্য-কোরো ২৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ, স্লাগিনভাইট ও শরৎচন্দ্র দাস ৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বলে তাঁর কালনির্দেশ করেছেন।

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা ঞাঠি চানপোকে তাঁদের প্রথম রাজা বলে গ্রহণ করেছেন, তার অবশ্য কারণও আছে। গোই লোচাবার বিবরণী থেকে জানা যায়, সেই সময় ছোট ছোট বারটি সামন্তরাজ তিব্বত শাসন করত। তারা বা তাদের বংশধররা কেউই বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। ঞাঠি চানপোর বংশধররাই প্রথম বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশত তিব্বতের ঐতিহাসিকরা তাই ঞাঠি চানপোকেই তিব্বতের প্রথম রাজা বলে গ্রহণ করেছেন। প্রসেনজিত বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন, তাই তিব্বতের রাজাদের প্রসেনজিতের বংশোদ্ভূত বলা হয়েছে। বৌদ্ধরাজা রলপাচন-এর রাজত্বকালে যখন তিব্বতের জাতীয় ইতিহাস প্রথম রচিত হল, তখন এই প্রসেনজিত থেকেই তিব্বতের রাজাদের বংশতালিকা প্রস্তুত করা হল।

পেতেকের মতে এই বিবরণের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ওয়াডেল লাসা স্তম্ভলিপির যে বিবরণ দিয়েছেন, মধ্য এশিয়ায় স্যার অরিয়েল স্টেইন যে তথ্যপ্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন, চীনদেশ থেকে যে সব সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে—সে সবগুলির ভিত্তিতে পেতেক ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেন, তিব্বতের আদি রাজা ওদে পুরজল। পরবর্তীকালে সেখানে আমরা ঞাঠি চানপো-র নাম পাই। কিন্তু তিব্বতের প্রাচীন নাম পুরজলবোদ আর এই নামের মধ্যেই প্রাচীন তিব্বতরাজ আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগের আতিশয্যে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা ঞাঠি চানপো-কে তিব্বতের রাজবংশের আদিপুরুষ বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাতে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে স্রোংচানগামপো তিব্বতের প্রথম সম্রাট। ঞাঠি-চানপো ও স্রোংচানগামপো-র মধ্যে দীর্ঘ কয়েক শতকের ব্যবধান—তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ঞাঠি চানপো থেকে স্রোংচান গামপো-র মধ্যবর্তী কালে তারা "বোন" বা "পোন" লোককাহিনী থেকে রাজাদের তালিকা নিয়ে জুড়ে দিয়েছেন। অথচ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে "বোন" বা

"পোন" ধর্মের ভীষণ শত্রুতার কথা সকলেই বলেন, সময়ের গরমিল মেটাতে গিয়েই তিব্বতের ঐতিহাসিকরা এই পথ নিতে বাধ্য হয়েছেন, সন্দেহ নেই।

২০। তিব্বতের পৌরাণিক রাজবংশ

ঞাঠি চানপো থেকে শুরু করে তিব্বতের ইতিহাসে সাতাশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই রাজাদের প্রথম সাতজনের নামের সঙ্গে তাদের রাণীদের নামও দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার সপ্তম রাজার নাম স্রিবাঁঠ চানপো এবং তাঁর রাণীর নাম সাজীন লুংজে। বুতোন বলেছেন এঁদের রাজত্বকালেই দোলপোন বা পোন-ধর্মের আদিরূপ দেখা দিয়েছিল।

এই রাজাদের সম্পর্কে বলা হয়, তাঁদের উপাধি ছিল 'স্বর্গসিংহাসন,' তাঁদের রাণীরা ছিলেন দিব্যাঙ্গনা, রাণীরা রাজাদের শূন্যে নিয়ে চলে যেতেন বলে মর্ত্যে তাঁদের মরদেহের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যেত না। এই রাজাদের নামের আগে তাঁদের মাতৃনাম যুক্ত করা হত। এই নারীপ্রাধান্য দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তিব্বতে এই সময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। চীনদেশে প্রাপ্ত বিবরণী অনুসারে তখন প্রাচীন তিব্বতের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মাতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। সুই ও তাং রাজবংশ (৫৮১-৯০৫ খ্রিস্টাব্দ)-এর বিবরণীতে বলা হয়েছে যে সমগ্র উত্তর-তিব্বতের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড জুড়ে নারীরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে আশিটি শহরে চল্লিশ হাজার পরিবার ও দশহাজার সৈন্য বাস করত। এক নারী ছিলেন এই রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। রাজ্যশাসনে তাঁর স্বামীর কোনো ভূমিকা ছিল না।

মায়ের বংশের নাম ছেলেরা গ্রহণ করত। সম্রাজ্ঞীর কয়েকশত অনুচর ছিল। প্রতি পাঁচদিনে একবার রাজ্যসভার অধিবেশন হত। বাইরের কাজের জন্য পুরুষদের পাঠানো হত, তাদের বলা হত, 'নারীদের প্রতিনিধি'। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে তাদের যে আদেশ দেওয়া হত, সেই আদেশ তারা কার্যকর করত। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হলে তার উদ্দেশ্যে প্রজাদের বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দিতে হত। তারপর রাজ পরিবার থেকে দুজন বুদ্ধিমতী মহিলা নির্বাচিত হতেন, একজন শাসন পরিচালনা করতেন, অন্যজন সম্রাজ্ঞীর আকস্মিক মৃত্যু হলে তার স্থলাভিষিক্ত হতেন।

ব্রিফল্ট বলেছেন যে আসামে যে ধরণের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এই সুপি রাজ্যে আমরা তার এক বৃহৎ সংস্করণেরই পরিচয় পাই। ফ্রাঁকে তাঁর প্রত্ন-তাত্ত্বিক আবিষ্কারে এই সাম্রাজ্যের সন্ধান পেয়েছেন। উয়ান চোয়াং (Hiuen Tsang)ও এই সাম্রাজ্যের কথা শুনেছিলেন। পূর্বদেশের এই নারী সাম্রাজ্য থেকে চীনের সুই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার কাছে ৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে দূত পাঠান হয়েছিল। ৬১৮-৬২৬ খ্রিস্টাব্দে এদের রাণী তাংপাং চীনের সম্রাটের কাছে উপঢৌকনসহ কূটনৈতিক

প্রতিনিধি পাঠান। ৭৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই নারী শাসনের অবসান হয় এবং একজন পুরুষ শাসনকর্তা নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা যে দুজন রাজার নাম পাই, তার দ্বিতীয় জন জাঠি বা পুদেগুনজল। 'ক্রনিকল অব লাদাক' এ বলা হয়েছে যে তিনি প্রধান ধাতুগুলি আবিষ্কার করেন, কৃষিকাজ ও সেচব্যবস্থা প্রচলন করেন, তিব্বতের প্রথম রাজধানী ইয়ারলুং প্রতিষ্ঠা করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তিনি বোন বা পোন ধর্মের উত্থানে সহায়তা করেন।

এই রাজবংশ তালিকায় প্রথম সাতজন রাজা ছিলেন স্বর্গলোকের সঙ্গে যুক্ত, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দল মর্তলোকের সঙ্গে যুক্ত, সর্বশেষের দলটি নাগলোকের সঙ্গে যুক্ত। ফ্রাকের এই অভিমত পেতেকও সমর্থন করেছেন। শরৎচন্দ্র দাসের মতে, এই বংশের সাতাশ-তম রাজার সময়ে বোন বা পোন ধর্মের সর্বাধিক উন্নতি হয়; তাই যখন সমগ্র জম্বুদ্বীপ বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত, তখন তুষারপরিবৃত তিব্বত বোন বা পোন ধর্মের রহস্যময় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

২১। তিব্বতের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সে দেশের প্রাচীন ধর্ম বোন বা পোন প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই সংবাদটি ছাড়া তিব্বতের ঐতিহাসিকরা দেশের এই প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি। রকহিল কিন্তু বলেছেন, তিব্বতের জনসংখ্যার কিছু অংশ এবং হিমালয় অঞ্চলের বর্বর উপজাতিগুলি এখনও পর্যন্ত এই ধর্ম অনুসরণ করে। এমন কি তাঁর মতে, সমগ্র তিব্বতের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ পোন ধর্মাবলম্বী। ওয়াডেল বলেছেন, মধ্য ও পশ্চিম তিব্বতের লামা পুরোহিততন্ত্র এই ধর্মকে নিষিদ্ধ করেছে, তা সত্ত্বেও তিব্বতের সবচেয়ে জনবহুল অংশ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতে এই ধর্ম এখনও প্রকাশ্যে পালিত হয়। পূর্ব তিব্বতে অনেকগুলি বড়ো বড়ো পোন ধর্মীয় সংস্থান আছে। দেব-দেবী-সাধু-সন্ত-যক্ষ-রক্ষ ইত্যাদির মূর্তি-শোভিত এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পোন পুরোহিতরা বাস করেন। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়।

কানিংহাম, রকহিল, ওয়াডেল, জাস্কি, শরৎচন্দ্র দাস, হজসন প্রভৃতি তিব্বত বিশেষজ্ঞরা এই ধর্মটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন; কিন্তু পোন শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী, সে কথা কেউ স্পষ্ট করে বলেন নি। তিব্বতী পণ্ডিত ছোইচি গ্রিমা তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে পোন শাস্ত্রাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের অনুকরণে এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব, দর্শন, ধ্যান ও চর্যাবিধিসমূহকে ভিত্তি করে এই গ্রন্থগুলি কীভাবে রচিত হয়েছিল, তার একটি বর্ণনা তিব্বতী সূত্রে পাওয়া যায়। রাজা ঠিস্রোং দেচান পোন-ধর্মাবলম্বীদের সকলকে

ঐ ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হুকুম জারী করেন। পোন পুরোহিত রিনছেনছোগ-কে রাজমন্ত্রী জলবেই জনছুব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে বললেন। কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হলেও রিনছেনছোগ বৌদ্ধধর্ম মেনে নিলেন না। বরং শাস্তি পেয়ে তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন এবং আরও কয়েকজন পোন পুরোহিতের সাহায্যে একান্ত গোপনে বসে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির কিছু অদলবদল করে পোন ধর্মশাস্ত্র রচনা করলেন। তথাগতের পবিত্র বচনমালাকে এভাবে বিকৃত করার অপরাধে রাজা তাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। তারপরে দলে দলে বহু পোনপোকে হত্যা করা হল। ফলে অবশিষ্ট পোন ধর্মাবলম্বীরা গুপ্তভাবে গ্রন্থ রচনা করে পোন শাস্ত্রগুলিকে পাথরের নীচে লুকিয়ে রাখল। পরে যখন গুপ্তস্থান থেকে এই পুঁথিগুলিকে বার করা হল, তখন তাদের নাম দেওয়া হল 'পোন তেরমা' বা পোনদের গুপ্তধন।

পরবর্তী কালে লাংদারমা-র পতনের পরেও পোন ধর্মের পুরোহিতরা গোপনে বসে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির শব্দ ও বানান রদবদল করে পোন শাস্ত্র রচনা করেন।

এই বিপুলাকার পোন শাস্ত্রগুলিতে শুধু সংস্কৃত শব্দের অর্থহীন অনুকরণ পাওয়া যায়। যেমন: 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' বৌদ্ধধর্মের বীজমন্ত্র বিশেষ, পোন গ্রন্থে এটিকে বিকৃত করে 'জুঃ-এম-পদ-নি-মো' লেখা হয়েছে। ছোইচি-ঞিমা পোনধর্মের তিনটি কালবিভাগ করেছেন: বন্য, বিকৃত ও সংশোধিত পর্যায়।

এই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে ভারতীয় শৈবধর্মের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে, শেষ স্তরটি বৌদ্ধধর্মের অনুকরণ করেছে। 'জলরব শোনজি জুংনে' নামে পোনধর্মের বিস্তৃত বিবরণীটিও প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মতাদর্শে রচিত।

তিব্বতের প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক বিবরণী চীনা সূত্র থেকে আমরা পাই। রাজার প্রতি অনুগত্যের শপথ নেবার জন্য বৎসরে একবার রাজকর্মচারীদের সমবেত করা হত। কুকুর, বাঁদর, ভেড়া প্রভৃতি জীবজন্তুদের একত্রিত করে প্রথমে তাদের পা ভেঙ্গে দেওয়া হত, তারপর বলি দেওয়া হত। সব শেষে নিহত এই জন্তুগুলির নাড়িভুঁড়ি বার করে তাদের দেহ খণ্ড খণ্ড করা হত। উপস্থিত জাদু-পুরোহিতরা তখন স্বর্গ-মর্ত্য, সূর্য-চন্দ্র- গ্রহনক্ষত্র, নদী-পর্বত প্রভৃতির দেবতাদের সাক্ষ্য রেখে বলতেন, "যদি তোমাদের মন বদলে যায়, যদি তোমরা বিশ্বাসঘাতক হও, তাহলে এইসব দেবতারা তা পরিষ্কার দেখতে পাবেন ও তোমাদের এই রকম শাস্তি দেবেন।" পোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল পশুবলি। এই ধরণের অনুষ্ঠানের পরিচয় পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ধর্মেও পাওয়া যায়। আর এইসব প্রাচীন ধর্মের মত পোন ধর্মেও মাতৃতন্ত্র প্রাধান্য পেয়েছে। পুরুষ দেবতাদের তুলনায় দেবীরা এবং পুরুষ পুরোহিতের তুলনায় নারী পুরোহিতরাই এখানে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। তিব্বতের যে অংশে পূর্বকালে মাতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, পোন ধর্মও সেইসব অঞ্চলের প্রধান ধর্ম হয়ে উঠেছিল।

ফ্রাংকে ও শরৎচন্দ্র দাস পোনপো পুরোহিতদের নীল ও কালো পোষাকের কথা বলেছেন। চীনা বিবরণীতে তিব্বতের উত্তরাংশে নারী রাজ্যের সম্রাজ্ঞীর নীল ও

পোষাকের বর্ণনা আছে। এইসব সূত্র থেকে পোনধর্ম সম্পর্কে কিছু অনুমান হয়ত করা যায় কিন্তু সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তিব্বতের ঐতিহাসিকরাও এক্ষেত্রে প্রায় নীরব। অবশ্য সেদেশে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের আলোকে পোনধর্মের তমিস্রা কীভাবে অপসারিত হয়েছিল, তার বিস্তৃত বর্ণনা সাগ্রহে তাঁরা দিয়েছেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও তার পূজোপকরণ ইত্যাদির প্রথম আবির্ভাবের অলৌকিক কাহিনীও এই সব বিবরণে বিশদভাবে বলা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় অংশবিশেষে পোন ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের তীব্র সংঘর্ষের বিবরণও পাওয়া যাবে।

২২। অলৌকিক আবির্ভাব

তিব্বতে তখন পোন ধর্মই প্রধান। সেই সময়ে তিব্বতের প্রাচীন রাজবংশে লৃহাথো থোরি ঞাংচান নামে এক রাজা ছিলেন। ষোড়শ বর্ষীয় এই রাজা ইয়ামবু লৃহাখাং প্রাসাদে বাস করছিলেন; সেই সময়ে একদিন শূন্য থেকে এক অত্যাশ্চর্য স্বর্ণপেটিকা প্রাসাদশীর্ষে নেমে এল। তার মধ্যে 'কারণ্ডব্যূহ' ও 'শত উপদেশ গাথা' নামে দুটি গ্রন্থ ও একটি স্বর্ণচৈত্য পাওয়া গেল। এই পবিত্র উপকরণগুলি প্রাপ্তির ফলে রাজার আয়ু বৃদ্ধি পেল। তিব্বতে তখনও কোনো ভাষা ছিল না। লৃহাথো থোরি ঞাংচান একদিন স্বপ্নে দৈববাণী শুনলেন, তাঁর পরবর্তী পঞ্চমপুরুষের সময়ে অলৌকিকভাবে আগত এই শাস্ত্রগুলির অর্থ জানা যাবে।

গোই লোচাবা, সুমৃপা, শরৎচন্দ্র দাস, রকহিল প্রভৃতি তিব্বত বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনাটি সম্পর্কে একই ধরনের বিবরণ দিয়েছেন। 'কারণ্ডব্যূহসূত্র'টির সম্পূর্ণ নাম 'আর্য কারণ্ডব্যূহ নাম মহাযানসূত্র'; গ্রন্থটির তিব্বতী অনুবাদ কাঞ্জুরে আছে। সেখানে গ্রন্থটির অনুবাদকরূপে জিনমিত্র, দানশীল ও এশেওদ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এই অনুবাদকরা সকলেই নবম-দশম শতকের মানুষ।

তিব্বতে এই গ্রন্থটি কীভাবে এসেছিল এ কথা বলতে গিয়ে গোই লোচাবা একটি পৃথক মতও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, নেলপা পণ্ডিতের মতে, এই গ্রন্থগুলি আকাশ থেকে পড়ে নি; পণ্ডিত বুদ্ধিরক্ষিত ও অনুবাদক লিথেসে এই গ্রন্থগুলি তিব্বতে এনেছিলেন। তিব্বতের রাজা তখন পড়তে জানতেন না বলে গ্রন্থগুলির অর্থও বুঝতে পারলেন না. তাই বুদ্ধিরক্ষিত ও লিথেসে ফিরে গেলেন। গোই লোচাবা এখানে মন্তব্য করছেন, "আমার ধারণায় এই বিবরণটি সত্য।"

পণ্ডিত বুদ্ধিরক্ষিত ও তাঁর অনুবাদক লিথেসে কোন সময়ে কোন দেশ থেকে এসেছিলেন. তা সঠিক জানা যায় না। এক জার্মান পণ্ডিতের মতে, এই পূজোপকরণগুলি ৩৩১ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতের আকাশ থেকে নেমে এসেছিল। ৩৭১ খ্রিস্টাব্দে রাজা লৃহাথো থোরি ঞাংচান-এর কাছে পাঁচজন বিদেশী এসে এইগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা শিখিয়েছিলেন, সম্ভবত এঁরা চীন থেকে এসেছিলেন। কিন্তু গোই লোচাবার বিবরণ থেকে মনে হয়, বুদ্ধিরক্ষিত কোনো ভারতীয় পণ্ডিতের নাম,

তাঁর সহযোগী লিথেসে সম্ভবত নেপালের লোক ছিলেন। রকহিল বলেছেন, চীন বা ভারতে নয়, 'কারণ্ডব্যূহসূত্র' শাস্ত্রটি নেপালেই বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল এবং সম্ভবত নেপাল থেকেই তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধধর্ম এসেছিল।

রাজা লহাথো থোরির রাজত্বকালে তিব্বতে পোনধর্মের প্রবল প্রতাপ ছিল। আবার তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে এই সময়েই তিব্বতে প্রথম সদ্ধর্মেরও আবির্ভাব হয়। লহাথো থোরিকে তাই তিব্বতে সমন্তভদ্রের অবতার বলা হয়। তিব্বতের ইতিহাসে আরও দুজন রাজা এইরকম সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। স্রোংচান গামপোকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার ও ঠিস্রং দেচানকে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলে তিব্বতের মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

লহাথো থোরির এই সম্মান লাভের কারণ হিসাবে পেতেক কিন্তু অন্য যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মতে স্রোংচান গামপোই তিব্বতের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা, তাঁর সময়ে প্রথম তিব্বতের রাজাদের বংশতালিকা প্রস্তুত করবার চেষ্টা হয়। তখন স্রোংচান গামপোর পূর্বপুরুষদের সন্ধান করতে গিয়ে পঞ্চম পূর্বপুরুষ লহাথো থোরির নাম পাওয়া যায়। বলা হয় তিনিই তিব্বতের রাজবংশের আদিপুরুষ। তিব্বতের ঐতিহাসিকদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল, সে কারণেই তাঁরা তিব্বতের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা লহাথো থোরি ঞাংচানকে সমন্তভদ্রের অবতার বলে গণ্য করেন।

২৩। সম্রাট স্রোংচান গামপো

চীনের ঐতিহাসিকদের মতে ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বত কতকগুলি ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল। বিভিন্ন উপজাতি এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি শাসন করত। নামরি স্রোংচান (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক) স্রোংচান গামপোর পিতা; তিনিই প্রথম এই পার্বত্য আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে তিব্বতে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে এক লক্ষ সৈন্যও সংগঠিত করেন। মধ্যভারত পর্যন্ত এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করে তিনি জয়লাভ করেন। সিলভাঁ লেভির মতে, নামরি স্রোংচানের নামের অনুসরণেই বাংলা ও আসামে ৫৯৩-৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্ষ গণনায় 'সন' ব্যবহার শুরু হয়।

শিশুকালে স্রোংচান গামপোর নাম ছিল ঠিদে স্রোংচান। মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি রাজা হন। রাজকার্যে ও ধর্মাচরণে সমান নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁর নাম হয় স্রোংচান গামপো। তাঁর উদ্যোগেই তিব্বত প্রথম বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের দশ অনুশাসন অনুসারে হত্যা, দস্যুতা, ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধে শাস্তিদানের জন্যে আইন প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া চীন থেকে রেশমগুটি, তুঁতগাছ, কাগজ, কালি, বর্ষপঞ্জী, জলচালিত শস্যপেষণ যন্ত্র ইত্যাদি এনে তিনি স্বদেশে তাদের ব্যবহার চালু করেন। কিন্তু নিরক্ষর তিব্বতকে সাক্ষর করাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে

মহৎ কীর্তি। তাঁর পূর্বপুরুষ লুহাথো থোরির সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের আবির্ভাব হয়তো ঘটেছিল, কিন্তু তা সামান্যই কার্যকরী হয়েছিল। কারণ তিব্বতের মানুষের তখনও অক্ষরপরিচয় হয়নি, সেই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পড়া, অর্থ উদ্ধার করা বা নিজ ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করা কোনোটাই তখন তাই সম্ভব হয় নি। তাই লিখিত ভাষার উদ্ভাবন ও ভাষাশিক্ষাই সে যুগের তিব্বতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল। সম্রাট স্রোংসান গামপো তাঁর স্বদেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। এই শক্তিমান সম্রাটের শাসনে তিব্বত বর্বরদশা থেকে মুক্ত হয়ে সভ্যতার স্পর্শলাভ করে। সম্রাট স্রোংচান গামপোর এই বহুমুখী কীর্তিকলাপ তিব্বতে বিভিন্ন লোকসংগীতে স্মরণীয় হয়ে আছে।

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা বলেন, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে স্রোংচান গামপোর প্রেরণার উৎস ছিলেন তাঁর বিদেশিনী দুই রাণী, নেপালের রাজকন্যা ও চীন রাজকন্যা। মন্ত্রী থোনমি সম্ভোটের সফল দৌত্যের ফলে নেপালরাজ অংশুবর্মণের কন্যার সঙ্গে স্রোংচান গামপোর বিবাহ হয়। চীনের রাজকন্যার সঙ্গে তিব্বতরাজের বিবাহ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, চীন সম্রাট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতরাজের সঙ্গে উপহার বিনিময় ও বন্ধুত্বের চুক্তি করেন। তিব্বত দূত পাঠিয়ে চীনকে জানায় যে তিব্বতরাজের সঙ্গে বিবাহের জন্যে চীনরাজকন্যাকে প্রেরণ করা হোক। তিব্বতের এই প্রস্তাব চীন প্রত্যাখ্যান করে। চীনের এই অসম্মতির উত্তরে তিব্বত দুলক্ষ সৈন্য নিয়ে চীন আক্রমণ করে। আট বৎসর ধরে চীন ও তিব্বতের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে চীন সম্রাট তাইসুং তিব্বতের দাবী মেনে নেন এবং চীন রাজকন্যাকে প্রেরণ করা হয়।

তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে এই দুই রাজকন্যা বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় অনুরাগিনী ছিলেন, তাঁদের প্রভাবেই স্রোংচান গামপো বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। কথিত আছে যে স্রোংচান গামপো নেপাল রাজের কাছে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে এই বার্তা পাঠান, "বর্বর তিব্বতের রাজা আমি, দশকুশল অনুশীলন করি না। যদি অনুগ্রহ করে আপনার কন্যাকে দান করেন, তাহলে আমি পঞ্চসহস্র দেহ ধারণ করে দশকুশল চর্চা করব। যদিও আমি নির্মাণকৌশল জানি না, তবুও আপনি যদি চান তাহলে আমি পঞ্চসহস্র মন্দির নির্মাণ করব।"

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে স্রোংচান গামপো ও তাঁর দুই রাণীর বিশিষ্ট ভূমিকা তিব্বতবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সেই কারণেই সম্রাট স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে ও তাঁর মহিষী নেপাল রাজকন্যা—অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম শক্তি মূর্তিমতী শ্বেততারা ও চীন রাজকন্যা—অপর শক্তি হরিৎ ভৃকুটীতারা রূপে পূজিত হন। নেপাল রাজকন্যা তিব্বতে তাঁর সঙ্গে অক্ষোভ্যবজ্র, মৈত্রেয় ও তারাদেবীর মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন; চীনের রাজকন্যা শাক্যমুনির তরুণ রাজকুমার মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। এঁদের জন্য স্রোংচান গামপো পৃথক দুটি মন্দির নির্মাণ করেন। রামোছে মন্দিরে অক্ষোভ্যবজ্র প্রভৃতির এবং রাসা (পরবর্তীকালের লাসা) মন্দিরে

শাক্যমুনির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। তিব্বতে এই প্রথম বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হল। সম্ভবত স্রোংচান গামপোর সময়েই পোতালা প্রাসাদের নির্মাণকার্য শুরু হয়।

চীনের ঐতিহাসিকরা বলেন, চীন রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহের ফলে স্রোংচান গামপো চীনের সভ্যতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিশাল চীন সাম্রাজ্যের, অগণিত মানুষ, তাদের বেশভূষা ও সুমার্জিত আচার-ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হন। তুলনায় তাঁর স্বদেশবাসীর বর্বর ব্যবহারে তিনি খুবই লজ্জিত হন। সেই সময়ে তিব্বতের লোকেরা মুখে লাল রং মাখত। চীনের রাজকন্যার এটি একেবারেই পছন্দ হয়নি বলে রাজা এই প্রথাটিকে বাতিল করে দিলেন। স্রোংচান গামপো চামড়ার পোষাক ছেড়ে রেশমি ও কিংখাবের পোষাক পরা ধরলেন। তারপর তিনি রাজসভার অমাত্যদের ও দেশের ধনীদের সন্তানবর্গকে চীনের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য পাঠালেন; চীন থেকে জ্ঞাণীগুণীদেরও তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনলেন।

তিব্বতে শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন স্রোংচান গামপোর উদ্যোগেই ঘটেছিল, তবে এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি চীনের নয়, প্রধানত ভারতের সাহায্যই গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট তিব্বতীকে নির্বাচন করেন এবং তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী থোনমি সম্ভোটের নেতৃত্বে তাঁদের ভারতে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ও বৌদ্ধ-ধর্মের উদ্ভবভূমি ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিল, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল। সপ্তম শতকে উদ্ভাবিত তিব্বতী বর্ণলিপি ও ব্যাকরণের সঙ্গে ভারতীয় বর্ণলিপি ও ব্যাকরণের গভীর সাদৃশ্যের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্রোংচান গামপোকে তিব্বতের মানুষ ছোইজল বা ধর্মরাজ উপাধি দিয়েছিলেন। তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে স্রোংচান গামপো বহু বৌদ্ধমন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। অন্য ঐতিহাসিকরা কিন্তু এগুলি অতিশয়োক্তি বলে সন্দেহ করেছেন। চীনের ঐতিহাসিকদের বিবরণ মতে, স্রোংচান গামপোর সারাজীবন রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহে অর্থাৎ অবৌদ্ধ কার্যকলাপে কেটেছে। তাঁর দুই বিদেশিনী পত্নীর ধর্মমতকে হয়ত তিনি সমীহ করেছেন, তাঁদের আনীত বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিগুলি রক্ষার জন্য তিনি মন্দির নির্মাণ করেছেন, ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের কিছু অংশ তিনি হয়ত তিব্বতীতে অনুবাদও করেছেন। তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা কিন্তু মনে করেন যে 'ধর্মরাজ' উপাধি পাবার মত ধর্মীয় কার্যকলাপ স্রোংচান গামপো বিশেষ কিছুই করেন নি।

যাই হোক তাঁর 'ধর্মরাজ' উপাধির যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও তিব্বতের প্রথম যুগের ইতিহাসে স্রোংচান গামপো যে প্রধানপুরুষ সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ঠিক কোন্ সময়ে, কতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, এই সব বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কয়েকজন তিব্বতবিশারদের মতে স্রোংচান গামপোর বিরাশি বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। অন্যদের মতে ছাত্রিশ বা তেত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিব্বতী গ্রন্থ 'জলরব সলবেই মেলোং' ও চীনা গ্রন্থ 'তাংশু' অনুসারে

স্রোংচান গামপোর জীবিতকালেই তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়; বৃদ্ধবয়সে প্রথমে তিনি নেপালের রাজকন্যা ও তারপরে চীনের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

বিভিন্ন তথ্য বিচার করে দেখা গেছে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বিরাশি বৎসর বয়সে স্রোংচান গামপোর মৃত্যু হয়। দুটি চীনা 'তাংশু' 'দেবথের ঙোনপো', 'পঞ্চম দলাই লামার ধারাবিবরণী' ইত্যাদির ভিত্তিতে রোয়েরিক, পেতেক প্রভৃতি তিব্বতবিশারদরা এই সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে মনে করেছেন।

২৪। থোনমি সম্ভোট

তিব্বতী বর্ণলিপি কীভাবে ও কবে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তিব্বতের লিখিত ভাষা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল—পণ্ডিতদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। জনৈক পণ্ডিত এমনও বলেছেন যে একাদশ শতকে ভারতের লিপিমালার অনুসরণে দীপংকর তিব্বতী বর্ণমালা প্রচলন করেন। অথচ পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব দীপংকরের তিব্বত আগমনের বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

অষ্টম শতকে আচার্য শান্তরক্ষিত তিব্বতরাজ ঠিস্রোং দেচানের আনুকূল্যে সামিয়ে বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারে তিনি তিব্বতী লোচাবা বা অনুবাদকদের সাহায্যে বহুসংখ্যক ভারতীয় গ্রন্থ অনুবাদ করেন। একাদশ শতকে দীপংকর শ্রীজ্ঞান যখন তিব্বতে বাস করছিলেন তখন তিনি সামিয়ে বিহারে যান। এই বিহারের বিপুল গ্রন্থসংগ্রহ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান এবং বলেন, ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এমন বহু দুর্মূল্য গ্রন্থ এই বিহারে অনূদিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। দীপংকরের অনুপ্রেরণায় পরবর্তীকালে আরও বহু ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু দীপংকরের কয়েক শতক পূর্ব থেকেই তিব্বতী বর্ণমালা ও তিব্বতের লিখিত ভাষা প্রচলিত ছিল, তিব্বতী বর্ণমালা কোনোভাবেই দীপংকরের সৃষ্টি হতে পারে না।

এ বিষয়ে ফ্রাংকে যা বলেছেন তাও যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁর মতে স্রোংচান গামপোর পূর্বে অর্থাৎ সপ্তম শতকের পূর্বেই তিব্বতী বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে চীনের ঐতিহাসিকদের মতে স্রোংচান গামপোর পূর্বে তিব্বতের কোনো বর্ণলিপি বা লিখিত ভাষা ছিল না। কাঠের টুকরোয় খাঁজ কেটে বা দড়িতে গিঁট দিয়ে সংখ্যাগণনের পদ্ধতি ছিল। তিব্বতী বর্ণলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন তিব্বতের লাসা স্তম্ভ থেকে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভগাত্রে চীন ও তিব্বতের মধ্যে ৮২১-২২ খ্রিস্টাব্দে যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল সেই ঘোষণাপত্রটি খোদিত আছে। এই সন্ধিপত্রটির লিপি বিচার করে ওয়াডেল অনুমান করেছেন যে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে তিব্বতে লিখিত ভাষার প্রবর্তন হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন, সপ্তম শতকে মধ্যভারতে যে দেবনাগরী বর্ণমালা গড়ে উঠেছিল, তিব্বতী হরফগুলি তার থেকেই উদ্ভাবিত

হয়েছিল। অন্য এক লিপি-বিশারদের মতে ভারতীয় সিংহমাতৃকা লিপি থেকে তিব্বতী লিপির উদ্ভব হয়েছে। তিব্বতী বর্ণলিপি মাত্রাযুক্ত ও মাত্রাহীন—এই দুইভাগে বিভক্ত। কতকগুলি তিব্বতী শব্দের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, ভারতীয় উষ্মবর্ণ বোঝাবার জন্য অক্ষরগুলিকে উল্টো করে ব্যবহার করা হয়েছে। তিব্বত ও নেপালের বৌদ্ধরা যে রঞ্জনা বা রঞ্জা লিপি ব্যবহার করেন ভারতীয় সিদ্ধমাতৃকাই তার উদ্ভবভূমি। এখনও পর্যন্ত চীন ও জাপানে সংস্কৃত বৌদ্ধধারণীগুলি এই সিদ্ধমাতৃকা লিপিতে লেখা হয়।

বিভিন্ন লিপিবিশারদের মত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিব্বতী বর্ণলিপি প্রাচীনতর কোনো তিব্বতী লিপির পরিবর্তিত রূপ হতে পারে না, ভারতীয় বর্ণলিপির অনুসরণেই তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছে। তিব্বতের ঐতিহাসিক বুতোন বলেছেন, স্রোংচান গামপোর সময়ে (অর্থাৎ সপ্তম শতকে) তিব্বতে কোনো বর্ণমালা ছিল না। তাই লিপিবিদ্যা শিখবার জন্য থোনমি সম্প্রদায়ের অণুর পুত্রকে ষোলজন সঙ্গীসহ ভারতে পাঠান হল, থোনমি সম্ভোট প্রথমে পণ্ডিত দেববিদ্যা সিংহের কাছে ভাষাশিক্ষা করলেন। শিক্ষাশেষে তিনি তিব্বতের (কথ্য) ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চারটি স্বর ও ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টি করলেন। দেশে ফিরে লাসার মারুমন্দিরে বসে এই বর্ণমালাকে তিনি সুসংগঠিত করলেন, তারপর হস্তাক্ষর, লেখন পদ্ধতি ও ব্যাকরণ সম্পর্কে আটটি গ্রন্থ রচনা করলেন। বলা হয়ে থাকে রাজা স্রোংচান গামপো নির্জনে বসে সেই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেছিলেন। বর্ণমালা ও লিখিত ভাষা সৃষ্টির পরে একে একে কারণ্ডব্যূহসূত্র, শত উপদেশ, রত্নমেঘসূত্র প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হল।

এই প্রসঙ্গে গোই লোচাবা শোননু পাল বা কুমারশ্রী আরও বলেছেন যে, থোনমি সম্ভোট তিব্বতী বর্ণমালা উদ্ভাবনের সময়ে ভারতীয় বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ বিশেষ বিচার-বিবেচনা করে গ্রহণ করলেন। তাই ভারতীয় বর্ণমালার প্রথম পাঁচটি বর্গের চতুর্থ অক্ষর—অর্থাৎ ঘ, ঝ, ঢ, ধ ও ভ—এই পাঁচটি অক্ষর তিব্বতী উচ্চারণে অপ্রয়োজনীয় বলে বর্জন করলেন। আবার পূর্বভারতে চ, ছ, জ এই তিনটি অক্ষর বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয় জেনে এই বিশেষ উচ্চারণের জন্যে অতিরিক্ত তিনটি বর্ণ তিব্বতী বর্ণমালায় যোগ করলেন।

থোনমি সম্ভোট সম্পর্কে সুম্পাও একই বিবরণ দিয়েছেন। তবে এই বিবরণে ভারতে থোনমির শিক্ষক বলে সুম্পা লিজিনের নাম করেছেন। থোনমি সম্ভোট লিজিনের কাছে হস্তাক্ষর ও দেববিদ্যা সিংহের কাছে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। 'ক্রনিকল অব লাদাক' ও পরবর্তী কালের বিভিন্ন গ্রন্থে লিজিনের নাম পাওয়া যায়। এই লিজিন কোন দেশের মানুষ ছিলেন, নেপাল না খোটানের তা কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

থোনমি সম্ভোটের কথা বলতে গিয়ে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা বলেন, তিব্বতের খম্বল গিরিমালার পাদদেশে থোন নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের অণু

পরিবারে থোনমি সম্ভোট জন্ম নিয়েছিলেন। তিব্বতে বিদ্যাচর্চার প্রথম পথিকৃৎ ও তিব্বতী বর্ণলিপির স্রষ্টা এখানে জন্মেছিলেন বলে তিব্বতবাসীরা থোন গ্রামটিকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন। সম্ভোট শব্দটি সম্ভবত ভারতীয়, সুগভীর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রমাধুর্যের জন্যে হয়তো এই বিশিষ্ট ভোট দেশীয় ব্যক্তিকে উপাধিটি দেওয়া হয়েছিল।

থোনমি সম্ভোট এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। শুধুমাত্র বর্ণলিপি উদ্ভাবন ও ভাষাচর্চার প্রবর্তনে নয়, দেশের রাজনীতিতে ও কুটনৈতিক কৌশলেও তিনি অসামান্য ছিলেন। নেপাল রাজকন্যার সঙ্গে সম্রাট স্রোংচান গামপোর বিবাহ রাজমন্ত্রী থোনমি সম্ভোটের দৌত্যের ফলেই সম্ভব হয়। চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্রোংচান গামপোর মৃত্যুর পরে থোনমি সম্ভোট শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে তিব্বত থেকে চীন রাজসভায় গিয়েছিলেন।

তবে বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ বলে নয়, তিব্বতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জনকরূপেই থোনমি সম্ভোট স্মরণীয় হয়ে আছেন। আধুনিক তিব্বতবিশারদরা তিব্বতের সাহিত্যের ইতিহাসকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন; তার প্রথম পর্যায়টি অনুবাদের ও দ্বিতীয় পর্যায়টি স্বাধীন রচনার কাল। সপ্তম শতকে থোনমি সম্ভোটের নিরলস সাধনার ফলেই প্রথম পর্যায়টির সূচনা হয়। তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টির পরে প্রথমে তিনি ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত নাম 'সুম্‌চুপা'। ত্রিশটি শ্লোকে সমাপ্ত এই ব্যাকরণ গ্রন্থটি তিব্বতের সর্বত্র প্রচলিত ও প্রতিটি শিক্ষার্থীর কণ্ঠস্থ। লিখিত ভাষা উদ্ভাবনের পরে থোনমি সম্ভোট বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদের উদ্যোগ নেন। তিব্বতের প্রথম অনুবাদকদলকে সাহায্য করবার জন্যে ভারত, নেপাল ও চীন থেকে পণ্ডিতদের আনা হয়। এই অনুবাদগুলি যেন সাহিত্যধর্মী অথচ তর্জমায় আক্ষরিক ও মূলানুগ হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এই সব গুণের ফলেই তিব্বতী অনুবাদ গ্রন্থগুলি পৃথিবীর অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। থোনমি সম্ভোটের নেতৃত্বে তিব্বতের প্রথম অনুবাদকদল পরবর্তী কালের ভাষা ও সাহিত্যবিদদের পথ সুগম করেন।

২৫। ঠিস্রোং দেচান

সম্রাট স্রোংচান গামপোর পরে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তিব্বতের ইতিহাসের রূপরেখা বিশেষ স্পষ্ট নয়। তবে চীনা সূত্র থেকে মোটামুটি জানা যায় যে—৬৫০ খ্রিস্টাব্দে স্রোংচান গামপোর মৃত্যু হয়, তার পরে গুংস্রোং গুংচান বা মাংস্রোং মাংচান রাজা হন; কিন্তু গার নামে এক মন্ত্রী তখন রাজার সব ক্ষমতাই দখল করে নেয়। গারের মৃত্যুর পরে তার ছেলে রাজ্যশাসন করতে থাকে।

৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্রোংচান গামপোর প্রপৌত্র ঠিদু সোংচান অথবা দুস্রোং মাংপোজে রাজা হন এবং মন্ত্রীকে হটিয়ে রাজক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। ঠিদু স্রোংচান বা

দুস্রোং মাংপোজে প্রচণ্ড সাহসী ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ৭০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তার কিছু পরে ভারতের সীমান্তে নেপালের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি প্রাণ হারান। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না, তিব্বতের ঐতিহাসিকরা তাই এই রাজা সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি। দুস্রোং মাংপোজের রাজনৈতিক কার্যকলাপ তিব্বতের ইতিহাসে কোনো গুরুত্ব পায়নি।

ঠিদু স্রোংচান বা দুস্রেং মাংপোজের পুত্র ঠিদে চুগতান অথবা মে আগছোম (৭০৫-৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ) ও তাঁর পুত্র ঠিস্রোং দেচান (৭৫৫-৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজা হন। পিতা-পুত্র এই দুই রাজা সম্পর্কে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। এঁরা দুজনেই বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন।

ঠিদে চুগতানের সময় থেকে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। তাঁর এক মন্ত্রী ছিমফুর গিরিসংকট থেকে একটি তাম্রলিপি উদ্ধার করে আনেন। তাম্রলিপিটিতে স্রোংচান গামপোর নির্দেশ উৎকীর্ণ ছিল। সেই নির্দেশ অনুসরণ করে ঠিদে চুগতান অনেক বিহার নির্মাণ করেন। রাজার উদ্যোগে চীন ও অন্যান্য দেশ থেকে পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনা হল। গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্রসমূহ এবং 'সুবর্ণ-প্রভাসোত্তম,' 'কর্মশতক' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করা হল।

ঠিদে চুগতান এক দুর্ধর্ষ রাজা ছিলেন। চীনের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তিব্বতরাজের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে চীনসম্রাট সন্ধিস্থাপন করতে চান। ঠিদে চুগতানের সঙ্গে চীনরাজকন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে তিব্বতে অনেক রোমাণ্টিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ঠিস্রোং দেচান এই বিবাহেরই সন্তান।

শিশুকালে ঠিস্রাং দেচানের পিতৃবিয়োগ হয়। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে তিনি রাজা হন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা থাকে প্রধান মন্ত্রী মাশাং-এর দখলে। এই মাশাং শুধু যে পোন ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তাই নয়, ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষীও ছিলেন। রাজার অল্পবয়সের সুযোগ নিয়ে প্রথমেই তিনি বৌদ্ধভিক্ষুদের দেশ থেকে দূর করে দিলেন, তারপর লাসা মন্দিরের বুদ্ধমূর্তিটিকে স্থানচ্যুত করে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরগুলিকে কসাইখানায় পরিণত করলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ থাকলেও কিশোর রাজা এই অনাচার, অত্যাচারের কোনো প্রতিকার করতে পারলেন না।

এদিকে সালনাং নামে ঠিস্রাং দেচানের এক বৌদ্ধ মন্ত্রী নেপাল ও বুদ্ধগয়ায় যান, বৌদ্ধদীক্ষাগ্রহণের ফলে তাঁর নাম হয় জ্ঞানেন্দ্র। নেপালে তিনি ভারতীয় আচার্য শান্তরক্ষিতের দর্শন পান। দেশে ফিরে তিনি রাজাকে অনুরোধ জানান, যেন শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। কিন্তু দেশে তখন বৌদ্ধদ্বেষী প্রধানমন্ত্রী মাশাং-এর প্রবল প্রতাপ। রাজা ও তাঁর অনুগত মন্ত্রীরা বুঝলেন যে মাশাংকে সরাতে না পারলে তিব্বত থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে যাবে। তাই তাঁরা গোপনে সে চেষ্টাই শুরু করলেন।

প্রধানমন্ত্রী মাশাংকে কীভাবে হত্যা করা হল, তিব্বতী অনুবাদে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজার জ্ঞাতসারেই রাজ্যের বৌদ্ধ মন্ত্রীদল মাশাং-এর প্রাণনাশের জন্যে এক গভীর ষড়যন্ত্র করলেন। প্রথমে তারা জ্যোতিষী ও গণৎকারদের উৎকোচে বশীভূত করলেন। এই জ্যোতিষীরা রটনা করে দিল, রাজার সামনে ঘোর বিপদ। সেই বিপদ থেকে বাঁচবার পথও তারা বাতলে দিলেন। রাজার অনুগত দুজন বিশ্বস্ত অমাত্য যদি স্বেচ্ছায় মাটির তলায় তিনমাসের জন্যে নির্বাসন বরণ করে নেন, তবেই রাজার বিপদ কাটবে। রাজা এদের জন্যে প্রচুর পারিতোষিক ঘোষণা করলেন। প্রথমে মাশাং রাজী হলেন ; কোনো সন্দেহ যাতে না জাগে সেজন্যে বৌদ্ধমন্ত্রী গোইও সম্মত হলেন। মাটির নীচে তিন মানুষ গভীর গর্ত খোঁড়া হল, দুই মন্ত্রী সেই গর্তে নামলেন। রাতে বন্ধুরা গর্তের মধ্যে দড়ি নামিয়ে গোইকে উপরে তুলে আনলেন। কিন্তু হতভাগ্য মাশাংকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে ফেলে রাখা হল। মাশাং-এর শত্রু বৌদ্ধমন্ত্রীরা গর্তের মুখ ভারী পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। মাশাং-এর জীবন্ত সমাধি হল। এই ভাবে মাশাংকে নিশ্চিহ্ন করার পর ঠিস্রোং দেচান ও তার বৌদ্ধমন্ত্রীরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সুযোগ পেলেন।

মাশাং যে ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন, তার প্রকৃত কারণ সম্ভবত ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক। আধুনিক তিব্বততত্ত্ববিদের মতে, তিব্বতে তখন ছোটবড় নানা সামন্ত প্রভুদের প্রচণ্ড দাপট, এদের ধর্ম ছিল তিব্বতের প্রাচীন পোন ধর্ম। ধর্মের নামে এরা দেশ শাসন করত। দেশের রাজা দুর্বল বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে রাজার নামে এরাই রাজ্য চালাত। রাজা যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হতেন ও এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেন, তাহলে দুপক্ষের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠত। তিব্বতের প্রথম সম্রাট স্রোংচান গামপো এই সামন্ত প্রভুদের কঠোর হস্তে দমন করতে পেরেছিলেন।

স্রোংচান গামপোর বংশধর তাঁর প্রপৌত্রের পৌত্র ঠিস্রোং দেচানকেও এই দুরূহ কাজ করতে হয়েছিল। প্রধান মন্ত্রী মাশাং নিশ্চিহ্ন হওয়ায় সামন্তশক্তির সেই সময়ের প্রধান স্তম্ভটি ভূমিসাৎ হয়েছিল, পোনধর্মকে উৎসাদিত করে সামন্ত প্রভুদের প্রতিপত্তির সামাজিক ভিত্তি তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন, তার উপরে নবাগত বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্ম ও রাষ্ট্রধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মাশাংএর হত্যার পরে ঠিস্রোং দেচান মন্ত্রী সালনাং তথা বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানেন্দ্রের পরামর্শমত আচার্য শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব ও কমলশীলকে একে একে আমন্ত্রণ করে আনলেন। এই আচার্যদের সাহায্যে সামিয়ে বিহার প্রতিষ্ঠিত হল। এই বিহারে ধর্মার্থী তিব্বতীদের ভিক্ষুদীক্ষা দেওয়া শুরু হল। প্রবল উৎসাহে ভারতীয় গ্রন্থসমূহ পঠনপাঠন ও অনুবাদের কাজ চলতে লাগল। এইভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত প্রচার সম্ভব হল।

কিন্তু দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠাই ঠিস্রোং দেচানের জীবনের একমাত্র বড় কাজ নয়। প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে তিব্বতকে এক প্রচণ্ড সামরিক শক্তিরূপে ও নিজেকে

তার সুযোগ্য রাজারূপে ঠিংস্রোং দেচান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলি তাঁর বাহুবলের পরিচয় ভালভাবেই পেয়েছিল।

চীনের রাজকন্যা তাঁর মাতা ছিলেন বটে কিন্তু তার ফলে চীনের প্রতি ঠিংস্রোং দেচানের বৈরিভাব বিন্দুমাত্র কমেনি। চীনের তিনি প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুই ছিলেন, সামরিক শক্তিতেও তিব্বত তখন চীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁর রাজ্যকালের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ৭৬০-৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিব্বত চীনের সমগ্র কাংসু অঞ্চল দখল করে নেয়—তার ফলে তুর্কিস্থানের চীনা সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উত্তরদিকে তিব্বতের সৈন্যরা কাংসু ও তুর্কিস্থানে লড়াই করছিল, আর পূর্বদিকে তিব্বতী সৈন্যদল তখন তাদের দুশোবছরব্যাপী লড়াইএর চূড়ান্ত জয় লাভ করল। বিজয়ী তিব্বতী সৈন্যদল সদর্পে চীনের রাজধানীতে প্রবেশ করল। চীন সম্রাট রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। যাই হোক, ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। তারপরে যে শান্তিচুক্তি হল, তাও অবশ্য বেশিদিন টিকল না।

রাজা ঠিংস্রোং দেচান আরবদের সঙ্গে মৈত্রী করলেন, তারপর বিজয়ী সেনাদল নিয়ে চতুর্দিকে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হলেন। সম্ভবত পূর্ব ভারতের পালরাজারাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে কর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিরূপে তিব্বতের প্রতিষ্ঠা—ঠিংস্রোং দেচানের শাসনকালের এই সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা তিব্বতের ইতিহাসে প্রায় উপেক্ষিতই হয়েছে। কিন্তু ঠিংস্রোং দেচান তাঁর রাজ্যে কীভাবে তিব্বতের প্রাচীন পোন ধর্মকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করেন, কীভাবে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তিব্বতের ঐতিহাসিকরা শুধু সবিস্তারে সে বর্ণনাই দিয়েছেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠায় ঠিংস্রোং দেচানের ভূমিকা স্মরণ করে তিব্বতবাসীরা তাঁকে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর অবতার বলে পূজা করেছেন।

একদিকে বিদেশী রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে জয়লাভ, অন্যদিকে দেশে অহিংস ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা—এই দুটি পরস্পরবিরোধী কাজই তিনি সমান উৎসাহে করেছেন। তিব্বতের ইতিহাসে ঠিংস্রোং দেচান তাই এক অসামান্য শক্তিশালী রাজারূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

২৬। শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল

ঠিংস্রোং দেচান প্রধানত ভারতীয় আচার্য শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব ও কমলশীলের সাহায্যে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বতের জনসাধারণের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজমন্ত্রী সাঁলনাং-এর উদ্যোগে শান্তরক্ষিত তিব্বতে আসেন। কিন্তু সেদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়ে তিনি তিব্বতের প্রাচীন পোন ধর্মের—তার ভূত-প্রেত-যক্ষ-রক্ষের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এই বিরুদ্ধতা এতই তুঙ্গে ওঠে যে তাঁকে বাধ্য হয়ে তিব্বত ছাড়তে হয়। তবে শান্তরক্ষিতের উপদেশেই ঠিংস্রোং দেচান পদ্মসম্ভবকে

তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনেন। পদ্মসম্ভব তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে পোন ধর্মের দৈত্যদানবদের বশীভূত করেন। তখন শান্তরক্ষিতের পক্ষে আবার তিব্বতে ফিরে আসা সম্ভব হয়। রাজা ঠিস্রোং দেচানের সাহায্যে শান্তরক্ষিত সামিয়ে বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

তাঞ্জুরে শান্তরক্ষিতের রচিত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ পাওয়া যায়। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহ' শান্তরক্ষিতের রচনা। তিনি এই গ্রন্থে স্বাতন্ত্রিক যোগাচার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ—সকল প্রতিপক্ষের মতবাদ খণ্ডন করেছেন। শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশীল এই গ্রন্থটির ভাষ্যরচনা করেছেন। 'বাদন্যায় বৃত্তিবিপঞ্চিতার্থ', 'মধ্যমক অলংকারকারিকা' ও তার স্বরচিত বৃত্তি—শান্তরক্ষিতের এই বিখ্যাত গ্রন্থগুলি ভারত থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। আমরা তিব্বতী অনুবাদের মধ্য দিয়েই গ্রন্থগুলির পরিচয় পাই। আবার তাঞ্জুর সংকলনে শান্তরক্ষিতের নামে কয়েকটি তান্ত্রিক রচনাও স্থান পেয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এই তান্ত্রিক গ্রন্থগুলি শান্তরক্ষিতের মত প্রাজ্ঞ দার্শনিক কোনমতেই লিখতে পারেন না, তাঁরা তাই অনুমান করেছেন যে দুজন শান্তরক্ষিত ছিলেন।

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা অবশ্য এ প্রশ্ন তোলেননি। তাঁরা মনে করেন দীপংকরের পূর্বে শান্তরক্ষিতই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁদের মতে ভারতের একই রাজবংশে প্রথমে শান্তরক্ষিত ও পরে দীপংকর জন্ম নেন। "শান্তরক্ষিত পূর্ববাংলার সাহোরের রাজপুত্র রূপে জন্ম নেন।" সুম্পা আরও বলেছেন, শান্তরক্ষিত রাজা গোপালের রাজ্যকাল থেকে ধর্মপালের রাজ্যকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপাল এবং ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপাল রাজা হন এবং ধর্মপাল বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন. ঐতিহাসিকরা এইরকমই অনুমান করেন। তাহলে শান্তরক্ষিত নিশ্চয়ই ৭৫০ থেকে ৮০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন এবং তিব্বতরাজ ঠিস্রোং দেচানের (৭৫৫ থেকে ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন।

তিব্বতে শান্তরক্ষিত শিবাছো বা শান্তিজীব নামেও পরিচিত। বুতোন ও সুম্পা তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলেও উল্লেখ করেছেন। ফ্রাংকে বলেছেন. আলচি বিহারের শিলালিপিতে শান্তিপা বলে তাঁর উল্লেখ আছে। সুম্পা আরও বলেছেন, বোধিসত্ত্ব বা শান্তিজীব ভারতবর্ষে নালন্দার উপাধ্যায় ছিলেন। নালন্দা থেকে তিনি কীভাবে এবং কেন নেপালে এসেছিলেন, জানা নেই। তবে তিব্বতরাজ ঠিস্রোং দেচানের মন্ত্রী সালনাং বা জ্ঞানেন্দ্র নেপালে প্রথম তাঁকে দেখেন। বুতোন বলেছেন, সালনাং বা জ্ঞানেন্দ্র তখন গুরু বোধিসত্ত্বকে তিব্বতের মাংয়ুলে আমন্ত্রণ করেন। গোই লোচাবা আরও বলেছেন যে এখানে বসেই তাঁরা দীর্ঘ আলোচনা ও পরামর্শ করে স্থির করেন যে তিব্বতে তাঁরা (মহাযান) বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী মাশাং তখন প্রধানমন্ত্রী, তাই তখন তাঁদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না। মাশাং এর মৃত্যুর পরে সালনাং বা জ্ঞানেন্দ্র আচার্য বোধিসত্ত্বকে লাসায় আমন্ত্রণ করে আনেন।

তিব্বতরাজ ঠিস্রোং দেচান সিদ্ধান্ত করেন যে, গুরু হিসাবে গ্রহণ করবার আগে আচার্য শান্তরক্ষিতের মতবাদ তিনি ভাল করে যাচাই করে নেবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনজনকে আচার্যের কাছে পাঠানো হল। আচার্যের ভাষা তারা বুঝতে পারল না; তখন কাশ্মীরের পণ্ডিত অনন্তকে দোভাষী করে আচার্যের মতামত বুঝবার চেষ্টা করা হল। সদ্ধর্মে তাঁর নিষ্ঠা আছে ও মনে কোনো পাপচিন্তা নেই জেনে তারপর গুরু বোধিসত্ত্বকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান হল।

গোই লোচাবা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, রাজা মন্ত্রীদের আদেশ দিলেন: বৌদ্ধধর্মে উপাধ্যায়ের নিষ্ঠা ও তাঁর চরিত্র বিচার করে তবেই তাঁকে রাজপ্রাসাদে আনা যাবে। সেইমত মন্ত্রীরা উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে তাঁর মতবাদ জানতে চাইলেন। উত্তরে উপাধ্যায় বললেন, যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা করে যা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তাকেই আমি অনুসরণ করি এবং যুক্তিতে যা টেঁকে না, তা পরিত্যাগ করি—এই আমার মতবাদ। 'তত্ত্বসংগ্রহ' রচয়িতার পক্ষেই এমন প্রাঞ্জল ও যুক্তিনিষ্ঠ উত্তর দেওয়া সম্ভব। অবশ্য কুসংস্কার ও অলৌকিকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন তিব্বতের মানুষের কাছে তাঁর এই যুক্তিগ্রাহ্য বলিষ্ঠ মতবাদ কতটা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, সেটা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার।

অনুসন্ধানের ফলাফলে রাজা সন্তুষ্ট হলেন; শান্তরক্ষিতও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অনুমতি পেলেন। তবে তিব্বতে শান্তরক্ষিতের কাজের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্যে সেই সময়ে সেদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিচয় জানা দরকার।

মাত্র একশত বৎসর আগে তিব্বতের নিজস্ব লিখিত ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় থেকেই বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের অনুবাদ শুরু হয়েছে, এবং 'কারণ্ডব্যূহসূত্র', 'রত্নমেঘসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদের মধ্য দিয়ে মহাযান ধর্মমতের কিছু অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে তিব্বতবাসীর সদ্য পরিচয় হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ও শাস্ত্রসমূহ তখনও তাঁদের অজ্ঞাত। পরিবেশ বিচার করেই ধর্মশিক্ষাদানে শান্তরক্ষিত কোনো জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করলেন না। দশকুশল, দ্বাদশনিদান, অষ্টাদশ ধাতু ইত্যাদি বৌদ্ধ-ধর্মের মৌল সত্যগুলি তিনি প্রচার করতে লাগলেন। বুতোন বলেছেন, লুংছুগ প্রাসাদে কাশ্মীরের অনন্তকে দোভাষী করে চার মাস ধরে আচার্য শিষ্যবৃন্দকে দশকুশল, অষ্টাদশ ধাতু ও দ্বাদশনিদান ইত্যাদি উপদেশ দিলেন। অন্যান্য তিব্বতী গ্রন্থ থেকেও একই ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। শাক্যমুনির মূর্তি এর একশত বৎসর আগে তিব্বতে আনা হয়েছিল বটে, কিন্তু শাক্যমুনির প্রকৃত বাণী শান্তরক্ষিতই প্রথম তিব্বতে বহন করে আনেন। স্বভাবতই প্রাচীন পোনধর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষে জ্বলে ওঠে। তিব্বতরাজ স্রোংচান গামপোর সময়ে বা তাঁর বংশধর ঠিস্রোং দেচানের রাজ্যকালে বৌদ্ধধর্মের যে প্রচার হয়েছিল তাকে সামান্য সূচনামাত্রই বলা চলে। ঠিস্রোং দেচানের সময়ে রাজসভায় মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রই প্রকট হয়ে উঠেছিল। শান্ত-রক্ষিতই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেবের নৈতিক শিক্ষাসমূহ প্রথম প্রচার করতে সচেষ্ট হন, তার ফলে তিব্বতের বহুযুগের সঞ্চিত সংস্কার ও আদিম পোন ধর্মের সঙ্গে তাঁর তীব্র সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ব্তোন, গোই লোচাবা প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের বিবরণে পাওয়া যায়, এর ফলে তিব্বতের দৈত্যদানব, যক্ষরক্ষ প্রভৃতি অনিষ্টকারী শক্তিগুলি প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের অশুভ প্রভাবে চারিদিকে মড়ক লাগল। ফানথং এর রাজপ্রাসাদ বন্যায় প্লাবিত হল, মারপোরি প্রাসাদের উপর বজ্রাঘাত হল। ফসলের প্রচণ্ড ক্ষতি হল। দেশে চারিদিক থেকে সর্বনাশ ঘনিয়ে এল। তিব্বতের মানুষরা বলতে লাগল, "মিথ্যা (অর্থাৎ বৌদ্ধ) ধর্ম প্রচারের জন্যই এইসব ঘটছে, ভারতীয় সন্ন্যাসীকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া হোক।" রাজা ঠিস্রোং দেচান আচার্য শান্তরক্ষিতকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ দক্ষিণা দিয়ে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে বললেন। শান্তরক্ষিত বললেন, "তিব্বতের যক্ষরক্ষরা অসন্তুষ্ট হয়েছে, আমি তাই নেপালে ফিরে যাচ্ছি। জম্বুদ্বীপে পদ্ম-সম্ভব নামে এক মহাপণ্ডিত আছেন। আমি তাকে এখানে আসতে বলব; রাজা, আপনিও তাকে আমন্ত্রণ জানান।"

শান্তরক্ষিতকে তিব্বত ছেড়ে যেতে হল, কিন্তু তাঁর পরামর্শমত রাজা ঠিস্রোং দেচান পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ জানালেন। পদ্মসম্ভব তিব্বতের যক্ষরক্ষদের কীভাবে সংগ্রামে পরাভূত করলেন, সে সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী সেদেশে পল্লবিত হয়েছে। এই সমস্ত কাহিনীসূত্রে আরও জানা যায় যে, পদ্মসম্ভব উদ্যান বা উরজ্যান-রাজ ইন্দ্রভূতির পুত্র। তাঁর জন্মকাহিনীও অলৌকিক। অমিতপ্রভাস্বর অমিতাভ বুদ্ধের অবতার এক রক্তরশ্মির রূপ ধরে সে দেশের এক পবিত্র হ্রদে অবতরণ করেন। সে দেশের রাজা দেখেন, সেই হ্রদের জলে এক অনুপম সুন্দর পদ্ম ফুটেছে, আর সেই বিকশিত পদ্মপর্ণে চতুর্দিক আলোকিত করে দেবদুর্লভ কান্তি এক অষ্টম-বর্ষীয় বালক বসে আছেন। বালকটির হাতে এক দণ্ড। বালকটির নাম দেওয়া হল পদ্মসম্ভব। বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর অনেকগুলি পত্নী ছিলেন, শান্তরক্ষিতের ভগ্নী মন্দরবা তাদের মধ্যে একজন। তিব্বত অভিযানে মন্দরবা পদ্মসম্ভবের সঙ্গিনী ছিলেন। পদ্মসম্ভবের অলৌকিক কীর্তির বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। এগুলির কোনো কোনোটির সঙ্গে আবার ধর্মের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, সেগুলি একেবারেই লৌকিক। যেমন, একদিন তিনি দলবল নিয়ে শুঁড়িখানায় বসে মদ্যপান করছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল সঙ্গে কোনো পয়সা-কড়ি নেই। কিন্তু মদের দাম তো শোধ করতে হবে! দোকানের মালিকের কাছে তাই তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় চাইলেন। মালিকও রাজী হল, তাদের যত ইচ্ছা মদ্যপানও করতে দিল। আচার্য তখন (মন্ত্রবলে) সূর্যের গতি স্তব্ধ করে দিলেন। ফলে সাতদিন ধরে প্রচণ্ড সূর্য-তাপে দেশ দগ্ধ হতে লাগল। নিরুপায় হয়ে মদ্যবিক্রেতা তার প্রাপ্য টাকা-পয়সা আর চাইল না। তার পাওনা ছেড়ে দেওয়ায় সূর্যাস্ত হল, দগ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে আবার রাত্রি দেখা দিল।

পদ্মসম্ভবের অলৌকিক কার্যকলাপ বর্ণনায় তিব্বতের কাহিনীকাররা সম্ভব অসম্ভবের কোনো সীমারেখাই মানেন নি। সেদেশের যক্ষরক্ষ ইত্যাদি উপদেবতাদের তিনি কীভাবে জব্দ করেছিলেন, তার অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী তিব্বতে জনপ্রিয়

হয়েছে। যেমন, এক যক্ষিণী পদ্মসম্ভবকে দুটি পর্বতের মধ্যে পিষে মারতে চেষ্টা করে। পদ্মসম্ভব তখন ঋদ্ধিবলে আকাশে উঠে গিয়ে তাকে হতবল করলেন। যক্ষিণী পরাজয় স্বীকার করল। পদ্মসম্ভব তখন তাকে বশ করে নিজের ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাকে নিযুক্ত করলেন। অন্য এক দানবী পদ্মসম্ভবকে বজ্র ছুঁড়ে মারল। পদ্মসম্ভব সেই দানবীর তুষারগুহা গলিয়ে হ্রদ বানিয়ে দিলেন, সেই হ্রদের জল তখন ফুটতে শুরু করল। সেই ফুটন্ত জলে সিদ্ধ হয়ে দানবীর গায়ের হাড় থেকে মাংস খসে পড়ল, তবুও সে জল ছেড়ে উঠল না। গুরু তার ডানচোখ বজ্র বিদ্ধ করলেন। তখন সে জল থেকে উঠে এসে পদ্মসম্ভবের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

পদ্মসম্ভব সম্পর্কে এই ধরণের অতিপ্রাকৃত বহু কাহিনীই তিব্বতে প্রচলিত আছে। এই গল্পগুলি থেকে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। এখানে প্রতিটি গল্পেই দেখা যায় যে পদ্মসম্ভব তিব্বতের দৈত্যদানবের কাউকেই ধ্বংস করেন নি বরং তাদের বশীভূত করে নিজের অনুচর করেছেন। এইভাবে তিনি সেদেশের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও তার আচার আচরণকে সরাসরি বাতিল করেন নি, বরং বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সেসব ক্ষেত্রে যেন খানিকটা আপোসই করেছেন। পদ্মসম্ভবের প্রচারিত মতবাদ প্রকৃতপক্ষে পোন ও বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণমাত্র। পরবর্তী স্তরে বহু বৌদ্ধ আচার্য এই প্রাচীন লামাবাদের সংস্কার করেছেন এবং অতীশ এই সংস্কারকদের অন্যতম। এই লামাবাদের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তার থেকেই তিব্বতের বর্তমান ঞিংমাপা বা পুরাতনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। ঞিংমাপা সম্প্রদায়ীরা গুরু পদ্মসম্ভবকে লামাধর্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে পূজা করেন। তাঁদের ধর্মের সুপ্রাচীনত্ব বোঝাবার জন্যে তাঁরা বিভিন্ন গুহা প্রভৃতি গুপ্তস্থান থেকে পুঁথিপত্র প্রাপ্তির উপাখ্যানগুলিকে জোর গলায় প্রচার করেন।

প্রাচীন লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে আপোস করে পদ্মসম্ভব তিব্বতে লামাবাদ প্রচার করেছিলেন সত্য কিন্তু সেদেশের প্রথম প্রকৃত বৌদ্ধবিহার সামিয়ে প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাধারণভাবে বলা হয় যে শান্তরক্ষিতের সঙ্গে একত্রে তিনি সামিয়ে বিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং রাজা ঠিস্রোং দেচান বিহারটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। কোনো কোনো বিবরণে বলা হয় যে, পদ্মসম্ভব স্থানীয় উপদেবতা উপদেবী যক্ষ-রক্ষদের পরাভূত করে সামিয়ে বিহারের ভিত্তিস্থাপন করেন; তখন আবার শান্তরক্ষিত তিব্বতে ফিরে আসেন। অন্য এক বিবরণে বলা হয়েছে: আচার্য বোধিসত্ত্ব (শান্তরক্ষিত) প্রথমে (সামিয়ে) বিহারের ভূমি পরীক্ষা করলেন, তারপর ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে একটি ছাঁচ তৈরি করলেন। সেই নমুনামত সামিয়ে বিহার নির্মিত হল। কিন্তু সামিয়ে বিহার কবে নির্মিত হয়েছিল, তার সঠিক সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ছিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিহারটি নির্মিত হয়েছিল। ঠিস্রোং দেচানও ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে নয়, ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

সামিয়ে বিহারের সম্পূর্ণ নাম সামিয়ে মিনজুর লহুনগি ভুবপেই চুগলগখাং বা অচিন্ত্য নিরাভোগ সিদ্ধবিহার। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নয়ন সিং নামে এক ভারতীয় অভিযাত্রী এই বিহারটিতে উপস্থিত হন ও কয়েকদিন এখানে বাস করেন। তিনি বিহারটির একটি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, লাসার ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে চাংপো নদীর উত্তর তীরে এক বালুকাময় গভীর পার্বত্য অঞ্চলে বিহারটি অবস্থিত। একটি বিশাল মন্দির, চারটি বৃহৎ মহাবিদ্যালয় এবং আরও কয়েকটি অট্টালিকা, এক সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে দরজা এবং প্রাচীরের গায়ে সারি সারি ইষ্টকচৈত্য—সেই চৈত্যগুলির গায়ে প্রাচীন ভারতীয় লিপি খোদিত। নয়ন সিং চৈত্যগুলি গুণে দেখেছিলেন, সংখ্যায় একহাজার ত্রিশ। নয়ন সিং আরও দেখেছিলেন, এই মন্দিরে মূল্যবান বস্ত্রে সজ্জিত, মণিমাণিক্যখচিত মূর্তি ও প্রতিমাগুলি সবই বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্মিত। বাতিদান ও অন্যান্য পূজোপকরণগুলিও স্বর্ণ ও রৌপ্যে নির্মিত। বিহারের গ্রন্থাগারে বহু ভারতীয় পুঁথিও তিনি পেলেন। এই সংগ্রহের একটি বড় অংশ অবশ্য এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে (সম্ভবত ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে) নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

লোককাহিনী মতে স্রোংচান গামপোর সময়ে তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয় এবং বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সামিয়ে বিহারই তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধবিহার এবং শান্তরক্ষিত তার প্রথম আচার্য। এই প্রসঙ্গে গোই লোচাবা বলেছেন, তিব্বতে যখন অলৌকিকভাবে বৌদ্ধশাস্ত্রাবলীর আবির্ভাব ঘটে তখন থেকে স্রোংচান গামপোর সময় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বলতে সাধারণ মানুষের কাছে কতগুলি অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও তন্ত্রমন্ত্র চর্চাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। তিব্বতে শান্তরক্ষিতই প্রথম 'বিনয়' ও বৌদ্ধদীক্ষার প্রচলন করেন। লাংদারমার অত্যাচারে পরবর্তী অন্ধকার-যুগে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্নও তিব্বত থেকে মুছে যায়; তাই সামিয়ে বিহারে শান্তরক্ষিতের কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণও কিছু পাওয়া যায় না। যেটুকু জানা যায়, তাতে আমরা দেখি শান্তরক্ষিতই প্রথম সুষ্ঠুভাবে ও ব্যাপকভাবে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের তিব্বতী অনুবাদের উদ্যোগ নেন। সেই কাজের জন্য ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনেন, সেই সকল শাস্ত্র অনুবাদের জন্যে তিব্বতে একটি যোগ্য অনুবাদকদল গড়ে তোলেন। শান্তরক্ষিতের নেতৃত্বে তিব্বতে এই অনুবাদকর্ম বিশেষ গুরুত্ব পায়; সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ-সংকলন কাঞ্জুর ও তাঞ্জুরের প্রায় সাড়ে চার হাজার গ্রন্থের অধিকাংশই এই সময় অনুবাদ করা হয়।

গোই লোচাবা আরও বলেছেন, ঠিস্রোং দেচান প্রথমে সবচেয়ে প্রতিভাবান ও সদ্বংশজাত সাতজন তিব্বতী তরুণকে মনোনীত করেন (সদমি মিদুন)। এঁরা আচার্য শান্তরক্ষিতের কাছে ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণ করেন। শান্তরক্ষিত এঁদের বৌদ্ধধর্ম ও পবিত্র শাস্ত্রসমূহে সুপণ্ডিত করবার দায়িত্ব নেন। এই সাতজনের নাম সম্পর্কে অবশ্য তিব্বতের ঐতিহাসিকরা একমত নন।

ঐতিহাসিক বুতোন বলেছেন, সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের বারোজন ভিক্ষুকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনা হল। তিব্বতীরা প্রকৃত ভিক্ষু হতে পারবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সাতজন তিব্বতী তরুণকে নির্বাচিত করা হল।

সুশৃঙ্খলভাবে সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ অনুবাদে নেতৃত্ব দেবার জন্য ভারত থেকে পণ্ডিতরা আমন্ত্রিত হয়ে এলেন। এদের মধ্যে বুতোন বিশেষ করে বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ ও বিশুদ্ধসিংহের নাম উল্লেখ করেছেন। মকর-বর্ষে এই গুরুরা দাংকর প্রাসাদে বাস করছিলেন; তিব্বতের সুশিক্ষিত অনুবাদকদল সেই সময়ে সংস্কৃত থেকে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটির শিরোনাম, এবং তাদের অধ্যায়সংখ্যা ও শ্লোকসংখ্যার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করেন। তারপরে সেই তালিকাটিকে একটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। শান্তরক্ষিতের উপস্থিতিতে এই সমস্ত কাজ হয়। তবে কিছু দিনের মধ্যে এক দুর্ঘটনায় শান্তরক্ষিতের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে।

শান্তরক্ষিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম অচিরেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে. সেই কলহ রোধ করবার জন্য শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশীলকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনতে হবে। কমলশীলই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন।

বুতোন তাঁর গ্রন্থে এই ধর্মকলহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ঠিস্রং দেচানের রাজ্যকালে চীনা পুরোহিতরা রাজার বৌদ্ধ মন্ত্রীদের বিশেষ সহায়তা করতেন। সামিয়ে বিহার প্রতিষ্ঠার পরেও তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত থাকল। শান্তরক্ষিতের আকস্মিক মৃত্যুর পরে পালইয়ং বা শ্রীঘোষ সামিয়ে বিহারের আচার্য হলেন। সেই সময়ে রাজমন্ত্রী সালনাং মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করলেন ও রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেন। সেই সুযোগে চীনা মহাযানী হোশাংদের প্রাধান্য খুবই বেড়ে গেল। তাঁরা বলতে লাগলেন, ধর্মপথে কাজ করে ও দেহমনে পুণ্যচর্যা করে বুদ্ধত্ব অর্জন করা যায় না। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করতে পারলেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি সম্ভব। তিব্বতের সাধারণ মানুষের কাছে এই মতটি বেশ সহজ ও সুখের বলে মনে হল, তাই অধিকাংশ মানুষই চীনা হোশাংকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন।

পালইয়ং বা শ্রীঘোষ ও আরও কিছু বৌদ্ধ, চীনা হোশাং-এর মত গ্রহণ করলেন না; তাঁরা আচার্য বোধিসত্ত্ব (শান্তরক্ষিত)-এর মতই অনুসরণ করতে লাগলেন। দুদলের মধ্যে বিবাদ শুরু হওয়াতে রাজা ঠিস্রোং দেচান আদেশ দিলেন যে আচার্য বোধিসত্ত্ব প্রদর্শিত পথেই সর্বভাবে—তত্ত্ব ও আচরণে—অনুসরণ করতে হবে। তোনমুনপা বা চীনা মহাযানীরা এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন; ধারালো ছুরিছোরা নিয়ে তাঁরা শেনমিনপা বা বোধিসত্ত্বের অনুগামী সবাইকে খুন করবেন বলে ভয় দেখালেন। নিজেদের ইচ্ছামত তাঁরা শত সাহস্রিক (প্রজ্ঞাপারমিতা) ও সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'ধ্যানস্বপ্নচক্র' নামে একটি গ্রন্থ তৈরি করে তাঁরা নিজেদের মনগড়া অদ্ভুত সব মত সদ্ধর্মের নামে প্রচার করতে লাগলেন।

এই সব ঘটনায় বিচলিত হয়ে রাজা ঠিস্রোং দেচান মন্ত্রী সালনাং বা জ্ঞানেন্দ্রকে তাঁর নিভৃত ধ্যান থেকে ফিরিয়ে আনলেন। চীনা হোশাং-এর মতের বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিতের

মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ভারত থেকে শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশীলকে আমন্ত্রণ করা হল। কমলশীল তিব্বতে এলেন। তখন চীনা হোশাংদের সঙ্গে শান্তরক্ষিতের শিষ্যদের এক ধর্মীয় বিতর্কের আয়োজন করা হল। মহাযান ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনকে কেন্দ্র করে এক মহাবিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হল।

চীনা হোশাং-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কমলশীল প্রথমে বললেন। কমলশীল প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করবার পরে পালইয়ং বা শ্রীঘোষ এবং সালনাং বা জ্ঞানেন্দ্র আরও তথ্য ও যুক্তি উপস্থিত করলেন। এইভাবে কমলশীল, পালইয়ং ও সালনাং চীনা হোশাং-এর ভ্রান্ত মতবাদকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করলেন। বলা হয়ে থাকে, হোশাং-এর অনুগামী চোমামা ও অন্যান্যরা পরাজয়ের গ্লানিতে নিজেদের শরীর পাথরে আছড়ে আত্মহত্যা করলেন।

আধুনিক পণ্ডিতরা অবশ্য এই বিখ্যাত বিতর্কের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, মহাযান মতের মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই শাখার বিরোধই এই বিতর্কের মূল বিষয় ছিল। যোগাচার সম্প্রদায় নাগার্জুনের মতবাদকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, চীন দেশের বৌদ্ধরা সেই ব্যাখ্যাই অনুসরণ করতেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষে তখন যোগাচারের চেয়ে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বেশি ছিল। পদ্মসম্ভব ও অন্যান্য পণ্ডিতরা তিব্বতে সেই ধারা অনুসরণ করেছেন। তবে আধুনিক পণ্ডিতদের এই ধরণের মন্তব্যের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। কারণ আমরা জানি শান্তরক্ষিত ও কমলশীল তাঁদের রচিত গ্রন্থে যোগাচার দর্শনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন এক পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধদের এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের মধ্যে চীনের তাওবাদের প্রতিফলনও দেখেছেন।

যাই হোক, এই মহাবিতর্কে কমলশীল ও তাঁর অনুগামীরা জয়লাভ করলেন এবং তাঁদের এই জয়লাভে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। রাজা ঠিস্রোং দেচান বিতর্কে কমলশীলের জয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও জারী করলেন যে এর পর থেকে তিব্বতে একমাত্র শাতরক্ষিতের মতবাদই অনুসৃত হবে। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হল না। ঠিক এর পরেই চীনা হোশাং-এর প্রেরিত চারজন ঘাতক কমলশীলকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। কিছু দিনের মধ্যে রাজা ঠিস্রোং দেচানেরও মৃত্যু হল।

২৭। রাজা মুনেচানপো ও রলপাচন

তিব্বতের ইতিহাসে রাজা ঠিস্রোং দেচানের উত্তরপুরুষদের মধ্যে মুনেচানপো, রলপাচন এবং লাংদারমা—এই তিনজন বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিব্বতের রাজবংশে বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠায় রলপাচনের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। আবার তাঁর ভাই লাংদারমা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত; বৌদ্ধধর্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও বৌদ্ধদের

প্রতি নৃশংস অত্যাচারের জন্যই তিনি তিব্বতে কুখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু ঠিস্রোং দেচানের পুত্র মুনেচানপো বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠা বা বিদ্বেষের জন্য নয়, অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কারণে তিব্বতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ঠিস্রোং দেচানের মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুনেচানপো মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিব্বতের রাজা হন। রাজা হয়ে প্রথমেই তিনি সংকল্প করেন যে তাঁর রাজ্যে উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্রের ভেদাভেদ তিনি দূর করবেন। ধনীদের বিষয়সম্পত্তি, বিলাসবহুল জীবনের ভোগের উপকরণগুলি আর তাদের নিজস্ব থাকবে না। ধনীদের সঙ্গে নিঃস্ব ও দরিদ্ররাও দেশের সকল ধনসম্পদে সমান অধিকার ভোগ করবে। এই ভাবে আদেশ জারি করে মুনেচানপো তিনবার রাজ্যে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ঘুচিয়ে সমতা আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর এই মহৎ সংকল্প তিনবারই ব্যর্থ হল ; বরং উল্টো ফলই দেখা গেল। প্রতিবারই রাজার এই চেষ্টার ফলে ধনীরা আরও ধনী হল আর দরিদ্ররা দারিদ্র্যের নিম্নতর সীমায় নেমে গেল। পণ্ডিত ও লোচাবারা বললেন যে পূর্বজন্মের অর্জিত পাপপুণ্যের ফলেই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে।

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা মুনেচানপোর এই সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের কারণ বলতে পারেন নি। মুনেচানপো একনিষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নেই। সামিয়ে বিহারে তিনি ত্রিপিটকের একটি সূত্রপিটক উপহার দিয়েছিলেন, ঐতিহাসিক সুম্‌পা (১৭০৪-১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ) এই বিহারের গ্রন্থাগারে পুস্তকটিকে সংরক্ষিত দেখেছিলেন। বোধিগর্ভ রচিত 'হেবজ্রসাধন' নামক গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদকদের মধ্যে ভারতীয় পণ্ডিত ও তিব্বতী লোচাবার সঙ্গে মুনেচানপোর নামও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠাতেই মুনেচানপো দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, একথাও জোর করে বলা যায় না। কারণ তিব্বতের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান আরও কয়েকজন বিশিষ্ট রাজার নাম আমরা পাই। যেমন মুনেচানপোর পিতা ঠিস্রোং দেচান, মুনেচানপোর ভ্রাতুষ্পুত্র রলপাচন, পশ্চিম তিব্বতের রাজা এশেওদ ও জনছুবওদ, প্রভৃতি। এঁরা কেউই কোনোভাবে সামাজিক ধনবৈষম্য নিয়ে চিন্তা করেন নি। মুনেচানপোর এই যুগান্তকারী প্রচেষ্টাকে এক বিশেষজ্ঞ সমাজবিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তার মৌলিক প্রেরণা কী ছিল, তা সঠিকভাবে আমাদের জানা নেই।

এক ইউরোপীয় গবেষক মুনেচানপোর এই সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিব্বতে সামন্তপ্রভুরা বরাবরই প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিলেন। তাদের ধর্মীয় প্রভুত্ব চূর্ণ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি খর্ব করবার জন্যই সম্ভবত ঠিস্রোং দেচান পোন ধর্মকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন। সুযোগ পেলেই এই সামন্তপ্রভুরা রাজাদের উপরেও খবরদারি করবার চেষ্টা করতেন। নাবালক অবস্থায় মুনেচানপো ভালভাবেই তার পরিচয় পেয়েছিলেন। সামন্তপ্রভুদের শক্তির মূলে আঘাত হানবার জন্য পিতা ঠিস্রোং দেচান পোনধর্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন আর পুত্র মুনেচানপো সেই একই উদ্দেশ্যে দেশে ধনীদরিদ্রের বৈষম্য দূর

করে সামাজিক সমতা আনতে চেয়েছিলেন। মুনেচানপো ভূস্বামীদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় দখলে এনে তিনবার সাধারণ প্রজাদের মধ্যে তা আবার বিলি করে দিয়েছিলেন।

মাত্র একবছর সাতমাস রাজত্ব করবার পরে সতেরো বৎসর বয়সের এই তরুণ রাজাকে হত্যা করা হয়। বিষপ্রয়োগে তাঁর মা তাকে হত্যা করেন ও মুনেচানপোর ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসান। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এক গবেষক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন; মুনেচানপোর মা এক প্রচন্ড শক্তিশালী সামন্ত-পরিবারের মেয়ে ছিলেন। ছেলে যখন সামন্ত শক্তিগুলিকে আঘাত করতে চাইলেন তখন মায়ের হাত দিয়েই গোপনে প্রত্যাঘাত নেমে এলো। মা পিতৃবংশীয়দের প্ররোচনায় শ্রেণীস্বার্থকেই বড় করে দেখলেন এবং আপন সন্তানকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হলেন না! তিব্বতের ইতিহাসে সম্ভবত মুনেচানপোই সবচেয়ে স্বল্পকালের রাজা।

পরবর্তী দুজন রাজার সময়ে তিব্বতে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তারপরে মুনেচানপোর ভাইপো সদনালেগের পুত্র রলপাচন আঠারো বৎসর বয়সে রাজা হলেন! বৌদ্ধধর্মে গভীর নিষ্ঠায় তিব্বতের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন, স্বদেশে তিনি বজ্রপাণি বুদ্ধের অবতার রূপে পূজিত। রলপাচন অর্থে জটাধারী। বুদ্ধভক্তির জন্যই রাজার এই নামকরণ হয়েছিল। তিনি তাঁর দীর্ঘজটার উপরে আসন করে বৌদ্ধভিক্ষু ও লোচাবাদের বসতে দিতেন। তিব্বতের বৌদ্ধ-রাজাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বুদ্ধের প্রকৃত বাণীকে কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন। তিনি সকল সামরিক কার্যকলাপ, অন্যদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান বন্ধ করে দেন। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বিশেষ করে চীনের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব ও শান্তির সম্পর্ক স্থাপন করেন। চীন সম্রাটের সঙ্গে একত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করে তাঁরা একসঙ্গে ঘোষণা করেন: এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে সকল শত্রুতা ও তিক্ত সম্পর্কের অবসান ঘটাবে। স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করবে। এই চুক্তির ফলে তিব্বতের মানুষরা তিব্বতে ও চীনের মানুষরা চীনে নিরুপদ্রবে বাস করবে। ত্রিরত্ন, বোধিসত্ত্বগণ, চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র—সকলকে সাক্ষ্য রেখে এই চুক্তি সম্পাদিত হল।

চীন ও তিব্বত, এই প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে যুদ্ধ চলছিল, ৮২২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত এই চুক্তির ফলে তার অবসান ঘটে। এই দুই দেশের মধ্যে এর আগে যে সব শান্তি চুক্তি হয়েছিল, তা কোন সময়েই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; কিন্তু তিব্বতে রাজতন্ত্র যতদিন বজায় ছিল, রলপাচনের এই চুক্তিও ততদিন বলবৎ ছিল।

একই সঙ্গে রলপাচন দেশে বৌদ্ধধর্মকে শক্তিশালী করবার উদ্যোগ নিলেন। তিনি একটি নয়তলা মন্দির নির্মাণ করলেন। তার সর্বোচ্চ তিনটি তল কাঠের, মধ্যের তিনটি তল ইটের ও নীচের তিনটি তল পাথরের। উপরের তিনটি তলে বৌদ্ধশাস্ত্র, মূর্তি চৈত্য ইত্যাদি রাখা হল, মধ্যের তিনটি তলে পন্ডিত ও লোচাবাদের স্থান করা হল; নীচের তিনটি তল রাজকাজে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হল। বৌদ্ধভিক্ষুরা দেশে বিশেষ সম্মান পেলেন এবং প্রতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রয়োজন

মিটাবার জন্য মাথাপিছু পাঁচজন গৃহস্থ কর দেবেন—রাজা এই আদেশও জারি করলেন।

এই সময়ে ভারতীয় গ্রন্থসমূহ অনুবাদেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাঁর পূর্বপুরুষ ঠিস্রোং দেচানের সময়ে গুরু বোধিসত্ত্ব বা শান্তরক্ষিতের নির্দেশে তিব্বতী লোচাবারা বহু ভারতীয় গ্রন্থ তিব্বতীতে অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ অনুবাদে তাঁরা যে সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, প্রথম অনুবাদের আড়ষ্টতা ও অসুবিধার জন্য সেই ভাষা তিব্বতের মানুষের কাছে সহজবোধ্য হল না। এছাড়া সেই সময় চীন, লি ও সাহোর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ভাষা থেকেও বহু গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছিল। এই অনুবাদগুলি সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। রলপাচন বুঝলেন এই অনুবাদের পদ্ধতি বদলানো দরকার। সঠিক অনুবাদের জন্য তখন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হল। এক রাজাদেশে বলা হল, জিনমিত্র, সুরেন্দ্রবোধি, শীলেন্দ্রবোধি, বোধিমিত্র প্রভৃতি অপরান্তের গুরুবৃন্দ, তিব্বতের রত্নরক্ষিত, ধর্মতাশীল প্রভৃতি পণ্ডিতরা এবং জ্ঞানসেন, জয়রক্ষিত, মঞ্জুশ্রীবর্মণ প্রভৃতি সুদক্ষ অনুবাদকরা একত্রে মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করবেন। সেই নির্দেশমত নূতন উৎসাহে অনুবাদের কাজ শুরু হল। স্থির হল সর্বাস্তিবাদীরা যা যানেন না এমন হীনযানী গ্রন্থসমূহ এবং গুহ্যমন্ত্র ইত্যাদি অনুবাদ করা হবে না। পূর্বের অনুবাদগুলিও নূতন করে সম্পাদনা করা হল। অনুবাদগুলি এমনভাবে করা হল যাতে সকলেই তা পড়তে ও বুঝতে পারেন। মূল গ্রন্থগুলি ও তার অনুবাদসমূহ বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে তার একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করা হল। রাজা আদেশ দিলেন যে অনুবাদের যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল, তা কোনোমতেই লঙ্ঘন করা চলবে না।

'মহাব্যুৎপত্তি' নামে সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধানে প্রায় দশ হাজার শব্দ সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, রলপাচন নির্মিত নয়তল বিশিষ্ট ওনচাংদো প্রাসাদে রাজা ঠিদেস্রোংচান (পূর্বতন রাজা ঠিস্রোং দেচান নন)-এর আদেশে এই অভিধানটি রচিত হয়। বিশেষজ্ঞের মতে এই ঠিদেস্রোংচান এবং রলপাচন একই ব্যক্তির নাম। বুতোন ও গোই লোচনা—উভয় ঐতিহাসিকের মতে, রলপাচনের সময়েই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত ঊর্ধ্বগতি দেখা দিয়েছিল, তারপরে তার পতন ঘটে। পরে তিব্বতে অতীশের আগমনের ফলে তার গৌরবময় যুগ আবার ফিরে আসে।

বৌদ্ধধর্মে গভীর নিষ্ঠাই রলপাচনের মৃত্যুর কারণ হয়। রলপাচন রাজধানীর শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব এক বৌদ্ধভিক্ষুকে দেন। বিভিন্ন কদাচারে ও ব্যভিচারে আসক্ত রাজমন্ত্রীরা তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য খর্ব করবার জন্য তাঁরা গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। রাজপুত্র ছৎমা বৌদ্ধদীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষু হয়েছিলেন, কৌশলে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হল। মহামান্য বৌদ্ধভিক্ষু ইওনতন পাল ও রাণী ইয়ংছুলমার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে

মিথ্যা রটনা করা হল। শেষ পর্যন্ত ইওনতন পালকে হত্যা করা হল এবং রাণী আত্মহত্যা করলেন। ষড়যন্ত্রীদের দুজন একদিন সুযোগ বুঝে রলপাচনকেও হত্যা করল। ছত্রিশ বৎসর বয়সে ৮৪১ খ্রিস্টাব্দে রলপাচন নিহত হলেন।

তিব্বতের সামন্ত শক্তিই এই হত্যাকান্ড সংগঠিত করে। তাদের প্রতিনিধিদের হঠিয়ে দিয়ে রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি বৌদ্ধভিক্ষুদের দেওয়া হচ্ছে দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রলপাচন এই ষড়যন্ত্রের বলি হন। রাজাকে হত্যা করে এই সামন্তচক্র তারপরে তার ভাই লাংদারমাকে সিংহাসনে বসাল। লাংদারমার অন্ধ বৌদ্ধবিদ্বেষ তিব্বতের ইতিহাসে সুবিদিত।

২৮। লাংদারমা

বিভিন্ন ঐতিহাসিক লাংদারমার এই অন্ধ বৌদ্ধবিদ্বেষের বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন। কেউ কেউ এই বিদ্বেষের মধ্যে দেশের প্রাচীন পোন ধর্ম ও বহিরাগত বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষের প্রতিফলন দেখেছেন। কিন্তু এই সংঘর্ষের মূল কারণ সম্ভবত ধর্মীয় নয়; সামাজিক ও রাজনৈতিক। তিব্বতে একসময় ক্ষুদ্রবৃহৎ কতকগুলি সামন্তবংশের প্রাধান্য ছিল। তিব্বতের প্রথম সম্রাট স্রোংচানগামপোর পিতা নামরিস্রোংচান এই সামন্ত শক্তিগুলিকে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। এই সামন্তবর্গই ক্রমে দেশের রাজশক্তির প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে। স্রোংচান গামপো, ঠিস্রোং দেচান প্রভৃতি শক্তিশালী রাজারা সিংহাসনে আসীন হয়ে এই সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা সংযত করেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই সামন্তপ্রভুরা বারবার মাথা তুলে আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছেন। বারবার তাই তিব্বতে সামন্তশক্তির ও রাজশক্তির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে।

এই সামন্তশক্তির একটি বড় অংশ দেশের প্রাচীন ধর্ম পোন মতবাদকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে, অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে, রাজশক্তিও পাল্টা হাতিয়ার হিসাবে বৌদ্ধ-ধর্মকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছে। এই সংঘর্ষের শিকার হয়েছেন রলপাচন ও মুনেচানপো। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ভীষণতম শত্রু লাংদারমার এক ভয়ংকর চিত্রই তিব্বতের ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, রাজমন্ত্রীদের মধ্যে রলপাচনের শত্রু যারা ছিল, তাঁরাই লাংদারমার হয়ে ক্ষমতা দখল করল। দেশ থেকে বৌদ্ধধর্মকে নির্মূল করবার জন্য তারা অবিলম্বে সবরকম ব্যবস্থা নিল। যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসে লোচাবা ও পণ্ডিতেরা সংস্কৃতগ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন সেই গৃহগুলি ভেঙে দেওয়া হল। ফলে অনুবাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। লাংদারমা যখন সাবালক হলেন তখন সাক্ষাৎ শয়তান এসে যেন তার উপর ভর করল। বুতোন বলেছেন, রাজা হয়েই লাংদারমা আদেশ জারি করলেন, বৌদ্ধভিক্ষুদের সবাইকে সন্ন্যাসজীবন ছাড়তে হবে। যাঁরা সন্ন্যাস ত্যাগ করতে চাইলেন না, তাঁদের তীর-ধনুক,

দামামা, তম্বুরা দিয়ে সাজিয়ে শিকারীর পেশা নিতে বাধ্য করা হল। যাঁরা অমান্য করলেন, তাঁদের হত্যা করা হল। সম্রাট স্রোংচান গামপোর চীনা পত্নী যে শাক্যমুনির মূর্তিটিকে তিব্বতে সঙ্গে করে এনেছিলেন, সেটিকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা হল। কিন্তু মূর্তিটিকে সরানো গেল না, তখন বালু দিয়ে মূর্তিটিকে ঢেকে দেওয়া হল, মন্দিরের দরজাগুলি ইট গেথে বন্ধ করে দেওয়া হল। বন্ধ দরজার গায়ে রাজাদেশে মদ্যপানরত ভিক্ষুদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হল। সামিয়ে, রামোছে প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারগুলিরও একই অবস্থা হল। ধর্মবিশ্বাসীরা বিহারগুলির গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থসমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কাছাকাছি পাহাড়ে লুকিয়ে ফেললেন।

গোই লোচাবা বলেছেন, লাংদারমা পানাসক্ত ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। তিব্বতে তখন প্রচণ্ড অশান্তি দেখা দিল। পাহাড় ভেঙে পড়ল, নদীগুলি উজান বইতে লাগল। চারিদিকে দুর্লক্ষণ দেখা গেল, গোটা রাজ্যটাই যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হবার উপক্রম হল। লাংদারমা স্বয়ং বুদ্ধ ও তাঁর ভক্তদের অশ্রাব্য ভাষায় নিন্দা করতেন। পাপিষ্ঠ লাংদারমার চেহারাও ছিল ভীষণ। মাথায় তার দুটি শিং ছিল, চুল দিয়ে কৌশলে তা ঢেকে রাখা হত। তাঁর নাম থেকেই হয়তো তাঁর মাথায় একজোড়া শিং-এর কল্পনাটি এসেছে, কারণ তিব্বতী লাং কথাটির মানে বৃষ বা বলদ।

তিব্বতের ইতিহাসে লাংদারমার কালাপাহাড়ী ভূমিকা এমন ভয়ংকর করে দেখানো হয়েছে বলে স্বভাবতই লাংদারমার হত্যাকারী পালজি দোরজে তিব্বতের মানুষের কাছে দুষ্কৃতবিনাশকারী পরিত্রাণকর্তার ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন। এই হত্যাকাহিনী শুধু যে ইতিহাসগ্রন্থেই স্থান পেয়েছে তা নয়, তিব্বতে এই কাহিনী অবলম্বনে অনুষ্ঠিত মুখোসনাট্য ইত্যাদিও খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

লাংদারমার হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণকে সংক্ষেপ করলে জানা যায়, শূন্য থেকে সাধু পালজি দোরজের কাছে দেবীর আদেশ নেমে এল, "পাপাচারী লাংদারমার অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা কর।" পালজি দোরজে তখন লাংদারমার হিংস্র কার্যকলাপের ফলে স্বদেশের দুর্গতির কথা জানলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। প্রথমে তিনি একটি সাদা ঘোড়ার গায়ে কালো রং মাখিয়ে তাকে কালো করলেন, তারপর সাদা ও কালো এই দুই রং-এর একটি লোমের কোট পরে তার সাদা দিকটা বাইরে রেখে গায়ে দিলেন। ঘোড়ায় চড়ে তিনি রাজদর্শনে গেলেন। রাজার সম্মুখে এসে তিনি নত হলেন। যেন মাটিতে বসে প্রণাম করছেন এমন ভাব করে হাঁটু মুড়ে ধনুকটি বাঁকালেন। রাজা ভাবলেন পালজি দোরজে সত্যই প্রণাম করছেন। আরও নত হয়ে পালজি দোরজে শরটির নিশানা ঠিক করলেন, তৃতীয়বার নত হয়ে তিনি শরটিকে জ্যামুক্ত করলেন, অব্যর্থ লক্ষ্যে শরটি রাজার বক্ষভেদ করল। পালজি দোরজে রাজাকে বললেন, "আমি কৃষ্ণদানব ইয়াশের। দুর্বৃত্ত রাজাকে হত্যা করতে হলে এইভাবেই করা উচিত।" বলে তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে তিনি স্থানত্যাগ করলেন।

চারদিকে রব উঠল, "রাজাকে খুন করা হয়েছে! খুনীকে ধর! ধর!" পালজি দোরজে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে মিনাগ হ্রদে এসে পৌঁছলেন। হ্রদের জলে ঘোড়াটিকে ধুয়ে তার কাল রং তুলে সাদা করলেন, লোমের কোটটিকে উল্টে নিয়ে সাদা দিকটি বাইরে দিলেন। বললেন, "এখন আমি শূন্যের শ্বেতদানব।" বলে পালিয়ে যেতে লাগলেন। কেউ তাকে ধরতে পারল না।

যাই হোক, লাংদারমা দেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন, তার সেই ইচ্ছা সাময়িকভাবে পূর্ণ হয়েছিল।

২৯। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয়

লাংদারমার শাসনকালকে তিব্বতের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্যায় বলে বর্ণনা করা হয়। তিব্বতের ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে এইসময়ে তিব্বতের পালচু বোরি বিহারের তিনজন বৌদ্ধভিক্ষু লাংদারমার অত্যাচারের কথা শুনে বিহারের বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে অনেক দূরে চলে যান। আমদোতে গিয়ে তাঁরা গেবা রবসলের সাক্ষাৎ পান।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয়ে গেবা রবসলের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। গেবা রবসল জল-মূষিক-বর্ষ বা ৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনজন তিব্বতী ও দুজন চীনাভিক্ষু একত্র হয়ে তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে গেবা রবসল দনতিগ পর্বতে যান ও সেখানে বসবাস শুরু করেন। জীবনের শেষ পঁয়ত্রিশ বৎসর তিনি সেখানেই কাটান। এই অঞ্চলে তিনি বহু মন্দির ও স্তূপ নির্মাণ করেন। তিনি যে দশজন তিব্বতী তরুণকে বৌদ্ধদীক্ষা দেন, তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাসে এঁদের নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

ঐতিহাসক গোই লোচবা এই প্রসঙ্গে বলেছেন জল-অশ্ব-বর্ষে অর্থাৎ ১০৪২খ্রিস্টাব্দে অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান যখন তিব্বতে আসেন, তখন গেবা রবসলের এই দশজন শিষ্যের মধ্যে একজন—য়েশেলোডোয়—জীবিত ছিলেন! তিব্বত পরিভ্রমণের সময় অতীশ যখন মধ্য তিব্বতে আসেন তখন ব্রোমতোনপা তাঁর সম্মানে এক বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে য়েশেলোডোয়-এর উপস্থিতি প্রার্থনা করে ব্রোমতোনপা আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন। এই লিপিতে তিনি য়েশে লোডোয়কে বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবনের নেতা মহাভদন্ত বলে সম্বোধন করেন।

লাংদারমার মৃত্যুর পরে গেবা রবসল এবং তাঁর দশজন শিষ্য তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম, পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। অতীশ যখন তিব্বতে আসেন তখন এই দশজন শিষ্যের শিষ্যরা তিব্বতে বর্তমান ছিলেন। তবে তিব্বতে অতীশের আগমনের ফলেই বৌদ্ধ-ধর্মের প্রকৃত পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়। সেই কারণে তিব্বতে ঐতিহাসিকদের কাছে অতীশের তিব্বত পদার্পণের ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এবং তাকে ভিত্তি করে তাঁরা স্বদেশে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের পরবর্তী পর্যায়ও নির্দিষ্ট করেছেন।

৩০। ধর্মরাজ এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ

লাংদারমার দুই রাণীর দুই পুত্র উমতন ও ওদস্রুং। লাংদারমা নিহত হবার পরে সিংহাসনের দাবি নিয়ে দুই ভাই-এর ঝগড়া চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত, অখণ্ড সাম্রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে উমতন পূর্ব তিব্বতের ও ওদস্রুং পশ্চিম তিব্বতের রাজা হন। ওদস্রুং-এর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র পালখোরসান রাজা হলেন, কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই প্রজারা তাঁকে হত্যা করল। পালখোরসানের মৃত্যুর পরে তাঁর এক পুত্র চাং-এ ও অন্যজন ঙারিতে চলে যান। পরবর্তীকালে তিব্বতের ইতিহাসে ঙারি নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে।

ঙারির রাজার তিন ছেলে আবার পশ্চিম তিব্বতের মাংউল, পুরাং ও গুগে—এই তিন অংশে রাজত্ব শুরু করেন। গুগের রাজবংশে খোরদে বা ধর্মরাজ এশেওদ-এর (বা জ্ঞানপ্রভের) সময় থেকেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের গতিপথ স্পষ্টতর হয়।

লাংদারমা নিহত হবার পরে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের নামে চরম উচ্ছৃংখলতা দেখা দেয়। লাল বা নীলবস্ত্র ধারণ করে কিছু লোক নিজেদেরকে তান্ত্রিক বলে প্রচার করতে থাকে। তারা নিজেরাই কতকগুলি বই লেখে এবং সেগুলিকে তন্ত্রশাস্ত্র বলে দাবি করে। দশম শতকে প্রজ্ঞাগুপ্ত নামে এক ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসেন। তিনি তাঁর আঠারো জন শিষ্য নিয়ে বিকৃত তান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। নরবলি থেকে শুরু করে তাদের নানা বীভৎস কার্যকলাপে তিব্বতে ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও কলহ আরও বাড়তে থাকে।

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা বলেন, লাংদারমা বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, আর তাঁরই বংশের পঞ্চমপুরুষ খোরদে বা ধর্মরাজ এশেওদ পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মকে সকল কলুষমুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গোই লোচাবা ও সুম্‌পা বলেছেন: খোরদে তাঁর দুই পুত্রসহ বৌদ্ধদীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে তাঁর নাম হয় এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ, পুত্রদের নাম হয় নাগরাজ ও দেবরাজ। ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে এশেওদ তাঁর ভাই স্রোংদের হাতে রাজ্যভার তুলে দেন। তিব্বতে এই সন্ন্যাসীরাজা দেবগুরু, পণ্ডিত, একগুরু প্রভৃতি নানা সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

সদ্ধর্মের নামে বিকৃত তান্ত্রিক মতবাদের প্রাধান্য দেখে এশেওদ খুবই বিচলিত হলেন। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি সর্বভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। প্রথমে তিনি একুশজন ধীমান তিব্বতী তরুণকে নির্বাচন করলেন। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবভূমি থেকে তাঁরা ধর্ম ও শাস্ত্রশিক্ষা করবেন বলে তাঁদের ভারতে পাঠালেন। এই দলে রিনছেন সাংপো বা রত্নভদ্রও ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অনুবাদ দক্ষতার জন্য রিনছেন সাংপো পরবর্তীকালে তিব্বতের রাজগুরুর পদলাভ করেন ও মহালোচাবা বলে সম্মানিত হন।

তিব্বতের বিভিন্ন কাহিনী থেকে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাজে এশেওদের জীবন উৎসর্গ

করার মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সময় ভারত থেকে যোগ্য পণ্ডিত আমন্ত্রণ করবার জন্য প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। তিব্বতে সদ্ধর্ম সংস্কারের জন্য এশেওদ ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য বিশেষ করে অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে আমন্ত্রণ করে আনতে চান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তিব্বতের সীমান্তে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, এবং বিধর্মী গারলোগদের হাতে বন্দী হলেন। তারা তাঁর দেহের সমান ওজনের স্বর্ণ মুক্তিপণ দাবি করে। এশেওদের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজভিক্ষু জনছুবওদ এই স্বর্ণ সংগ্রহ করে পিতৃব্যের প্রাণরক্ষা করতে চেষ্টা করেন। সেই সংবাদ পেয়ে এশেওদ কারাগার থেকে তাঁর অন্তিম ইচ্ছার কথা জনছুবওদকে জানান : বিধর্মীদের স্বর্ণপণ দিয়ে এশেওদের প্রাণরক্ষার পরিবর্তে সেই স্বর্ণ দিয়ে ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে যেন জনছুবওদ তিব্বতে আনবার ব্যবস্থা করেন। তিব্বতে এসে দীপংকর শ্রীজ্ঞান যেন এশেওদের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব নেন—তাঁর চরণে এশেওদের এই অন্তিম প্রার্থনা যেন নিবেদন করা হয়। নিজের জীবনরক্ষার চেয়ে স্বদেশে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এই সর্বত্যাগী রাজভিক্ষুর কাছে বড় হয়েছিল। তিব্বতের ঐতিহাসিকরা এশেওদের বন্দীদশা ও অন্তিমজীবনের করুণ ও আবেগপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।

তিব্বতে এশেওদ যে বৌদ্ধবিহারগুলি নির্মাণ করেন, তাদের মধ্যে শাংশুং (গুগে-র) থোলিং বিহার বা অনুপম-নিরাভোগ বিহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রিনছেন সাংপো এই বিহার নির্মাণে এশেওদকে সাহায্য করেন। এই বিহারটি পালবাংলা ও তিব্বতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সূত্র বলে গণ্য হয়েছিল। হিন্দু সন্ন্যাসীরা এই বিহারটিকে আদি বদরী বলে ভক্তি করতেন। এই বিহারে যে সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল, তাঞ্জুর সংকলনে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে এই বিহারেই প্রথম পদার্পণ করেন। এখানেই তিনি তাঁর সর্বপ্রধান গ্রন্থ 'বোধিপথ প্রদীপ' রচনা করেন। তিব্বতের ইতিহাসে থোলিং বিহার তাই বিশেষ গরিমায় মণ্ডিত।

তিব্বতের ইতিহাস ও উপখ্যানগুলিতে এশেওদের জীবন ও কার্যকলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা যে কাল্পনিক নয়, প্রখ্যাত তিব্বত তত্ত্ববিদ ফ্রাঁকের আবিষ্কার ও সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিব্বতের সীমান্তবর্তী স্থানে অভিযানের সময়ে ফ্রাঁকে শতদ্রুর দক্ষিণে কোর নামক একটি গ্রামে একটি শিলালিপির সন্ধান পান। এই প্রশস্ত শিলালিপিতে এগারোটি চরণ খোদিত ছিল এবং 'লহা-লামা এশেওদ' এই কথা দিয়ে প্রথম চরণটি শুরু হয়েছিল। আর একটি শিলালিপিতে একই সঙ্গে তিনি রিনছেন সাংপো, জনছুবওদ ও ফুলজুং বা অতীশের নাম পান।

এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে তাঁর নিজের প্রচণ্ড উল্লাসের বর্ণনা ফ্রাঁকে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "হঠাৎ বিদ্যুতঝলকের মতো আমার মনে পড়ল, এই এশেওদ, গুগের সেই প্রাচীন রাজা বা রাজভিক্ষু, যিনি বিখ্যাত ভারতীয় আচার্য অতীশকে তাঁর

রাজ্যে নিয়ে আসবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ এ পর্যন্ত কোথাও আমরা সুনিশ্চিতভাবে পাইনি, এই প্রথম তা পাওয়া গেল। এই অভাবিত আবিষ্কারে আমার এত আনন্দ হল যে আনন্দের আতিশয্যে ক্ষেতের মধ্যেই লাফালাফি শুরু করলাম; শস্যক্ষেতের এহেন দুর্দশা দেখে ক্ষেতের মালিক তখন বিশেষ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, আর সেই সময়েই আমি উল্লাসভরে সেই লামাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।"

অতীশকে কারা, কীভাবে তিব্বতে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, ফ্রাঁকের এই আবিষ্কারের পরে সে বিবরণের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

৩১। অতীশের অপেক্ষায় তিব্বত

অতীশ তিব্বতে ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর আগমনের প্রয়োজন ও সাফল্যের গুরুত্ব বুঝতে হলে প্রথমেই সেই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের নামে যে কদাচার চলছিল, তার পরিচয় পাওয়া দরকার। সদ্ধর্মের নামে তান্ত্রিক মতবাদের এই প্রভাবে বিরক্ত হয়ে রাজভিক্ষু এশেওদ যে একুশজন তরুণকে নির্বাচিত করে ধর্মশিক্ষার জন্য ভারতে পাঠান তাঁদের মধ্যে রিনছেন সাংপো, লেগপেই শেরব এবং লোছুং ডাগজোর শেরব—এই তিনজনই জীবিত অবস্থায় তিব্বতে ফিরে আসতে পারেন। রিনছেন সাংপো ভারত থেকে শ্রদ্ধাকরবর্মণ, বুদ্ধশ্রীশান্ত, বুদ্ধপাল, কমলগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতদের তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনলেন ও তাঁদের সাহায্যে অনেক তন্ত্রশাস্ত্র অনুবাদ করলেন।

কিন্তু এশেওদের উদ্দেশ্য এইভাবে সার্থক হল না। রিনছেন সাংপো নিজেই তান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং যোগতন্ত্র, গুহ্যতন্ত্র ইত্যাদি অনুবাদ করে 'নব্যতন্ত্র' নামে তান্ত্রিক মতবাদই প্রচার করতে লাগলেন। যে সব ভারতীয় পণ্ডিতদের তিনি তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনলেন, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা তান্ত্রিক আচার্যরূপেই খ্যাত। আমরা জানি ভারতে সেই অবক্ষয়ের যুগে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মও ক্রমে তান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। বৌদ্ধধর্মের মূল শাস্ত্রগুলির পঠন-পাঠন দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, এমন কি বিক্রমশীল বিহারের দ্বারপণ্ডিতদের মধ্যে সেই সময়ের বিখ্যাত তন্ত্রাচার্যদের নামও আমরা পাই। যেমন, কাশ্মীরের তন্ত্রাচার্য রত্নবজ্র; বিক্রমশীলের ষষ্ঠ দ্বারপণ্ডিতের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

আচার্য শান্তরক্ষিত তিব্বতে যে বিশুদ্ধ মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন, যে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অনুবাদ করিয়েছিলেন, ভারতে তখন সেইভাবে মৌলিক ও শাস্ত্রীয় ধর্মচর্চা প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই রিনছেন সাংপো প্রভৃতি ভারতে ধর্মশিক্ষা করতে এসে তান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। আর তার চল্লিশ বৎসর পরে দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সুদূর সুবর্ণদ্বীপে যেতে হয়েছিল।

রিনছেন সাংপো তিনবার কাশ্মীরে এসেছিলেন ও পঁচাত্তর জন পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন, তবুও তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি রোধ করা যায় নি। এঁদেরও অন্তিম নির্দেশ অনুসরণ করে রাজভিক্ষু জনছুবওদ দেখলেন: তিব্বতে বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ থাকলেও, ধর্মের নামে যৌনাচার, বলিদান প্রভৃতি ভ্রষ্টাচারও তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। সৎ আচরণ নয়, পুণ্যকর্ম নয়, শুধুমাত্র শূন্যতা ধ্যান করলেই বোধিলাভ হবে—এই বলে অনেকেই বোধিসত্ত্ব চর্যার পথ ত্যাগ করছেন। তিনি বুঝলেন, এই নৈতিক দোষগুলি দূর করবার জন্য প্রকৃত জ্ঞানীদের আমন্ত্রণ করে আনা দরকার। এর আগে যে সব পণ্ডিতরা এসেছেন, তাঁরা তিব্বতের কোনো কোনো অংশে ভাল কাজ করলেও, তাতে তিব্বতের সামগ্রিক নৈতিক উন্নতি হয় নি। কিন্তু শ্রদ্ধেয় প্রভু জোবোজে বা অতীশকে যদি তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনা যায়, তবেই সদ্ধর্মের প্রকৃত উপকার হবে।

ঐতিহাসিক বুতোন রিনছেন ড়ুব সংক্ষেপে এই আমন্ত্রণের বিবরণ দিয়েছেন: জনছুবওদ নাগছো ছুলঠিম জলবা ইত্যাদি পাঁচজনকে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে বললেন, তাঁরা যেন জ্যাতোন চোনড়ুই সেংগের নেতৃত্বে ভারতে গিয়ে একজন যোগ্য পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে আনেন। এর পরে, নাগছো ছুলঠিম জলবা অর্থাৎ জয়শীল এবং জ্যাতোন চোনড়ুই সেংগে অর্থাৎ বীর্যসিংহ—এই দুজন তরুণ ভিক্ষুর সানুনয় নিবেদনেই অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যেতে সম্মত হন।

নাগছো লোচাবা লৌহ-শূকর-বর্ষে (১০১১ খ্রিস্টাব্দে) ঙারি গুনথাং-এ জন্মগ্রহণ করেন। নাগছো পরিবারের এই সন্তানটি পরে বেশ ভাল সংস্কৃত শেখেন। অভিধর্ম ও অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি ভারতে আসেন। সম্ভবত চোনড়ুই সেংগে তাঁর প্রথমবার ভারত যাত্রার সঙ্গী ছিলেন; দুই বৎসর শিক্ষা লাভ করে নাগছো স্বদেশে ফিরে যান। চোনড়ুই সেংগে ভারতেই থেকে যান। জনছুব ওদের আদেশে নাগছো লোচাবা অতীশ দীপংকরকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য দ্বিতীয়বার ভারতে বিক্রমশীল বিহারে আসেন। তখন চোনড়ুই সেংগে ঐ বিহারেই বাস করছিলেন।

গোই লোচাবার বর্ণনায় জানা যায় যে, নাগছো ও তাঁর সঙ্গীদল রাত্রিকালে বিক্রমশীলে এসে পৌঁছালেন। বিহারের প্রবেশ-কক্ষের উপরের ছাদে বীর্যসিংহ তখন বসে ছিলেন। নাগছো ও তাঁর সঙ্গী কয়েকজন তিব্বতী ভাষায় প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। শুনতে পেয়ে বীর্যসিংহ চেঁচিয়ে বললেন, "আপনারা কি তিব্বতের মানুষ? আগামীকাল আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।" শরৎচন্দ্র দাস বলেছেন, নাগছোকে চিনতে পেরে বীর্যসিংহ বললেন, "তুমি তো আমার শিষ্য নাগছো!" পরের দিন চোনড়ুই সেংগে বা বীর্যসিংহ নাগছোকে প্রভু (অতীশের) কাছে নিয়ে গেলেন।

তিব্বতী সূত্র থেকে জ্যাতোন চোনড়ুই সেংগে বা বীর্যসিংহ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঞ্জুর গ্রন্থসংকলনে সংরক্ষিত, মূল সংস্কৃত থেকে তিব্বতী

ভাষায় তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলি দেখলে তিনি যে একজন সুদক্ষ লোচাবা বা অনুবাদক ছিলেন, এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। ভারত ও তিব্বতে দীপংকরের প্রত্যক্ষ নির্দেশে যে অনুবাদকদল ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ তিব্বতী ভাষায় তর্জমা করেন, বীর্যসিংহই তাঁদের মধ্যে প্রথম অনুবাদকর্মে অগ্রণী হন।

তিব্বত যাত্রাপথে দীপংকর প্রথমে চোনড্রুই সেংগে বা বীর্যসিংহকে তাঁর নিজস্ব দোভাষী করেন। কিন্তু চোনড্রুই সেংগে নিজ মাতৃভূমি তিব্বত পেঁছাতে পারলেন না। লৌহ-সর্প-বর্ষ বা ১০৪১ খ্রিস্টাব্দ অতীশ দীপংকর নেপালে কাটান, সেই সময় প্রবল জ্বরে বীর্যসিংহের নেপালেই মৃত্যু হয়। এমন একজন বিশ্বস্ত শিষ্য ও সুযোগ্য অনুবাদকের মৃত্যুতে অতীশ মর্মান্তিক আঘাত পান। তাঁর মনের ভাব এমন হয় যে তিনি ভাবেন, বীর্যসিংহের অভাবে তাঁর তিব্বতে যাওয়া কোনমতেই সার্থক হবে না। নাগছো ছুলঠিম জলবা তাঁকে প্রবোধ দেন ও বলেন, তিব্বতে আরও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ অনুবাদক আছেন এবং তাঁরা অতীশের নির্দেশে কাজ করবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়ে আছেন। দীপংকর তখন নাগছোকে তাঁর দোভাষী করলেন ও বললেন নাগছোর কাছ থেকে তিনি তিব্বতী ভাষা শিখবেন।

অতীশের তিব্বতী শিষ্যদের মধ্যে নাগছোই সবচেয়ে বেশিদিন অতীশের সঙ্গে কাটান। নাগছো বলেছেন, "উনিশ বছর আমি প্রভুর (দীপংকরের) সেবা করেছি।" অতীশ দীপংকরকে নিয়ে তিব্বতে যাবার আগে নাগছো তিন বছর ভারতে বিক্রমশীল বিহারে ছিলেন। ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে দীপংকরকে নিয়ে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে অতীশের মৃত্যু হয়। নাগছো অতীশের মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন না। সেই কারণে পরবর্তীকালে অতীশের শিষ্যদের মধ্যে নাগছো সম্পর্কে বিরূপ ধারণা হয়। গোই লোচাবা অবশ্য নাগছোর এই অনুপস্থিতির একটি কারণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সেই সময় কাশ্মীরের পণ্ডিত জ্ঞানাকর নেপালে এসেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে নাগছো জ্ঞানাকরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হন। নাগছোর মনোভাব জানতে পেরে দীপংকর তাঁকে বলেন, "মহাযানের কল্যাণ মিত্রের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। তাই, হে লোচাবা! তোমার যাওয়া উচিত। আমিও আর বেশিদিন থাকব না, তুষিতে আবার আমাদের দেখা হবে।"

নাগছো সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিব্বতে সংস্কৃতজ্ঞ অনুবাদকদের মধ্যে নাগছো অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদকরূপে স্বীকৃত। অতীশ দীপংকর ছাড়া আরও অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি গ্রন্থ অনুবাদের কাজ করেছেন। তাঁর অনূদিত একশো পঁচিশটি গ্রন্থ তাঞ্জুর সংকলনে স্থান পেয়েছে।

নাগছো দীপংকরের সান্নিধ্যে দীর্ঘতম কাল কাটিয়েছেন সত্য, কিন্তু দীপংকরের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ শিষ্য তিনি হতে পারেন নি; ব্রোমতোন জলবেই জুংনে বা জয়াকর সে স্থান অধিকার করেছেন। একমাত্র ব্রোম তোনপার কাছেই অতীশ নিঃসঙ্কোচে একান্ত বিশ্বাসে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

৩২। তিব্বতের পথে অতীশ

তিব্বতের ঐতিহাসিক সুম্‌পা বলেছেন, "লোহ-মকর বর্ষশেষে উনষাট বৎসর বয়স্ক অতীশ দুই তিব্বতী লোচাবা সহ নেপালে এসে পেঁছালেন। রাজা অনন্তকীর্তির অনুরোধে তিনি এক বৎসর সমথ বিহারে বাস করেন। তারপর জল-অশ্ব-বর্ষে তিনি তিব্বতের ঞারি গুংথাং-এর থোলিং বিহারে এসে পেঁছান।"

ঐতিহাসিক গোই লোচাবা বলেছেন, "প্রভু অতীশ জল-অশ্ব-বর্ষে (অর্থাৎ ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে) জন্ম গ্রহণ করেন; লোহ-মকর-বর্ষ অর্থাৎ ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। প্রভু লোহ-সর্প-বর্ষ (অর্থাৎ ১০৪১ খ্রিস্টাব্দ) নেপালে অতিবাহিত করেন। জল-অশ্ব-বর্ষে (অর্থাৎ ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে) তিনি ঞারি অভিমুখে যাত্রা করেন।"

গোই লোচাবা রচিত সুবিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থটি 'The Blue Annals' নামে রোয়েরিক ইংরেজিতে তর্জমা করেছেন। এই গ্রন্থটির রচনাকাল ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ। গোই লোচাবার বর্ষগণনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর এই গ্রন্থরচনা বর্ষটিকে ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিব্বতের ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কালনির্ণয় করেছেন। এই কাল বিচারের ভিত্তিতে তিনি এই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন, প্রভুর তিব্বতে আগমনের পরে বর্তমান কাল পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—৪৩৫ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে।

ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কিন্তু অতীশ কোন বৎসরে তিব্বত যাত্রা করেন, সে বিষয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। এই পরস্পরবিরোধী মতগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা যাক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, দীপংকর সম্ভবত ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিব্বত গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র দাস একবার বলেছেন, অতীশ ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে গিয়েছিলেন। আবার শরৎচন্দ্র দাসই অন্যত্র বলেছেন, প্রভু ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমশীল বিহার ত্যাগ করে তিব্বত রওনা হয়েছিলেন। সিলভাঁ লেভি বলেছেন, 'পাগসাম জোনসং' গ্রন্থের বিষয়সূচীতে বলা হয়েছে, ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে অতীশ তিব্বতে গিয়েছিলেন। সর্বশেষে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, বিভিন্ন পাণ্ডত পৃথক পৃথক ভাবে অতীশের তিব্বত যাত্রার বৎসর বলে ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১ ও ১০৪২ খ্রিস্টাব্দ নির্দিষ্ট করেছেন।

অতীশের তিব্বতযাত্রার কাল নির্ণয়ে এই বিভ্রান্তির কারণ আছে। সম্ভবত তিব্বতী সূত্রগুলি অনুসরণের সময় যথেষ্ট সতর্কতার অভাবই এই বিভ্রান্তির প্রধান কারণ। এই কালনির্ণয়ের সময় তিব্বতবিদরা মূলত সুম্‌পা রচিত 'পাগসাম জোনসং' গ্রন্থে প্রদত্ত কালনির্ণয়টি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু সর্বত্র তার নির্দেশ মানেন নি। যেমন শরৎচন্দ্র দাস যখন সুম্‌পার 'পাগসাম জোনসং' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন তখন তার ইংরেজি বিষয়সূচিতে বলছেন যে পালবংশের বিখ্যাত নৃপতি নয়পালের রাজত্বকালে আনুমানিক ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে দীপংকর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) তিব্বত

পরিদর্শন করেন। অথচ অন্যত্র তিনি লিখেছেন, প্রভু শ্রীমৎ অতীশ (জোবো পালদন অতীশ) ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে ঞারি-তে পেঁছোলেন। পরবর্তী কালের অধিকাংশ পণ্ডিত এ বিষয়ে মুখ্যত শরৎচন্দ্র দাসকে অনুসরণ করেছেন বলে অতীশের তিব্বতযাত্রার বর্ষটি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে নির্দিষ্ট করেছেন।

এছাড়াও তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিচার করে তিব্বতের ঐতিহাসিকরা অতীশের তিব্বতে আগমনকালকে সুনির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। অতীশের তিব্বতে পদার্পণ তাঁদের কাছে এমনই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে এই কালনির্ণয়েও তাঁরা সুনিশ্চিত হতে চেয়েছেন। কীভাবে তাঁরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন, সংক্ষেপে তার দু-একটি উদাহরণ দেখা যাক।

তিব্বতের মহালোচাবা, সুপণ্ডিত রিনছেন সাংপো ভূমি-অশ্ব-বর্ষে অর্থাৎ ৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর যখন পঁচাশি বৎসর বয়স তখন অতীশ তিব্বতে এসেছিলেন। গোই লোচাবা বলেছেন, রিনছেন সাংপোর পঁচাশি বৎসর বয়সে জল-অশ্ব-বর্ষে অর্থাৎ ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে অতীশ তিব্বতের ঞারিতে এসেছিলেন। ব্রোমতোনপা তিব্বতে অতীশের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন, তিনি অতীশ তিব্বতে আসবার তেইশ বৎসর পরে কাষ্ঠ-মকর-বর্ষে অর্থাৎ ১০৬৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

এইভাবে তিব্বতের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তির জন্ম মৃত্যুকালের সঙ্গে তুলনা করে গোই লোচাবা প্রমুখ তিব্বতের ঐতিহাসিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন :

দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে ভারত থেকে তিব্বত যাত্রা করেন,

১০৪১ খ্রিস্টাব্দ তিনি নেপালে কাটান, ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তিব্বতের ঞারিতে পেঁছান।

শরৎচন্দ্র দাস 'অতীশের জীবনী' অনুবাদে অতীশের তিব্বত যাত্রার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। নাগছো ছুর্লঠিম জলবা অতীশের তিব্বত যাত্রার সঙ্গী ছিলেন, শুধু তাই নয় অতীশের তিব্বতী শিষ্যদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশিদিন অতীশের সঙ্গে কাটিয়েছেন। ফাগ সোরপা-র অনুরোধে এই গ্রন্থে তিনি অতীশের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণা করেছেন। বর্ণনাটি ব্যক্তিগত হলেও তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে নাগছো ছুর্লঠিম জলবার মাধ্যমে তিব্বত রাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার পরেও অতীশ তাঁর তিব্বত যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন কিছুটা গোপন রাখলেন, তাঁর হয়ত ভয় ছিল বিক্রমশীলের স্থবির এতে আপত্তি করবেন।

চার্লস বেল অবশ্য অতীশের তিব্বত যাত্রার কদর্থই করেছেন। তাঁর মতে, মুসলমান আক্রমণকারীরা তখন ভারতের সমতল ভাগ দখল করেছে, হিন্দু ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে, এই দুর্দিনে যে পণ্ডিতরা ভারত থেকে পালিয়ে গিয়ে তিব্বতে জড় হয়েছিলেন, অতীশ তাদের অন্যতম। চার্লস বেল-এর এই বক্তব্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি এবারে তাহলে বিচার করা যাক।

অতীশের তিব্বত যাত্রার সময়ে ভারতে মুসলমান আক্রমণ শুরু হয়েছে, সন্দেহ

নেই। শরৎচন্দ্র দাসের অনূদিত গ্রন্থ 'অতীশের জীবনী'তে বলা হয়েছে, অতীশের তিব্বতযাত্রার অনুমতি দেবার সময়ে বিক্রমশীলের স্থবির জয়শীল (নাগছো লোচাবা)-কে বলছেন, "ভারতের সর্বনাশ আসন্ন। তুরস্কদের আক্রমণে আমি খুবই বিচলিত বোধ করছি। অতীশকে নিয়ে তুমি ও তোমার সঙ্গীরা তোমার স্বদেশে যাত্রা কর ও সেখানে সর্বজীবের কল্যাণ সাধন কর, এই কামনা করি।"

কিন্তু তথ্য সন্ধান করলে দেখা যাবে, সেই সময়ে ভারতবর্ষে মুসলিম আক্রমণ শুরু হলেও, পূর্বভারত তখনও নিরাপদ ছিল। মহম্মদ গজনীর আক্রমণ ও সোমনাথ মন্দির ধ্বংস হয়েছিল ১০২৪।২৫ খ্রিস্টাব্দে, অতীশ তখন ভারতে ছিলেন না, তিনি তখন সুবর্ণদ্বীপে আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে অধ্যয়ন করছেন। আর অতীশ ভারত ছেড়ে চলে যাবার দেড়শো বছর পরে মুহম্মদ বখতিয়ারের পূর্বভারত আক্রমণ ও বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করার ঘটনাগুলি ঘটেছে। তাই ইতিহাসের দিক থেকে বাস্তবিকই এমন কোনো কারণ ঘটেনি, যার জন্য অতীশ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবেন। তিব্বত পরিভ্রমণ করে তিন বৎসর বাদে অতীশের ভারতে ফিরে আসবার কথা ছিল। বিক্রমশীল বিহারের স্থবির জয়শীলকে বলেছিলেন, "তিন বৎসরের জন্য তোমরা অতীশকে পাবে, তারপরে অবশ্যই তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।" সেই নির্দেশ অনুসারে অতীশকে ভারতে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে জয়শীল, ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে অতীশকে নিয়ে ভারত নেপাল সীমান্তে চিরোং পর্যন্ত আসেন। তা সত্ত্বেও অতীশ কেন ভারতে ফিরতে পারলেন না, তার কারণ স্বতন্ত্র। তাই মুসলমানদের ভয়ে অতীশ দেশ ছেড়ে তিব্বতে পালিয়ে গেলেন, চার্লস বেল-এর এই মন্তব্যের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

তবে অতীশের উনষাট বৎসর বয়সে দেশ ছেড়ে বিপদসংকুল পথে তিব্বত যাবার প্রকৃত কারণ কী হতে পারে? তিব্বতী সূত্র থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। বুতোনের ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও শরৎচন্দ্র দাসের সংগৃহীত তথ্যে কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ অবশ্য আছে, কিন্তু সেখানে অতীশ কেন তিব্বত ভ্রমণে সম্মত হয়েছিলেন, তার কারণও বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তিব্বতের মানুষের প্রতি গভীর করুণা, সে দেশে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতনের বিচিত্র কাহিনী, সে সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের নামে যে বিকৃত মতবাদের প্রচার চলছিল তার প্রতি বিতৃষ্ণা ও সর্বোপরি রাজভিক্ষু এশেওদ-এর সদ্ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও তাঁর আত্মদানের ঘটনায় মর্মবেদনা—প্রধানত এই কারণগুলিই দীপংকরকে তিব্বত যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

দীপংকর জানতেন বৃদ্ধ বয়সে অজ্ঞাত দেশের দুর্গমপথে এই যাত্রার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে, এমন কি তাঁর জীবনহানিও ঘটতে পারে। এই যাত্রার ফলে তাঁর আয়ু কুড়ি বছর কমে যাবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, শরৎচন্দ্র দাস প্রমুখ তিব্বতবিদ পণ্ডিতরা অতীশের তিব্বত যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, বিক্রমশীল বিহার থেকে দীপংকর প্রথম

বুদ্ধগয়ায় গেলেন: ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার আগে গৌতমবুদ্ধ যেখানে বোধিলাভ করেছিলেন সেই বুদ্ধগয়া ও অন্যান্য বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি একবার তিনি দর্শন করতে চেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র দাস তিব্বত যাত্রাপথে অতীশের সঙ্গীদের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পণ্ডিত ভূমিগর্ভ, নাগছো, জ্যাতোন, ভূমিসংঘ, বীর্যচন্দ্র প্রমুখের একটি বড় দল নিয়ে অতীশ মিত্রবিহার অভিমুখে চললেন। জ্যাতোনের সঙ্গে দুজন, নাগছো-র সঙ্গে ছ জন এবং অতীশের সঙ্গে কুড়ি জন অনুচর ছিলেন; মিত্রবিহারের ভিক্ষুদল অতীশকে সানন্দে ও শ্রদ্ধায় সম্বর্ধনা জানালেন। এই বিহার থেকে অতীশ সদলে তিব্বতের পথে যাত্রা করলেন।

এই সঙ্গীদলে অতীশের ভারতীয় সহযাত্রীদের মধ্যে পণ্ডিত ভূমিগর্ভ সম্পর্কে গোই লোচাবা বলেছেন, অতীশের পাঁচজন প্রধান শিষ্যের তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই বজ্রপাণি ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নিয়েছিলেন, এবং নেপাল ও তিব্বতে মহামুদ্রা তন্ত্র প্রচার করেছিলেন।

এখানে ভূমিসংঘ সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাজভিক্ষু মহারাজা ভূমিসংঘ অতীশের প্রধান শিষ্য ছিলেন। রাজা হিসাবে তিনি কত বড় ছিলেন বা তাঁর রাজ্য কত বড় ছিল, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না; তবে তাঁকে পশ্চিম ভারতের রাজা বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে তাঁর সম্মানেই নেপালরাজ, মাফাম বা মানসসরোবর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এক বিরাট রক্ষীদল পাঠিয়েছিলেন।

পণ্ডিত পরহিতভদ্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

দীপংকরের ভারতীয় সঙ্গীদলের মধ্যে বীর্যচন্দ্রের নামটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাগছো লোচাবার স্তোত্র ও গোই লোচাবা শোননু পালের গ্রন্থ থেকে জানা যায় সে বীর্যচন্দ্র অতীশ দীপংকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্রীগর্ভ, ভিক্ষুদীক্ষান্তে নাম হয় বীর্যচন্দ্র। মধ্যম ভ্রাতা চন্দ্রগর্ভ বা দীপংকর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। এর পরে বীর্যচন্দ্র সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

'অতীশের জীবনী'তে বলা হয়েছে, অতীশ নেপালের রাজাকে একটি হস্তী উপহার দেন। উপহার দেবার সময়ে অতীশ নেপালরাজকে এই নির্দেশ দেন যেন হস্তীটিকে যুদ্ধের কোন কাজে ব্যবহার না করা হয়। হস্তীটি কেবলমাত্র পূজার উপকরণ, পবিত্র বস্তু, মূর্তি ইত্যাদি বহন করবে। এই কাহিনী থেকে মনে হয় অতীশ ভারত থেকে নেপাল পর্যন্ত হাতির পিঠে যান, তারপর নেপাল থেকে তিব্বতে গ্রারির দুর্গম পথে হাতিটিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

অতীশ কোন্ পথে নেপালে গিয়েছিলেন, 'অতীশের জীবনী' থেকে তার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয় অতীশ বিক্রমশীল বিহার থেকে বুদ্ধগয়া হয়ে নেপালের স্বয়ম্ভুচৈত্য অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। আধুনিক গয়া শহরের ছয় মাইলের মধ্যে বুদ্ধগয়া এবং বর্তমান কাটমাণ্ডুর দুই মাইলের মধ্যে স্বয়ম্ভুচৈত্যের

অবস্থান। ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীরা চম্পারণের মধ্যে দিয়ে পাটনা-কাটমাণ্ডু যে সড়কটি ব্যবহার করেন, সম্ভবত অতীশ সেই পথেই নেপালে গিয়েছিলেন।

অতীশের এই যাত্রাপথের বিচিত্র বিবরণ অতীশের জীবনীকার দিয়েছেন। ভারতের সীমান্তে ছোটো একটি বিহারে অতীশের সাদর সম্বর্ধনা, পথের বিঘ্নবিপদ, তীর্থিকদের ষড়যন্ত্র, দস্যুদলের আক্রমণ ইত্যাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে অতীশের অসাধারণ নৈতিক শক্তির অলৌকিক কাহিনী প্রচার করা হয়েছে।

অবশেষে সঙ্গীদলসহ অতীশ স্বয়ম্ভুচৈত্যে এসে পৌঁছলেন। স্থানীয় রাজা তাঁদের বিপুল সম্বর্ধনা জানালেন। কাটমাণ্ডুর নিকটবর্তী এই চৈত্য থেকে অতীশ পালপার পথে চললেন। এই সময়েই তাঁর প্রথম তিব্বতীয় শিষ্য ও যাত্রাসঙ্গী জাতোন চোনড়ুই সেংগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল। এই মেধাবী ও প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুতে অতীশ বিশেষভাবে বিচলিত হলেন।

এই বিশ্বস্ত শিষ্য ও দোভাষীর মৃত্যু ছাড়াও আরও তিনটি কারণে অতীশের বৎসরকাল নেপালবাস স্মরণীয় হয়ে আছে :

১) নেপাল থেকে মগধরাজ নয়পালকে লিখিত 'বিমলরত্নলেখনাম' পত্র প্রেরণ ;

২) 'চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ' রচনা ;

এবং

৩) নেপালরাজ অনন্তকীর্তি কর্তৃক অতীশের অভ্যর্থনা ও অতীশের প্রেরণায় থম বিহার নির্মাণ।

'বিমলরত্নলেখনাম' এই পত্রটি তিব্বতী তর্জমায় তাঞ্জুরে সংরক্ষিত হয়েছে। রচনাটির প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, মগধজাত নর্যপাল (নয়পাল) ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছেন, ধর্ম অনুসারে রাজ্যশাসন করেছেন, তাঁর সমৃদ্ধি হোক।" গ্রন্থশেষে পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, "স্থবির মহাপণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান কর্তৃক রাজা নীরপালের নিকট লিখিত 'বিমলরত্নলেখনাম' পত্রটি এখানেই সমাপ্ত হল।"

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এই পত্রটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পত্রটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে কেউই বিশেষ কিছু বলেন নি। পত্রটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, এখানে অতীশ যে দেশ ছেড়ে তিব্বতে চলেছেন, এ কথা কোথাও উল্লেখ করেন নি। ভারতের কোনো বিষয় বা বস্তু, বিক্রমশীল বিহার বা অন্য কোনো ব্যক্তি এমন কি নয়পাল সম্পর্কেও কোনো জিজ্ঞাসা এই পত্রে নেই। পত্রটি সম্পূর্ণভাবে উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও ধর্মীয় উপদেশমালার সংকলনমাত্র। ষাটবৎসর বয়স্ক বৌদ্ধ আচার্য তাঁর একান্ত প্রিয় তরুণ শিষ্যের উদ্দেশ্যে তাঁর আন্তরিক শুভ কামনা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। কিন্তু পত্রটি তাঁর দীর্ঘ যাত্রাপথে ভারতের কোনো স্থান থেকে নয়, তিব্বতে পৌঁছে নয়, নেপাল থেকে পাঠাবার তাৎপর্য কী? তিব্বতী সূত্র থেকে এই বিশেষ কারণটির সন্ধান পাওয়া যায়। সুম্পা বলেছেন, "জোবো (অতীশ) যখন তিব্বত যাত্রা করলেন ঠিক তখনই ভেয়পালের পুত্র নেয়পাল (নয়পাল) রাজা হলেন।" এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক তারনাথও প্রায় একই কথা বলেছেন। তারনাথ

বলছেন, "রাজা ভেয়পালের পুত্র নেয়পাল। জোবোজে যখন তিব্বত যাত্রা করছেন, সেই সময়ই তিনি রাজা হলেন। নির্ভরযোগ্য জীবনীগুলিতেও এ কথা বলা হয়েছে। নেপাল থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত পত্রটিও দেখা যায়।"

কোনো কোনো গবেষক 'বিমলরত্নলেখনাম' পত্র ও উপরে উল্লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ১০৪১ খ্রিস্টাব্দকে নয়পালের রাজ্যাভিষেকের বৎসর বলে নির্দিষ্ট করতে চান।

নেপালের পালপার কাছে হোলকা নামে এক জায়গায় অতীশের বন্ধু এক বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করতেন, তিনি বধির ছিলেন। গুহ্যমন্ত্রের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। অতীশ এখানে একমাস বাস করেন এবং এই বধির ভিক্ষুর আগ্রহেই 'চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ' রচনা করেন। নাগছো লোচাবা ছুলঠিম জলবা বা জয়শীল অতীশের সাহায্যে রচনাটি তিব্বতীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদটি তাঞ্জুরে রক্ষিত আছে।

তিব্বতী তর্জমায় একুশটি চরণে সমাপ্ত এই রচনাটির প্রথমেই অতীশ বলছেন, "নেপালে আমার বন্ধুর অনুরোধে আমি এই রচনা করছি। হে স্থবির, গুহ্যমন্ত্রে তোমার শ্রদ্ধা নেই, তাই তুমি এইভাবে (ধর্মপালন) কর।"

গুহ্যমন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে অতীশের ঠিক কী মনোভাব ছিল, এই রচনাটিতে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি বলেছেন, "গুহ্যমন্ত্রের উল্লেখ আমি এখানে করব না, প্রজ্ঞাপারমিতার যে চর্যা সেই বোধিসত্ত্বচর্যাই আমি আলোচনা করব। প্রথমে চিত্তোৎপাদের জন্য এবং তারপরে বোধিসত্ত্ব সম্বরের জন্য সচেষ্ট হও।"

"সংক্ষেপে মৈত্রেয়নাথের উপদেশ অনুসারে দশচর্যা পালন কর। তোমার যদি ধন থাকে, তবে তা সংঘকে দাও, বালভোজনে ব্যয় কর বা সহায়হীন দুঃস্থদের দান কর।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দীপংকরের ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে নানা প্রশ্ন আছে। তিনি কি তন্ত্রযানী ছিলেন? বিশুদ্ধ মহাযানে তাঁর নিষ্ঠা কতটা ছিল? 'চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ' ও তাঁর আরও কয়েকটি রচনা আলোচনা করলে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে। দীপংকরের সময়ে ভারতে বিশুদ্ধ মহাযান ধর্মমত বলতে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। মন্ত্রযান, তন্ত্রযান, বজ্রযান ইত্যাদি তাকে প্রায় গ্রাস করেছিল। বিশুদ্ধ মহাযানী হয়েও দীপংকর পরিবেশের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। তবুও তন্ত্রমন্ত্রের মধ্য দিয়ে তিনি শাস্ত্রীয় মহাযান মতাদর্শকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 'চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ', চর্যাগীতি', 'বোধিপথপ্রদীপ' প্রভৃতি রচনায় গুহ্য তন্ত্রমন্ত্র যে বৌদ্ধদীক্ষার অঙ্গ নয়, একথা বারবার বলেছেন। দীপংকরের ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে অবশ্য আমরা পরে আলোচনা করব।

অতীশের নেপাল বাসকালের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, নেপালে থম বিহার প্রতিষ্ঠা। নেপালরাজ অনন্তকীর্তি অতীশের অনুরোধে এই বিহারটি নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র চন্দ্রপ্রভকেও বৌদ্ধদীক্ষা ও অতীশের শিষ্যত্ব গ্রহণের

অনুমতি দেন। রাজপুত্র চন্দ্রপ্রভ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন ও সদ্ধর্মপ্রচারে উদ্যোগ নেন।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। সেই সময়ে নেপালের রাজার নাম যে অনন্তকীর্তি ছিল, নেপালের ইতিহাসে তার কোনো উল্লেখ নেই। অতীশ যে নেপাল হয়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন, এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে কোনো আধুনিক গবেষক সংশয় প্রকাশ করেছেন। নেপালরাজের প্রকৃত নাম নিয়ে বিভ্রান্তি থাকতে পারে, তবে অতীশের রচনা 'বিমলরত্নলেখ' ও 'চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ' এই দুটি গ্রন্থ থেকে অতীশ যে নেপালে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন, তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। থম বিহারও অতীশের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অতীশের নেপালবাসের প্রায় দুশো বছর পরে তিব্বতী বৌদ্ধভিক্ষু ছাগ ছোইজেপাল নেপালের থম বিহার দর্শন করেছিলেন। এই বিহারটি যে অতীশের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত, সে কথা তিনি তাঁর ভ্রমণবিবরণে উল্লেখ করেছেন। অতীশের শিষ্য ও নেপালযাত্রার সঙ্গী জা লোচাবা চোনড়ুই সেংগে বা বীর্যসিংহের নেপালে অকালমৃত্যু হয়; তিব্বতে অতীশের প্রধান শিষ্য ব্রোম তোনপা জলবেই জুংনে বা জয়াকর এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। ভারত থেকে তিব্বতযাত্রা পথে অতীশ যে নেপালে এক বৎসর বাস করেছিলেন, এই বিবরণটি তাই সম্পূর্ণ কাল্পনিক হতে পারে না।

অতীশ কোন্ পথে তিব্বতে গিয়েছিলেন, আধুনিক গবেষকদের কাছে এই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনের তাগিদে, প্রধানত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের কাজে দেশ থেকে দেশান্তরে যাতায়াতের পথ মানুষের সমাজে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। বহু শতক ধরে মানুষ সেই একই পথ ব্যবহার করে। দুর্গম, পার্বত্য দেশ তিব্বত যাত্রায় অতীশ সম্ভবত এই চিরাচরিত রীতিই অনুসরণ করেছেন। ভারত ও তিব্বত, এই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতে তীর্থযাত্রী ও বণিকরা যে পথ গ্রহণ করতেন, সেই পথটি চিহ্নিত করতে পারলেই আমরা হাজার বছর আগে অতীশের যাত্রাপথ অনুমান করতে পারি।

'অতীশের জীবনী' অনুবাদে শরৎচন্দ্র দাস দীপংকরের তিব্বতযাত্রার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। নেপালের পালপা থেকে যাত্রা করে দলটি তিব্বতে প্রবেশ করল। প্রথমে তাঁরা মাংয়ুল গুংথাং-এ পেঁছোলেন। জ্বোনা ছেনপো পেঁছোলে নাগছো অতীশকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন। অতীশ এখানে এক মাস বাস করলেন। তারপর পুরাং হয়ে তাঁরা মাফাম হ্রদ বা মানসসরোবরের তীরে এলেন। সেখানে ডোক মামোলিন নামে রমণীয় ও পবিত্র স্থানটি অতীশের খুব পছন্দ হল। তিনি এখানে সাতদিন থাকলেন। অতীশ যে মাফাম হ্রদের তীরে এসে পেঁছেছেন এ খবর ঙারি কোরসুম-এর তিনটি প্রদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, ক্রমে এই দলটি থোলিং-এর স্বর্ণমন্দিরে এলেন।

ভারতের আলমোরা, সিমলা, যোশীমঠ, বদ্রিনাথ ইত্যাদি থেকে মানসসরোবর তীর্থে

যাবার বেশ কয়েকটি পথ আছে। কিন্তু এইসব অঞ্চল থেকে নয়, অতীশ বিক্রমশীল বিহার থেকে নেপাল হয়ে মানসসরোবর ও তারপরে তিব্বতের ঙারি-র থোলিং বিহারে পেঁছিছিলেন।

স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর গ্রন্থে নেপালের কাটমাণ্ডু থেকে মুক্তিনাথ, খোচরনাথ ও টাকলাকোট হয়ে মানসসরোবর যাত্রার একটি পথের কথা বলেছেন। এই পথ ধরেই যে অতীশ তিব্বতে গিয়েছিলেন, পথের দুধারে অতীশের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি আজও তার সাক্ষী দিচ্ছে। তিব্বতীরা বলেন, খোচরনাথের বিখ্যাত গুম্ফা বা বিহারে অতীশ একবার বর্ষাবাস করেন। মানসসরোবর যাত্রার পথে এই বিহারটি পড়ে। এই পথের পাশে একটি গ্রামের নাম গেজিন বা পুণ্যদত্ত; অতীশের পবিত্র কাজে উৎসর্গীকৃত এই গ্রাম। এই গ্রামের কাছেই একটি জায়গার নাম কাংজে বা পদচিহ্ন দীপংকরের চরণরেখায় পূত এই পথ। এই অঞ্চলে একটি ঝরণার নাম ডুবছু বা সিদ্ধসলিল। তিব্বতীরা বলেন, দীপংকর এটি খনন করেছিলেন।

মানসসরোবর থেকে তিব্বতে যাবার দুটি প্রাচীন পথ, এদের মধ্যে দীপংকর কোনটি গ্রহণ করেছিলেন, তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে শরৎচন্দ্র দাস তাঁর অনুবাদে এই যাত্রীদলের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন: পঁয়ত্রিশ জন সঙ্গী পরিবৃত হয়ে অতীশ থোলিং-এর পথে চলেছেন। (তাঁর বাহন) অশ্বটি সুবর্ণ হংসের মতো মৃদুমন্দ গতিতে এই মহামুনিকে বহন করে চলেছে। অতীশের বয়স তখন ষাট বৎসর, তবুও তাঁর প্রশান্ত মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব তাঁকে দেবদুর্লভ মহিমামণ্ডিত করেছে। সস্মিতমুখে, উদাত্ত গম্ভীর স্বরে তিনি অনর্গল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন। তাঁর সুমিষ্ট বাচনভঙ্গিতে প্রতি বাক্যের শেষে তিনি বলছেন, "অতি ভাল! অতি ভাল! অতি মঙ্গল! অতি ভাল হএ (হয়)।"

অতীশের শিষ্য ও পথসঙ্গী নাগছো ছুলঠিম জলবা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই বর্ণনাটি দিয়েছেন। ভাষাতত্ত্বের বিচারে দেখা যায়, ভাল বা ভালা—এই শব্দটি একাদশ শতকের বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। অতীশের নিজমুখে উচ্চারিত বাক্যের এই নিদর্শন থেকে তিনি যে বাঙালী ছিলেন এই অনুমানই স্বাভাবিক।

তিব্বত সীমান্তে রাজপ্রতিনিধিরা অতীশকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান। তারপর তাঁরা চীনা ড্রাগনের ছবি আঁকা একটি পাত্রে তিব্বতী প্রথায় প্রস্তুত চা অতীশকে নিবেদন করেন; বলেন, এই স্বর্গীয় পানীয় কল্পদ্রুমের নির্যাস থেকে প্রস্তুত করা হয়। অতীশ এই উচ্চপ্রশংসিত পানীয়টির নাম জানতে চান। লোচাবা ছুলঠিম জলবা বলেন, "গুরুদেব, এর নাম চা। তিব্বতের ভিক্ষুরাও এটি পান করেন।" অতীশ তখন মন্তব্য করেন, "তিব্বতের ভিক্ষুদের উন্নত শীলের গুণেই চায়ের মতো এমন চমৎকার পানীয় প্রস্তুত হয়েছে।" তিব্বতীরা বলেন, প্রথম চা পানের পরে অতীশ চায়ের প্রশস্তিমূলক একটি কবিতাও রচনা করেন।

'অতীশের জীবনী'তে চা কে এত গুরুত্ব দেবার সম্ভবত অন্য কারণ আছে। সম্রাট স্রোংচান গামপো-র পৌত্র চীন থেকে এই পানীয়টি আমদানী করার পরে

তিব্বতে চা জাতীয় পানীয়ের (national beverage)-এর স্থান নেয়। সম্পন্ন তিব্বতীরা দিনে ত্রিশ থেকে সত্তর কাপ চা পান করেন। স্বাভাবিকভাবেই তিব্বতের মানুষ তাঁদের জাতীয় ধর্মগুরু অতীশকেও চায়ের পরম সমজদার রূপে এখানে চিত্রিত করেছেন।

৩৩। তিব্বতে অতীশ

ঐতিহাসিক গোই লোচাবা বলেন, কাদমপাদের বিবরণ এবং জামাপা, নেউসুরপা, চানগুা, পুটোপা প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনীগ্রন্থগুলি খুব ভাল করে বিচার করলে সেই সব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যাবে যে, অতীশ জল-অশ্ব-বর্ষে অর্থাৎ ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে এসেছিলেন। আরও বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এটিই নির্ভুল গণনা। গোই লোচাবা আরও বলেছেন যে অতীশ কাষ্ঠ-অশ্ব-বর্ষের শরৎকালে অর্থাৎ ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে তুষিতে গমন করেন, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ভাবে তিব্বতের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ বিচার করে গোই লোচাবা তুলনামূলক গণনা-পদ্ধতির সাহায্যে অতীশের জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কাল নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী কালের তিব্বত-বিশারদরা ইতিহাসের সঠিক কালনির্ণয়ের ব্যাপারে, তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে গোই লোচাবা শোননু পালকে সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ বলে মেনে নিয়েছেন।

গোই লোচাবা তাঁর বিশিষ্ট বর্ষগণনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে বলেছেন, অতীশ ১০৪২ থেকে ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বতে বাস করেন। এই তেরো বছরের প্রথম তিন বছর তিনি পশ্চিম তিব্বতের ঙারিতে ছিলেন। মনে রাখা দরকার যে পশ্চিম তিব্বতের রাজাদের আগ্রহ ও আমন্ত্রণেই অতীশ তিব্বতে এসেছিলেন। গোই লোচাবা আরও বলেছেন যে এই সময়ে অতীশ সদ্ধর্মের পূজা ও আচার-আচরণের যে বিধিনিয়ম প্রচার করেন, পশ্চিম তিব্বতের প্রায় সকলেই সেগুলি গ্রহণ করেন। এই তিন বৎসরে অনলস কার্যকলাপের দ্বারা তিনি সে দেশে প্রকৃত মহাযান মতবাদের যে ভিত্তি স্থাপন করেন, পরবর্তীকালে তার উপরেই তাঁর সাফল্যের সৌধ গড়ে ওঠে। সে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দীপংকরের বিপুল প্রভাব ক্রমে সমগ্র তিব্বতে প্রসারিত হয়। দীপংকরের জীবনের এই তিন বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল :

১। অতীশের প্রতি পশ্চিম তিব্বতের রাজাদের বিশেষত জনছুবওদ-এর প্রগাঢ় আনুগত্য ও রাজকীয় সম্বর্ধনা,

২। অতীশের কাছে সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রিনছেন সাংপো বা রত্নভদ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার,

৩। দীপংকরের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বোধিপথ প্রদীপ' সহ বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ,

৪। তিব্বতে অতীশের প্রধান শিষ্য ব্রোম তোনপা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ।

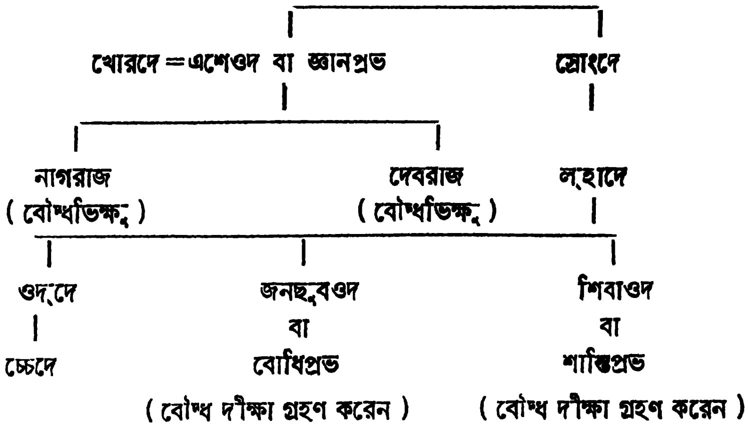
গোই লোচাবা ছাড়াও শরৎচন্দ্র দাস তাঁর 'অতীশের জীবনী' অনুবাদে অতীশের

রাজকীয় সম্বর্ধনার একটি জমকালো চিত্র দিয়েছেন : চারজন সেনাপতি তিনশ জন অশ্বারোহী সৈন্য সহ শ্বেতবস্ত্র পরিহিত অতীশ ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যভাগে রেখে অগ্রসর হলেন। চারজন সেনাপতির মধ্যে যিনি প্রধান তিনি একটি দীর্ঘ প্রশস্তিসহ অতীশকে সম্বর্ধনা জানালেন। তারপর তাঁরা সকলেই অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাইতে লাগলেন। তিনশ বছর আগে ঠিস্রোং দেচান-এর মন্ত্রীরা যেভাবে আচার্য শান্তরক্ষিতকে ভারতের সীমান্ত থেকে তিব্বতে নিয়ে এসেছিলেন, সেই ভাবেই তাঁরা অতীশ দীপংকরকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে চললেন।

কিন্তু তিনশ বছর আগে আচার্য শান্তরক্ষিত যখন তিব্বতে এসেছিলেন, তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তিব্বতের মানুষের তখন প্রায় কোনো ধারণাই ছিল না। তারপর শান্তরক্ষিত ও তাঁর সহযোগীরা সেদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন, আগ্রহী ভক্তদের ভিক্ষুদীক্ষা দিয়েছেন, বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেছেন এবং তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধবিহার সামিয়ে বিহার প্রতিষ্ঠা করেছেন। দীপংকর তিব্বতে আসবার আগে পশ্চিম তিব্বতের রাজারা বিশেষ করে এশেওদ সদ্ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে গভীর অনুরাগ ছাড়াও পশ্চিম তিব্বতের রাজারা শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ অগ্রসর ছিলেন। এঁদেরই উৎসাহে ধর্মপাল, সুভাষিত প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতরা তিব্বতে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, অন্যদিকে রিনছেন সাংপোর মতো বিখ্যাত পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ভারতে প্রেরিত হন। পশ্চিম তিব্বতের রাজাদের মধ্যে এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ এবং জনছুবওদ বা বোধিপ্রভ রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বহস্তে রাজ্যশাসন না করলেও রাজ্যের পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। সদ্ধর্মের প্রতি তাঁদের গভীর আনুগত্য সেদেশের রাজ্য-শাসনকার্যকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

রাজভিক্ষু এশেওদের মনে হয়েছিল, বৌদ্ধধর্মকে সকল কলুষমুক্ত করবার জন্য আরও বিশেষ কিছু করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারত থেকে উপযুক্ত আচার্য আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে জনছুবওদ সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভারত থেকে অন্য কোনো আচার্য নন, বিক্রমশীল বিহারের উপাধ্যায় অতীশ দীপংকরকেই তিনি তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনেন। অষ্টম শতকে যখন শান্তরক্ষিত তিব্বতে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পক্ষে সে দেশের অবস্থা অনুকূল ছিল না, একথা আমরা আগেই বলেছি। দীপংকর যখন তিব্বতে আসেন তখন দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিম তিব্বতের রাজাদের পক্ষে তাই দীপংকরের সম্বর্ধনার জন্য বিপুল আয়োজন করা সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়েছিল।

তিব্বতের ইতিহাস থেকে অতীশ যখন তিব্বতে আসেন সেই সময়ে তিব্বতের —বিশেষ করে পশ্চিম তিব্বতের—রাজবংশ সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়। তখন ওদ্‌দে পশ্চিম তিব্বতের রাজা ছিলেন। তাঁর পিতামহ দেচুগ গোন-এর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র খোরদে বা এশেওদ রাজ্যত্যাগ করে বৌদ্ধভিক্ষু হন এবং স্রোংদে রাজা হন।



এশেওদের মৃত্যুর পরে জনছুবওদ এশেওদের অন্তিম ইচ্ছাকে কার্যকরী করেন। তিব্বতে অতীশকে আমন্ত্রণ করে আনার জন্যে তিনি লোচাবা ছুলঠিম জলবাকে ভারতে পাঠান। অতীশকে নিয়ে ছুলঠিম জলবা যখন তিব্বতের সীমান্তে এসে পেঁছোন তখন জনছুবওদ অতীশের জন্যে রাজকীয় সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। অতীশও তাঁর এই রাজশিষ্যের প্রতি গভীর স্নেহশীল ছিলেন এবং জনছুবওদের অনুরোধে তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'বোধিপথ প্রদীপ' রচনা করেন।

জনছুবওদের পিতা ল্হাদে এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা ওদ্‌দে। পশ্চিম তিব্বতের এই দুজন রাজা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। গোই লোচাবা বলেছেন, ল্হাদে-র সময়ে কাশ্মীরের মহাপণ্ডিত সুভূতি শ্রীশান্তি তিব্বতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। 'অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' ও তার ভাষ্য, 'অভিসময় অলংকার টীকা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ অনুবাদে সুভূতি শ্রীশান্তি তিব্বতী অনুবাদকদের বিশেষ সাহায্য করেন। তাঞ্জুর গ্রন্থাবলী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওদ্‌দে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে ভারতবর্ষ থেকে শূন্যশ্রী প্রমুখ পণ্ডিতদের তিব্বতে আমন্ত্রণ করে আনেন। শূন্যশ্রী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গোই লোচাবা বলেছেন, পণ্ডিত শূন্যশ্রী এবং ঙ্গাং লোচাবা তিব্বতে বুদ্ধজ্ঞানের মতবাদ প্রচার করেছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে ল্হাদের তিন পুত্রের মধ্যে শিবাওদ বা শান্তিপ্রভই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ মতবাদের সকল শাস্ত্রেই তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সুদক্ষ অনুবাদকও ছিলেন। বুতোন বলেছেন, রাজপুত্র শিবাওদ আচার্য শান্তরক্ষিতের 'শ্রীপরমাদি টীকা' নামক গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। আচার্য শান্তরক্ষিতের সুবিশাল গ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহকারিকা'-র পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, মহারাজা ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরের অনুপমপুর বিহারের মহাপণ্ডিত গুণাকর শ্রীভদ্র ও মহা লোচাবা শাক্যভিক্ষু শিবাওদ এই গ্রন্থটি

অনুবাদ করেন। তাঞ্জুর গ্রন্থতালিকায় কয়েকটি দুরূহ গ্রন্থের একক অনুবাদকরূপে শিবাওদ-এর নাম আমরা পাই, এই গ্রন্থগুলির তিব্বতী অনুবাদের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ওদদে-র পরে তাঁর পুত্র চেচেদে রাজা হন। তিনিও বৌদ্ধধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। তাঞ্জুরের গ্রন্থাবলী থেকে চেচেদে-র ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। দুই পিতৃব্য বৌদ্ধভিক্ষু জনছুবওদ এবং শিবাওদ-এর সঙ্গে একত্রে চেচেদে কয়েকটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। ধর্মকীর্তি রচিত 'বাদন্যায় প্রকরণ' গ্রন্থটির পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, শ্রীভট্টারক শিবাওদ এবং ওদদে-র পুত্র শ্রীদেবরাজ মঙ্গলময় প্রভু চেচেদের অনুরোধে ভারতীয় মহা উপাধ্যায় জ্ঞানশ্রীভদ্র ও লোচাবা ভিক্ষু শুভমতি গ্রন্থটি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। জনছুবওদ, শিবাওদ এবং চেচেদের সমবেত উদ্যোগে মহাচার্য প্রজ্ঞাকরগুপ্তের 'প্রমাণবার্তিক অলংকার টীকা নাম' গ্রন্থটিও অনুবাদ করা হয়। ভারতীয়, তিব্বতী ও চীনা পণ্ডিতদের অনেকে মিলে গ্রন্থটি সংশোধনের কাজ করেন। জনছুবওদ, শিবাওদ এবং রাজা চেচেদে-র অনুরোধে দীপংকর শ্রীজ্ঞান লোচাবা জনছুব শেরব বা বোধিপ্রজ্ঞের সাহায্যে জয় বা জিন রচিত 'প্রমাণ বার্তিক অলংকার টীকা নাম' গ্রন্থটি তিব্বতীতে অনুবাদ করেন।

পশ্চিম তিব্বতের রাজাদের এই গভীর ধর্মানুরাগের আকর্ষণেই দীপংকর শেষ পর্যন্ত তিব্বতে আসতে সম্মত হন। তিব্বতের এই অনুকূল পরিবেশে সে দেশে পেঁছাবার কিছুদিনের মধ্যেই অতীশ তাঁর ধর্মসংস্কারের কাজে বিপুল সাফল্য লাভ করেন। অবশ্য তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তাঁর উদার ও বলিষ্ঠ ভূমিকা—তাঁর সাফল্যের মূলে এই কারণগুলিও ছিল।

রাজা চেচেদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল, অতীশ দীপংকরের মৃত্যুর পরে ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে মহাধর্ম সম্মেলন আহ্বান। এই অনুষ্ঠানটি তিব্বতের ইতিহাসে অগ্নি-মকর-বর্ষের সম্মেলন নামে বিখ্যাত। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবনে এই সম্মেলনটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

অতীশ প্রথম তিনবছর পশ্চিম তিব্বতেই তাঁর কাজ শুরু করেন। কয়েক বছর পরে তিনি সমগ্র তিব্বত, বিশেষ করে মধ্য তিব্বত পরিভ্রমণ করেন। অতীশের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিব্বতের সামন্ত শাসকবর্গও সমগ্র দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিম তিব্বতের সীমানা ছাড়িয়ে বৌদ্ধধর্ম এক সর্বতিব্বতীয় রূপ নেয়। ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দের ধর্মসম্মেলন তারই পরিণত রূপ। এই সম্মেলনে তিব্বতের প্রায় সব অঞ্চল থেকে—উই, চাং খাম ইত্যাদি অঞ্চল থেকে—মহা ত্রিপিটকধররা এসে যোগ দেন।

অতীশের প্রথম তিনবছর তিব্বতবাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রিনছেন সাংপো বা রত্নভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। লাংদারমার অত্যাচারের পরের দুশো বছরে তিব্বতে বৌদ্ধপণ্ডিত বলতে রিনছেন সাংপো বা রত্নভদ্রই ছিলেন প্রধান। রিনছেন

সাংপো সম্বন্ধে গোই লোচাবা বলেছেন, ভূমি-অশ্ব-বর্ষে অর্থাৎ ৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রিনছেন সাংপো জন্মগ্রহণ করেন। উপাধ্যায় এশেসাংপো বা জ্ঞানভদ্র তের বৎসর বয়সে তাঁকে বৌদ্ধদীক্ষা দেন। তরুণ বয়সে তিনি কাশ্মীরে যান, সেখানে মন্ত্রযানের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করে তিনি সূত্র ও মন্ত্রের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন, প্রজ্ঞাপারমিতা ও তন্ত্রসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করেন। মোট পঁচাত্তর জন পণ্ডিতের কাছে তিনি ধর্মশিক্ষা লাভ করেন। মহারাজা লহাদে তাঁকে বজ্রাচার্য উপাধি দেন এবং প্রধান রাজপুরোহিত করেন। রাজা তাঁকে পুরাং-এ প্রচুর ভূসম্পত্তি দক্ষিণা দেন। তিনি ঠাচা, রোং ও অন্যান্য অঞ্চলে বহু মন্দির ও স্তূপ নির্মাণ করেন। তাঁর বহু শিষ্য ছিলেন, পণ্ডিত বলে এঁরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর এই শিষ্যদের মধ্যে দশজনের বেশি শিষ্য অত্যন্ত দক্ষ অনুবাদক ছিলেন, অনুবাদ ও সংশোধনের কাজে তাঁরা পারদর্শী ছিলেন।

পশ্চিম তিব্বতের বিভিন্ন কাহিনী ও ইতিহাসে রিনছেন সাংপো বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছেন। পশ্চিম তিব্বতের পু অঞ্চলে যে বৌদ্ধমন্দিরগুলি আছে, তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে পুরোনো, রাজা এশেওদের ধর্মগুরু রিনছেন সাংপো সেই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন বলা হয়।

অতীশের পরবর্তী সময়ে চোংখাপা তিব্বতের বিখ্যাত ধর্মগুরু বলে গণ্য হয়েছেন। চোংখাপা-র সময়ের একটি শিলালিপিতে চোংখাপা-র নামের সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী সময়ের রাজভিক্ষু জনছুবওদ এবং রিনছেন সাংপোর নাম পাওয়া যায়। আর একটি শিলালিপিতে তিব্বতের তাবো বিহার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে জনছুবওদ, রিনছেন সাংপো এবং অতীশের নাম আছে।

রিনছেন সাংপোর তন্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর প্রভাবেই আগের সময়ের চেয়ে পরে তিব্বতে তন্ত্রের প্রভাব খুবই বেড়ে গিয়েছিল। এশেওদ এই তন্ত্র-মন্ত্র চর্চার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তার ফলে রিনছেন সাংপো অনুসৃত এই তন্ত্র সংঅংগ সরমা বা নব্যতন্ত্র নামে খ্যাত হয়েছিল। অতীশ যখন তিব্বতে আসেন, তখন সে দেশে তন্ত্রশাস্ত্রে রিনছেন সাংপোর চেয়ে বড় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। অতীশ যখন ঞারি-তে এসে পেঁছিলেন, তখন পঁচাশি বৎসর বয়স্ক এই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ অনুবাদকের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হল। বয়সে অতীশ তাঁর থেকে চব্বিশ বছরের ছোটো ছিলেন।

প্রথম দর্শনেই অতীশ রিনছেন সাংপোর শাস্ত্রজ্ঞানের অহমিকা কীভাবে চূর্ণ করেছিলেন, গোই লোচাবা তার বর্ণনা দিয়েছেন :

লোচাবা রিনছেন সাংপো ভাবলেন, 'আমার চেয়ে বড় পণ্ডিত ইনি কখনই নন। তবে রাজভিক্ষু এশেওদ যখন এঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন তখন এঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা যাক।' এই ভেবে তিনি অতীশকে থোলিং বিহারে তাঁর বাসস্থানে নিমন্ত্রণ করলেন। থোলিং বিহারে তান্ত্রিক দেব-দেবীর অনেকগুলি মূর্তি ছিল। এই মূর্তিগুলি দর্শন করে প্রভু (অতীশ) তন্ত্রে বর্ণিত স্থান অনুসারে তাঁদের

প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে এক একটি পৃথক পৃথক স্তোত্র উচ্চারণ করলেন। প্রভু আসন গ্রহণ করবার পরে লোচাবা রিনছেন সাংপো জিজ্ঞাসা করলেন, "এই স্তোত্রগুলি কে রচনা করেছেন?" উত্তরে প্রভু বলেছেন, "এইগুলি এখনই আমি রচনা করলাম।" শুনে লোচাবার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হল।

তারপর প্রভু অতীশ কোন্ শাস্ত্রে রিনছেন সাংপোর কতটা পাণ্ডিত্য তা জানতে চাইলেন। রিনছেন সাংপো সংক্ষেপে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের বিবরণ দিলেন। শুনে প্রভু বললেন, "আপনার মত ব্যক্তি যখন আছেন তখন আমার তিব্বতে আসার কোনো অর্থই হয় না।" এই কথা বলে প্রভু ভক্তিভরে দুহাত জোড় করলেন। প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "হে লোচাবা, একজন ব্যক্তি কীভাবে সবগুলি তন্ত্র একাসনে বসে একই সঙ্গে সাধনা করতে পারে, দয়া করে বলুন।" লোচাবা বললেন, "একসঙ্গে নয়, তাকে প্রত্যেকটি তন্ত্র পৃথক পৃথক করে সাধনা করতে হবে।"

প্রভু তখন সজোরে বললেন, "অপদার্থ লোচাবা! আপনি কোনো কাজের নন! এখন বুঝতে পারছি কেন আমার তিব্বতে আসার দরকার ছিল। সমস্ত তন্ত্রগুলি একই সঙ্গে সাধনা করা যায় ও করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন করে নয়।" প্রভু তারপরে তাঁর কাছে তন্ত্র ব্যাখ্যা করলেন। লোচাবা প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে ভাবলেন, "মহা মহা পণ্ডিতদের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

তিব্বতে অতীশ শুধুমাত্র তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের ভুলত্রুটি নির্দেশ করে রিনছেন সাংপোর মত তন্ত্রশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতের দর্পচূর্ণ করেছিলেন—এত সামান্য কারণে রিনছেন সাংপো নতিস্বীকার করেছিলেন, এ ব্যাখ্যা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। মনে হয় কেবল তন্ত্রচর্চার সঠিক পদ্ধতি প্রদর্শনের জন্য নয়, সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রে অতীশের অবিসংবাদী পাণ্ডিত্যে নিঃসন্দেহ হয়েই রিনছেন সাংপো নতমস্তকে অতীশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রিনছেন সাংপো বহু পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রভু অতীশই তাঁকে ধ্যানাভ্যাসে প্রবৃত্ত করান। প্রভু বলেছিলেন, 'হে মহালোচাবা, এই প্রপঞ্চময় সংসারে ভবযন্ত্রণা দুঃসহ। তাই ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব প্রাণীহিতের জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এখন দয়া করে ধ্যানাভ্যাস করুন।" রিনছেন সাংপো গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করেন। প্রভু ঙারি থেকে প্রস্থান করার পরে রিনছেন সাংপো দশ বৎসর ধরে একাগ্র সাধনা করলেন।

অন্যত্র গোই লোচাবা এই কাহিনী আবার দিয়েছেন: "রিনছেন সাংপোকে অতীশ সাধন প্রণালী শিক্ষা দিলেন। রিনছেন সাংপো তাঁর সাধনকক্ষের বাইরের তিন দিকের দরজার গায়ে লিখলেন, যদি বিষয়-সম্পত্তি বা স্বার্থপর কোনো চিন্তা ক্ষণেকের জন্যও আমার মনে উদিত হয়, তবে যেন ধর্মরক্ষকরা আমার মস্তক চূর্ণ করেন।"

ফ্রাংকে পশ্চিম তিব্বতের একটি শিলালিপিতে এই উদ্ধৃতি দেখেছিলেন যে রিনছেন সাংপো 'অতীশের করুণায় জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে' প্রতিভাত হন। অর্থাৎ পাণ্ডিত্যের দিক থেকেও রিনছেন সাংপো সর্বতোভাবে অতীশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার

করেছিলেন। তার আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। রিনছেন সাংপো বহু সংস্কৃত গ্রন্থের দক্ষ অনুবাদক বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'অষ্টসাহস্রিকা,' 'বিংশতি আলোক প্রজ্ঞাপারমিতা', 'মহাভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ তিনি অতীশ তিব্বতে আসবার আগেই করেছিলেন। কিন্তু অতীশের আনুগত্য স্বীকার করবার পরে রিনছেন সাংপো তাঁর প্রতিটি গ্রন্থের অনুবাদ সংশোধন করে দেবার জন্য প্রভুকে অনুরোধ জানান। দীপংকর এইগুলি সংশোধন করেছিলেন। এর পরে রিনছেন সাংপো দীপংকরের কাছে বসে আরও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

দীপংকরে প্রথম তিন বৎসর তিব্বত বাসের মধ্যে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁর 'বোধিপথপ্রদীপনাম' গ্রন্থটি রচনা। এই গ্রন্থটি দীপংকরের মহৎ জীবনের মর্মবাণী রূপে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক অসামান্য অবদান বলে গণ্য হয়েছে।

তিব্বতে তখন বৌদ্ধধর্মের নামে যে মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল, সেই ভ্রান্ত ধ্যানধারণা সংস্কারের জন্যই পশ্চিম তিব্বতের রাজারা অতীশকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তিব্বতের পণ্ডিতদের মধ্যেও সদ্ধর্ম সম্পর্কে ঘোরতর মত-বিরোধ ছিল। সেই সব ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার জন্যই জনছুবওদ অতীশের উপদেশ প্রার্থনা করেন। গ্রন্থটির প্রারম্ভে বলা হয়েছে, শাংশুং গুগের থোলিং বিহারে জনছুবওদের সনির্বন্ধ অনুরোধে দীপংকর শ্রীজ্ঞান গ্রন্থটি রচনা করেন। দীপংকর যে প্রকৃত মহাযান ধর্মমত তিব্বতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, এই গ্রন্থটিতে তারই সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন।

বোধিপথপ্রদীপ' তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে অনুরাগীদের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ বলে গৃহীত, প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষুর কাছে এই গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য ও একান্তপূজ্য। গ্রন্থটির উপক্রমণিকায় আরও বলা হয়েছে, "আমার প্রিয় শিষ্য জনছুবওদের অনুরোধে আমি ধর্ম ও সংঘসহ ত্রিকালের সকল জিনকে পরম ভক্তিভরে পূজা করে 'বোধিপথপ্রদীপ' ব্যাখ্যান করছি।"

গ্রন্থটির উপসংহারে বলা হয়েছে, "জনছুবওদের অনুরোধে আচার্য দীপংকর এখানে সূত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে সংক্ষেপে বোধিপথ প্রদর্শন করেছেন।" জনছুবওদ কোন্ বিশেষ কারণে অতীশের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, গোই লোচাবা সংক্ষেপে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: তিব্বতের পণ্ডিতদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণা ও মতবিরোধ ছিল। জনছুবওদ প্রভুকে অনুরোধ করেন তিনি যেন এই ভুল-ভ্রান্তি নিরসনের জন্য উপদেশ দান করেন। সেইজন্য প্রভু 'বোধিপথপ্রদীপ' রচনা করলেন।

গ্রন্থটি নাতিদীর্ঘ, মাত্র ছেষট্টি চরণে সমাপ্ত। কিন্তু তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের উপরে এই গ্রন্থটির একচ্ছত্র প্রভাব লক্ষণীয়। চোংখাপা-র উক্তি অনুসরণ করে ছোইচি ঞিমা বলেছেন: "যখন তিনি (জোবো অতীশ) ঞারি-তে এলেন, তখন তাঁকে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করতে অনুরোধ করা হল। প্রত্যুত্তরে তিনি 'বোধিপথপ্রদীপ নাম' শাস্ত্রটি রচনা করলেন। এই গ্রন্থে তন্ত্র ও সূত্রের সার বলা হয়েছে এবং এর

সাহায্যেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছিল।"

জনছুবওদ এবং নাগছো ছুলঠিম জলবা প্রভুর কাছে গ্রন্থটির বিশদ ব্যাখ্যা প্রার্থনা করেন, তাঁদের অনুরোধে অতীশ তখন 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থটির একটি ভাষ্য রচনা করেন। এই সুবিশাল স্বভাষ্যটির নাম 'বোধিমার্গ প্রদীপ পঞ্জিকা'। পরবর্তীকালের ধর্মসংস্কারক ও সাধক চোংখাপা (১৩৫৭-১৪১৯ খ্রিস্টাব্দ) 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থটির মূল বক্তব্যগুলি তাঁর নিজের গ্রন্থেও বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন।

ঐতিহাসিক সুমপা বলেছেন : প্রাচীন ও নবীন কাদম্পা (নবীন কাদম্পা বা গেলুগ্পা) উভয় সম্প্রদায়ই 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থটি শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটিতে সূত্র ও তন্ত্রের সার বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থটি রচনা করে অতীশ লহালামা জনছুবওদ এবং অন্যান্যদের পথ প্রদর্শন করেছেন।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে, উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সবচেয়ে জরুরী বিষয় ছিল নৈতিক সংস্কার, ধর্মব্যাখ্যায় দার্শনিক তত্ত্বের চেয়েও তার প্রয়োজন বেশি ছিল। দীপংকর 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থে প্রকৃত বৌদ্ধভিক্ষুর পক্ষে শীলশিক্ষার গুরুত্বের কথাই বারবার বলেছেন। তন্ত্র সম্পর্কে দীপংকরের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয়ও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

তিব্বতের ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন যে অতীশ যখন মধ্য তিব্বতে যান তখন খু, ওঁগ প্রমুখ সেই সময়ের ছয়জন বিখ্যাত তিব্বতী পণ্ডিত অতীশকে তন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। উত্তরে অতীশ বলেন, "রাজা বোধিপ্রভ (জনছুবওদ) এই সব প্রশ্নই আমাকে করেছিলেন এবং তার প্রতিটির উত্তর আমার 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে।" তাহলে দেখা যায়, তন্ত্র সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত মনোভাব কী ছিল তিব্বতে অতীশকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। তিব্বতের যে পণ্ডিতরা অতীশকে এই প্রশ্ন করেছিলেন, বৌদ্ধধর্ম বলতে তাঁরা তন্ত্রের প্রচুর সংমিশ্রণকেই জানতেন। তাই এ বিষয়ে অতীশের মনোভাব জানা তাঁদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

সেই সময় ভারতবর্ষে তন্ত্রমতের প্রভাব এত বেশি ছিল যে দীপংকরের পক্ষেও প্রশ্নটি বেশ জটিল হয়েছিল বলে মনে হয়। দীপংকর নিজে হীনযান ও মহাযান অর্থাৎ প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাদীক্ষায় বর্ধিত হয়েছেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাই ধর্ম ও তন্ত্রের নামে কতকগুলি আজগুবি কথা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাধারণ মানুষের মনে সেই যুগে তন্ত্র বলতে যে ধরণের বিশ্বাস ও ধারণা গজিয়ে উঠেছিল, সেগুলিকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি বলেছিলেন, প্রকৃত বৌদ্ধ ভিক্ষু এর কোনোটিকেই মেনে নিতে পারেন না। আবার সেই যুগে বাস করে তন্ত্র সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকাও সম্ভব ছিল না। তাই তন্ত্রচর্চার পক্ষে অপরিহার্য বলে কয়েকটি পূর্বশর্ত তিনি আরোপ করেছিলেন।

প্রথমেই তিনি বলেছিলেন যে নৈতিক শীলধর্ম ও আদর্শ গুরুর নির্দেশ ছাড়া তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এই আদর্শ গুরু বলতে কী বোঝায় অতীশের জীবনী থেকেই আমরা তার উদাহরণ পেতে পারি। রিনছেন সাংপো বা রত্নভদ্র সার্ধশতাধিক গুরুর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, কিন্তু পঁচাশি বৎসর বয়সে দীপংকরের দর্শন লাভের পরে তিনি প্রকৃত গুরুর সন্ধান পেলেন, সঠিক পথের নির্দেশ পেলেন এবং সেই নির্দেশ অনুসরণ করে অবশিষ্ট জীবন তিনি ধ্যানাভ্যাসে নিয়োগ করলেন। সেই যুগের সাধারণ মানুষ তন্ত্রচর্চা বলতে যা বুঝতেন তার সঙ্গে অতীশের নির্দেশিত ধর্মচর্যার কোনো সাদৃশ্য নেই।

ঐতিহাসিকরা বারবার বলেছেন যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের নামে এই তান্ত্রিক আচার-আচরণ সংশোধনই দীপংকরের প্রধান লক্ষ্য হয়েছিল। পশ্চিম তিব্বতের রাজারা এই উদ্দেশ্যেই তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। ধর্মচর্চার নামে অবাধ যৌনাচার, নরবলি, গুপ্তবিদ্যা ও নানা কুসংস্কার তিব্বতে তখন বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। ঙারির রাজারা এই কারণে বিশেষ চিন্তিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিকার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই তাঁরা এই কাজে ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তা চেয়েছিলেন।

তিব্বতে এই বিকৃত ধর্মমোহ সংশোধনের কাজ দীপংকর কেন, যে কোনো ধর্মসংস্কারকের পক্ষেই বেশ কঠিন ছিল। তিব্বতে দীপংকরের আগমনের পূর্বেই রাজভিক্ষু এশেওদ তান্ত্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিলেন। রাহুলজীর মতে জ্ঞানপ্রভ (এশেওদ)-র সঙ্গে তন্ত্রের কোনো সম্পর্ক ছিল না, বরং তিনি এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি পুস্তকও রচনা করেছিলেন। তিব্বতের তান্ত্রিকরা অবশ্য বিশ্বাস করেন যে এই পুস্তকটি লিখেছিলেন বলেই রাজভিক্ষু এশেওদকে নরকে যেতে হয়েছিল।

দীপংকর তান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন করেন নি, তবে তিব্বতের তান্ত্রিকরা সে দেশে দীপংকরের একচ্ছত্র প্রভাবের কথা মনে রেখেই হয়তো তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি বা বলতে সাহস করেন নি। দীপংকরও তন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলেন নি। যেমন, তাঁর 'চর্যাসংগ্রহপ্রদীপ' গ্রন্থে প্রথমে গুহ্য মন্ত্র ও তন্ত্রের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য জানিয়ে তার পরে তিনি ভিক্ষুচর্যার আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন। 'চর্যাগীতি' গ্রন্থে তিনি তন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে প্রকৃত বৌদ্ধ মতবাদের মূল তত্ত্বগুলি বিবৃত করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে দীপংকরের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথাও তিব্বতের তান্ত্রিকরা জানতেন। পূর্ণ তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণের পরে তাঁর বৌদ্ধসন্ন্যাস জীবন শুরু। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর দখল ছিল, তাই তিব্বতের শ্রেষ্ঠ তন্ত্রবিশারদ রিনছেন সাংপোর পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি প্রথম দর্শনেই চূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

দীপংকর যে তান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন করেন নি এজন্য কেউ কেউ আবার তাঁর প্রধান শিষ্য ব্রোম ত্োনপা-কেই দায়ী করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রোমের গভীর জ্ঞান ছিল,

কিন্তু তান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক প্রচার হলে তিব্বতের সাধারণ মানুষের নৈতিক মান যথেষ্ট নেমে যাবে মনে করে তিনি প্রভু দীপংকরকে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। তিব্বতের ঐতিহাসিকরা অবশ্য বলেছেন যে যখন প্রভু (দীপংকর) সামিয়ে বিহারে ছিলেন তখন তিনি ব্রোমকে বিভিন্ন তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা দেন, সরহের দোহা সহ অনেক গুহ্য উপদেশও তিনি দেন। সেই সময়ে তিব্বতে একদল দুশ্চরিত্র মানুষ তন্ত্রের নামে অনেক দুর্নীতি প্রচার করত ; প্রভুকে তাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখাই ব্রোমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ব্রোম তাই গুহ্য তন্ত্রশাস্ত্রে নিজের পাণ্ডিত্যের কথা সব সময়েই গোপন রাখতেন।

মারপা তিব্বতে কাজুদপা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১০১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। মারপা-র প্রধান শিষ্যের নাম মিলারেপা। তাঁর জন্ম ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে। তিব্বতের ইতিহাসে কবি ও সাধকরূপে তিনি সবিশেষ খ্যাত। মিলারেপা বহু ভারতীয় সিদ্ধাচার্যের কাছে গুহ্য তান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে নারোপা, মৈত্রীপা ও কুক্কুরীপার নাম পাওয়া যায়। মারপা তিব্বতে মহামুদ্রা তন্ত্র প্রচার করেন। ব্রোমতোনপা অতীশকে তিব্বতে মহামুদ্রা তন্ত্র প্রচার থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন বলে মিলারেপা ব্রোমের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

অতীশের উপদেশ অনুসরণ করে ব্রোম তোনপা তিব্বতে কাদম্পা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মিলারেপা বলেছেন, কাদম্পা-রা শুধু দেবতাদেরই উপাসনা করে, তাঁদের সঙ্গিনী বা শক্তিদের বর্জন করে। এই সাধনার নাম বিপত্নীক সাধনা। শাস্ত্রোক্ত নাম একবীর সাধনা। 'একবীরসাধন' নামে দীপংকর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

অতীশ তিব্বতে তান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেননি, তিব্বতের ঐতিহাসিকরা এজন্য ব্রোম তোনপা-কেই দায়ী করেছেন। আমাদের ধারণায় বিনা কারণেই ব্রোমের উপর দোষারোপ করা হয়েছে। কারণ, অতীশের প্রতি ব্রোমের এমন গভীর আনুগত্য ছিল যে অতীশ যদি কিছু প্রচার করতে চাইতেন, তাহলে ব্রোম তাতে বাধা দেবার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। তবে এ বিষয়ে অন্যভাবে ভাবা যেতে পারে। তান্ত্রিক মতবাদে আচ্ছন্ন তিব্বতে অতীশ কোন তন্ত্রমত প্রচার করেননি এবং তাঁর প্রচারিত উন্নত ও স্পষ্ট মহাযান মতবাদের প্রভাবেই হয়তো ব্রোমেরও মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল।

অতীশ অবশ্য সরাসরি তন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, এমন কি তিনি নিজেও কয়েকটি তন্ত্রশাস্ত্র লিখেছেন। তবে তাঁর প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদে মহাযান বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে, তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তার সামান্যই সম্পর্ক আছে।

দীপংকর বারবার বলেছেন, এই ভবসংসার মায়াময়, অনিত্য, তার প্রতি আসক্তিই জীবের সর্বদুঃখের কারণ। দৃঢ়ভাবে এই ধ্যানে চিত্তনিবদ্ধ করাই হল

প্রকৃত তন্ত্রচর্যা। তন্ত্রমতের নামে সেই সময়ে যে সব স্থূল, গর্হিত আচরণ প্রচলিত ছিল দীপংকর সেগুলির পরিবর্তে নৈতিক শুদ্ধি, ব্রহ্মচর্য ও ধ্যানসমাধির কথা বলেছেন।

তবে ব্রোমকে অভিযুক্ত করার হয়ত অন্য কারণ আছে। তিব্বতের তন্ত্রচারীরা জানতেন যে ব্রোমের অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির ফলে তিব্বতে অতীশের ধর্ম-অভিযান এমন বিপুল সাফল্য লাভ করেছিল। ব্রোমের সঙ্গে অতীশের প্রথম সাক্ষাৎ তাই তিব্বতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি যে দীপংকর তিব্বতে তিন বৎসর থাকবেন বলে এসেছিলেন। তারপর তিনি ভারতে ফিরে যেতে চান। সম্ভবত তিব্বত ও নেপাল সীমান্তে তখন কোনো উপদ্রব দেখা দিয়েছিল, তাই অতীশ দীপংকরের আর ভারতে ফেরা সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে গোই লোচাবা বলেছেন, তিনদিন পরে প্রভু ও তাঁর সঙ্গীদল আবার যাত্রা শুরু করলেন, তাঁরা চিরোং-এ এসে পেঁছালেন। কুক্কুট-বর্ষটি তাঁরা এখানে কাটালেন, তারপর তাঁরা বালপোজং-এর দিকে চললেন। কিন্তু গোলমালের জন্য পথ বন্ধ ছিল বলে তাঁরা আর এগোতে পারলেন না। তিব্বতের চিরোং শহরটি নেপাল সীমান্তে অবস্থিত এবং তিব্বতী ভাষায় বালপো অর্থে নেপাল। এই কুক্কুট-বর্ষ ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ। অতীশ তাহলে ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে নেপাল সীমান্তে এসেও সীমান্তের কোন গোলযোগের জন্য পথ বন্ধ থাকায় ভারতে ফিরে যেতে পারেননি। আমৃত্যুকাল তাঁর তিব্বতেই কেটে যায়।

সুম্‌পা বলেছেন, "বিক্রমশীলের স্থবির রত্নাকরের কাছে নাগছো প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে তিন বছর পরে তিনি অতীশকে ভারতে ফিরিয়ে আনবেন। নেপালের সীমান্তে সংঘর্ষের জন্য দীপংকরের ফিরে যাওয়া হলনা। তিব্বতের বিপুল সৌভাগ্য ও তারাদেবীর করুণার ফলেই এটা সম্ভব হল।"

দীপংকরের তিব্বত বাসের সময়ে চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, তিব্বতে তাঁর সর্বপ্রধান শিষ্য ব্রোম তোনপা জলবেই জুংনে বা জয়াকরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। পশ্চিম তিব্বতে তিন বৎসর কাটাবার পরে অতীশ পূর্বের ব্যবস্থা অনুসারে ঞারি থেকে ভারতে ফিরে আসতে চান। কিন্তু এই সময়ে ব্রোম তোনপা তাঁর কাছে আসেন। ব্রোম তোনপা-র সঙ্গে এই সাক্ষাতের ফলে তিব্বতে অতীশের কার্যধারা এক নতুন পথে অগ্রসর হয়। সেই কারণেই সুম্‌পা এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারকে তিব্বতের দুর্লভ সৌভাগ্য ও তারাদেবীর করুণার ফল বলে অভিহিত করেছেন।

ব্রোম তোনপা-র অনুনয়েই অতীশ ভারতে ফিরে আসবার চেষ্টা ত্যাগ করেন এবং মধ্য তিব্বত পরিভ্রমণে উৎসাহী হন। ব্রোম তোনপা প্রভুকে মধ্য তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত করেন। তাই শুধু সীমান্তের সংঘর্ষের ফলেই অতীশ ভারতে ফিরতে পারেন নি, এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন। গোই লোচাবা এই প্রসঙ্গে বলেছেন : নাগছো যখন দেখলেন মধ্য তিব্বতে অতীশের যথাযোগ্য

সম্বর্ধনার জন্য ব্রোম তোনপা সেখানকার পণ্ডিতদের কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছেন, তখন তিনি বুঝলেন যে প্রভু এবারে মধ্য তিব্বতে যাত্রা করছেন। তখন তিনি প্রভুর বসনপ্রান্ত চেপে ধরে কেঁদে বললেন, "বিক্রমশীলের স্থবিরের কাছে আমি কথা দিয়ে এসেছি যে তিন বছর পরে আপনাকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। (সে কথার খেলাপ করে) নরকে যাবার সাহস আমার নেই। প্রভু, আপনি ভারতে ফিরে চলুন।"

প্রভু তখন নাগছোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "হে লোচাবা, তুমি যদি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পার, তাহলে তোমার কোনো অপরাধ হবে না।" এইভাবে নাগছো ছুলঠিম জলবা-কে আশ্বস্ত করে অতীশ ব্রোম তোনপা-র সঙ্গে মধ্য তিব্বতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মধ্য তিব্বত এক সময়ে বিশেষ গৌরব-সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু লাংদারমার বৌদ্ধবিদ্বেষের ফলে সেখানে অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটে। কিন্তু মধ্য তিব্বতের লহাসা, সামিয়ে এবং অন্যান্য বহু বিহারে কয়েক সহস্র ভিক্ষু তখনও বাস করছিলেন। ব্রোম তোনপা তাঁদের কথা প্রভুকে বলেন। শুনে প্রভু বললেন, "ভারতেও তো এত বেশি সংখ্যায় ব্রহ্মচারী (বৌদ্ধভিক্ষু) নেই! এই বিহারগুলিতে নিশ্চয়ই অনেক অর্হৎও আছেন।" বলে প্রভু মধ্য তিব্বতের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে বারংবার নমস্কার করলেন। উৎসাহিত হয়ে ব্রোম প্রভুকে উই বা মধ্য তিব্বতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলেন। অতীশ বললেন, "বৌদ্ধসংঘ যদি আমাকে আমন্ত্রণ জানান, তাহলে সে আমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা। তাই আমি নিশ্চয়ই যাব।"

ব্রোম অনেক বৌদ্ধবিহার ও বিহারবাসী ভিক্ষুদের কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের উপযুক্ত গুরুর অভাবের কথাও তিনি জানতেন। তিব্বতের বৌদ্ধদের যোগ্য নেতৃত্ব দেবার জন্য অতীশই সে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য, এ বিশ্বাসও ব্রোমের ছিল। মধ্য-তিব্বতে তাঁর অনেক কিছু করবার আছে, এ কথা অতীশ বুঝেছিলেন। তাই তিনি ভারতে ফিরে না এসে ব্রোমের সঙ্গে মধ্য তিব্বত ভ্রমণ শুরু করেন। অতীশ তারপরে দশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। তাঁর জীবিতকালের সেই শেষ দশ বৎসরে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও বৌদ্ধধর্ম মধ্য তিব্বতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ব্রোম তোনপা জলবেই জুংনে বা জয়াকর তিব্বতে অতীশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত শিষ্য ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ভক্তি-নম্র দীনতায় অদ্বিতীয়। নিজের সম্পর্কে তিনি বলতেন, তিনি একজন সামান্য উপাসক মাত্র এবং প্রভুর বিশ্বস্ত অনুচর, সকল কাজে প্রভুর আদেশ পালন করাই তাঁর জীবনের ব্রত।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার ও প্রচারে ব্রোম তোনপা অতীশের সর্বক্ষণের সঙ্গী ও সহায় ছিলেন। তিব্বতের ইতিহাসে ও বিভিন্ন কাহিনীতে এই গুরুশিষ্যের বিবরণ সবিস্তারে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে, ভারত থেকে তিব্বত যাত্রার পূর্বেই অতীশ তিব্বতে তাঁর এই প্রধান শিষ্যের কথা একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে জানতে পারেন। এই

কাহিনীতে বলা হয়েছে যে দীপংকর যখন বিক্রমশীলে ছিলেন তাঁর আরাধ্যা তারাদেবীর নির্দেশে তিনি এক যোগিনীর কাছে যান; তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে দীপংকর যদি তিব্বতে যান তবে তাঁর দ্বারা সেখানে প্রাণিহিত হবে কিনা যোগিনীকে তিনি এই প্রশ্ন করেন। যোগিনী উত্তরে বলেন যে, দীপংকর তিব্বতে গেলে যথেষ্ট প্রাণিহিত হবে। বিশেষ করে তাঁর দ্বারা একজন উপাসকের পরম উপকার হবে এবং সেই উপাসকের মাধ্যমে সমগ্র তিব্বতের মহৎ কল্যাণ সাধিত হবে।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রোম তোনপা-র অদ্বিতীয় ভূমিকা আছে। তিব্বতের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এর আগে সে দেশে প্রধানত রাজা বা মন্ত্রিরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে তাই বৌদ্ধধর্ম অভিজাত সম্প্রদায়ের ধর্ম বলেই পরিচিত ছিল। তিব্বতে শান্তরক্ষিতই প্রথম এক দল শিক্ষিত বৌদ্ধভিক্ষু গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু লাংদারমা-র অত্যাচারের ফলে এই ভিক্ষুরা বিশেষ কোনো কাজ করতে পারেন নি। ব্রোম তোনপা সর্বপ্রথম এই ধর্মকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যান এবং তার প্রকৃত গণভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রোমের অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার ফলে তিব্বতে এই প্রথম ধর্ম-ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি প্রকৃত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। এই সম্প্রদায়ের নাম কাদমপা। পরবর্তী কালে চোংখাপা-র নেতৃত্বে তার নাম হয় নব কাদমপা বা গেলুগপা। তিব্বতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি-র মধ্যে এটিই সর্বপ্রধান।

শরৎচন্দ্র দাস ব্রোম তোনপা সম্পর্কে বলেছেন, তিব্বতের একটি প্রাচীন পরিবারের নাম ব্রোম, কাষ্ঠ-সর্প-বর্ষে বা ১০০৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশে ব্রোম তোনপা জলবেই জুংনে-র জন্ম হয়। ল্হাসার উত্তর-পশ্চিমে তোদলুং জেলার ফুচুজেমো গ্রামটি তাঁর জন্মস্থান। খুব অল্প বয়সেই তিনি মাতৃহীন হন। শিশুকাল থেকে তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সৎ-মায়ের দুর্ব্যবহারে তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে যান এবং শু নামের একটি জায়গায় গিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। এখানেই তিনি জোবো সেচুনের সাক্ষাৎ পান। গুরু সেচুন তখন খাম থেকে নেপাল হয়ে ভারতে যাচ্ছিলেন। সেচুন-এর প্রতি ব্রোমের শ্রদ্ধা জাগ্রত হল। ভারতীয় পণ্ডিত স্মৃতির কাছে ব্রোম তোনপা অনুবাদের কাজ শিখেছিলেন। বুতোন বলেছেন, রাজগুরু এশেওদ-এর সময়ে নেপালের পদ্মরুচি ভারত থেকে পণ্ডিত স্মৃতি ও সুক্ষ্মদীর্ঘকে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এই দোভাষীটির নেপালেই কলেরায় মৃত্যু হল। স্মৃতি ও সুক্ষ্মদীর্ঘ তিব্বতী ভাষা জানতেন না বলে খুবই বিপদে পড়লেন। তাঁরা উভয়ে অসহায়ভাবে তিব্বতের উই ও চাং-এ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমন কি পণ্ডিত স্মৃতি তানাং-এ পশুপালকের কাজ করতেও বাধ্য হলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত স্মৃতি মাং উল-এ আমন্ত্রিত হলেন এবং তিব্বতী ভাষা শিখে নিজের কয়েকটি রচনা তিব্বতীতে অনুবাদ করলেন।

ব্রোম তোনপা বহু কষ্টে ও চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। গুরু সেচুন-এর কাছে তিনি শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। গুরু-গৃহে তাঁকে অনেকরকম সাংসারিক কাজ করতে হত। গম ভাঙা থেকে শুরু করে পশুপালন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের

কাজে তাঁকে নিযুক্ত থাকতে হত। বর্শা, তীরধনুক ও ছোরা হাতে ঘোড়ায় চড়ে তিনি ডাকাতদের হাত থেকে পশুপালকে রক্ষা করতেন। তবুও হতাশ না হয়ে সব সময়ই তিনি লেখাপড়ার চেষ্টা করতেন। এমন কি যখন তিনি গম পিষতেন, তখনও পাশে বই রেখে পড়তেন। এই ভাবে গভীর অধ্যবসায়ে তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুললেন।

অনুবাদের কাজেও তাঁর কঠোর শৃঙ্খলাবোধ ও একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংখ্যায় কটি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করবেন, এটা তাঁর কাছে বড় ছিল না, কিন্তু প্রতিটি অনুবাদ যেন বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হয়, এই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। দীপংকরের অপর শিষ্য নাগছো ছুলঠিম জলবা-র কিন্তু সংখ্যায় অনেক গ্রন্থ অনুবাদের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল, ব্রোম তোনপা তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। দীপংকরের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য হয়েও প্রভুর অধীনে তিনি মাত্র দুখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অনুবাদ ত্রুটিমুক্ত করবার জন্য তিনি যে কত সতর্ক ছিলেন, 'আর্য-অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থটির অনুবাদে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রন্থটির তিব্বতী তর্জমায় প্রথমে আমরা পাই, ভারতীয় উপাধ্যায় শাক্যসেন ও জ্ঞানসিদ্ধি ও বিখ্যাত লোচাবা ধর্মতাশীল ও অন্যান্যরা এই গ্রন্থটি অনুবাদ, সংশোধন ও সম্পাদন করেন।

এর পরে তিব্বতের মহারাজ পাল লহাচানপো টাশি লহাদেচান-এর অনুরোধে ভারতীয় উপাধ্যায় সুভাষিত এবং বিখ্যাত বৈয়াকরণিক রত্নভদ্র গ্রন্থটির টীকা অনুসরণ করে তর্জমা করেন।

আবার ভারতীয় উপাধ্যায় মহাপণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও বিখ্যাত অনুবাদক মহা লোচাবা ভিক্ষু রত্নভদ্র মগধে প্রাপ্ত টীকার সঙ্গে তুলনা করে পূর্বের অনুবাদ সংশোধন ও সম্পাদন করেন।

তারপরে, ঞেথাং-এ দীপংকর শ্রীজ্ঞান যখন 'অষ্ট-সাহস্রিকা' ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন তিনি ও লোচাবা জলবেই জুংনে এই তর্জমার বেশির ভাগই সংশোধন করে তার চূড়ান্ত রূপ দেন।

এর পরে রাডেং বিহারে তিনটি মূল পুঁথি তুলনা করে ব্রোম তোনপা গ্রন্থটি আবার অনুবাদ করেন।

তারপরে আবার এই একই লোচাবা অর্থাৎ ব্রোম তোনপা এই গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা রচনা করেন।

পরবর্তী কালে মহা লোচাবা শাক্যভিক্ষু লোদান শেরব বা মতিপ্রজ্ঞ কাশ্মীর ও মগধ থেকে বহু মূল পুঁথি সংগ্রহ করে তর্জমাটি সুসম্পূর্ণ করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে তিব্বতের ইতিহাসে কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদক রূপে নয়, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসাবেই ব্রোম তোনপা স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিব্বতে এই ধর্মপ্রচারের স্তরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়: অতীশের জীবনের শেষ নয় বা দশ বৎসর। এবং দ্বিতীয় পর্যায়: অতীশের মৃত্যুর পরে আরও যে দশ বৎসর ব্রোম জীবিত ছিলেন সেই সময়।

প্রথম পর্যায়ে ব্রোম তোনপা মধ্য তিব্বতে দীপংকরের ব্যাপক পর্যটনের ব্যবস্থা করেন। সম্ভবত প্রভু দীপংকরের সঙ্গে দেখা হবার আগেই তিনি এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ঞারিতে প্রথম যখন তিনি দীপংকরের দর্শন লাভ করেন তার আগেই ব্রোম তোনপা কাবা-র শাক্য ওয়াংছুগ-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলেছিলেন, এখন আমি পন্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাঁকে যদি উই-তে নিমন্ত্রণ করে আনা যায়, তাহলে আমি আপনাকে চিঠি দেব। তখন আপনি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করবেন।

ব্রোমের অনুনয়ে অতীশ মধ্য তিব্বতে যেতে সম্মত হলেন। এদিকে ব্রোমের চিঠি পেয়ে কাবা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ আগ্রহভরে অতীশের সংবর্ধনার আয়োজন করলেন। দীপংকর যখন চিরোং-এ ছিলেন, তখনই তিনি এই অভ্যর্থনার সংবাদ পেয়েছিলেন। মধ্য তিব্বত থেকে কাবা যখন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে প্রভুকে স্বাগত জানাবার জন্য পালথং-এ এসে পেঁছোলেন, প্রভু অতীশ ও তাঁর সহচররাও তখন পালথং-এর শীর্ষদেশে এসে পেঁছেছেন।

অতীশের এই বিস্তৃত পর্যটন ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে তিব্বতের ইতিহাসে অনেক অতিরঞ্জন আছে। তবে গোই লোচাবা-র বিবরণ অনুসরণ করে বলা যায় যে ঞারি থেকে যাত্রা করে দীপংকর সঙ্গীদের নিয়ে পালথং-এর দিকে চললেন, সেখানে তিব্বতের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। চাং-এ তাঁরা বিশেষ সংবর্ধনা পেলেন না, তাই তাঁরা নাংছো-র দিকে চলে গেলেন। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। এই সমস্ত জায়গার বহু ব্যক্তি গভীর শ্রদ্ধাভরে দীপংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বহু মূল্যবান প্রণামীও তিনি পেলেন। নীলকান্তমণিতে তৈরি একটি শিশু এক সোনার ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বসে আছে— এই মহামূল্য অর্ঘ্যটি এক ভিক্ষুণী দীপংকরের চরণে নিবেদন করলেন। একটি তরুণী তাঁর বিবাহচিহ্ন রত্নখচিত স্বর্ণমুকুট দীপংকরকে সমর্পণ করলেন। মেয়েটির বাবা-মা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করাতে সে মনের দুঃখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে প্রাণ দিল।

দীপংকর ও তাঁর সঙ্গীদল অগ্রসর হয়ে চললেন। তাঁরা পতাকা উড়িয়ে দামামা বাজাতে বাজাতে নাবোলায় পেঁছালেন। গ্রামের লোকজন ভয় পেয়ে গেল; তারা "যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে" বলে চিৎকার করতে করতে চারদিকে দৌড়ে পালাতে লাগল।

দোল নামের একটি জায়গার অধিবাসীরা দীপংকরের অভ্যর্থনার জন্য কোনো আড়ম্বর করলেন না বটে, তবে তাঁরা দীপংকরের দলের প্রত্যেককে পালা করে গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু এখানে সাধারণের হিতের জন্য একটি বাঁধ নির্মাণ করলেন, এই স্থানটির নাম হল লুহাজেরাগ। তারপর তাঁরা পেলমা-র খেয়াঘাটে গিয়ে পেঁছোলেন এবং সেখান থেকে ধর্মচক্র সামিয়ে (বিহার)-এর দিকে চললেন। সেখানে স্রোংচান গামপো-র বংশধর রাজা বোধিরাজ দীপংকরের সংবর্ধনার

এক বিশেষ আয়োজন করলেন; তিব্বতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পণ্ডিত তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছিলেন।

তারপরে প্রভু দীপংকর সামিয়ে-র পেকারলিং-এ বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি লোচাবা নাগছো ছুলঠিম জলবা-র সঙ্গে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় তর্জমা করলেন। সব দেখে শুনে বিহারটি দীপংকরের খুব পছন্দ হল, সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন থাকবেন বলে ঠিক করলেন। মাংতোনু-এর কাছে ব্রোম তোনপা খবর পাঠালেন। মাংতোন দুশো ঘোড়সওয়ার নিয়ে সামিয়ে-তে এসে প্রভুকে সংবর্ধনা জানালেন। বিভিন্ন স্থানে কিছুকাল কাটিয়ে প্রভু তারপর ঞেথাং-এ এলেন। এখানে তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন। ঞেথাং-এ বহুসংখ্যক শ্রোতার সম্মুখে তিনি 'অভিসময়-অলংকার' পাঠ করলেন।

সেই সময়ে ও'গ লেগপেই শেরব দীপংকরকে ল্হাসায় আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। অবলোকিতেশ্বর এক শ্বেতকায় মানুষের মূর্তি ধারণ করে নিজে এসে দীপংকরকে অভ্যর্থনা জানালেন। দীপংকর একটি কড়িকাঠের মধ্যে থেকে ল্হাসার ইতিহাস উদ্ধার করলেন, তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা তার অনেকগুলি প্রতিলিপিও প্রস্তুত করলেন। তারপর দীপংকর ঞেথাং-এ বাস করতে লাগলেন। অতীশ ধর্মদেশনার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন দক্ষিণা পেয়েছিলেন। বিক্রমশীল বিহারের ভিক্ষু সংঘের জন্যে সেই সঞ্চয় অতীশ তাঁর শিষ্য ছাগ্ঠিছোগ ও অন্য শিষ্যদের মারফৎ তিন দফায় ভারতে পাঠিয়েছিলেন।

এর পরে প্রভু ইয়েরপা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ও'গ জনছুব জুংনে অতীশকে বিশেষ সংবর্ধনা জানালেন। প্রভু যখন ইয়েরপা-তে ছিলেন তখন স্বর্ণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্রোম তোনপা তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে গেলেন। তিনি প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করে এনে প্রভুর চরণে প্রণামী দিলেন। ব্রোম তোনপা-র এই নিবেদন ব্রোম-এর মহাপুজা নামে বিখ্যাত।

কাবা শাক্য ওয়াংছুগ প্রভুকে আমন্ত্রণ জানালেন, সেই আমন্ত্রণে প্রভু ফাংউল-এর লনুপা চিলবু-তে গেলেন। এইভাবে অতীশ ঞেথাং, ল্হাসা, ইয়েরপা, লনুপা প্রভৃতি বহুস্থানে বিশদভাবে ধর্ম উপদেশ দিলেন। তারপর আবার তিনি ঞেথাং অভিমুখে ফিরে চললেন।

এই সময়ে অতীশের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হতে লাগল। অতীশ তাঁর শেষ জীবন ঞেথাং-এই কাটান। কাষ্ঠ-অশ্ব-বর্ষে অর্থাৎ ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাহাত্তর বৎসর বয়সে মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে প্রবাসে ঞেথাং-এ অতীশ দীপংকরের মৃত্যু হল। তিব্বতের ঐতিহাসিকরা বলেন, তিনি তুষিত স্বর্গে যাত্রা করলেন।

তিব্বতের ঐতিহাসিকরা আরও বলেন যে দীপংকর তাঁর অন্তিম অভিপ্রায় ব্রোমকেই জানিয়ে ছিলেন। তিব্বতে দীপংকর যে ধর্ম-সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই কাজ সুসম্পন্ন করবার দায়িত্ব তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য ব্রোম তোনপা-কেই দিয়েছিলেন। অতীশ ব্রোম-কে একটি বিহার নির্মাণ করতে

বলেছিলেন এবং সেই বিহারটিকে কেন্দ্র করে ব্রোম কাজ করে যাবেন, এই নির্দেশও দিয়েছিলেন। প্রভুর এই আদেশ শুনে ব্রোম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে বললেন, "আমি সামান্য উপাসক মাত্র, এই বৃহৎ ও মহৎ কাজের যোগ্য আমি কি করে হব?"

উত্তরে প্রভু দীপংকর বললেন, "আমার নির্দেশমত কাজ কর। হতাশ হোয়ো না, তুমিই পারবে।"

অতীশের মৃত্যুতে ব্রোম তোনপা গভীর দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন, শোক-বিহ্বল অবস্থায় তিনি প্রথমে কী যে করবেন, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না। খবর পেয়ে কাবা শাক্য ওয়াংছুগ ঞেথাং-এ এলেন। প্রভুর চিতাভস্ম সমান ভাগে ভাগ করে তিনি খু, ও'গ প্রভৃতিকে দিলেন এবং তিনি ব্রোম তোনপাকে প্রভুর পূজার উপকরণগুলি ও মূর্তিসমূহ দিলেন।

খু, ও'গ এবং গারগাবা রৌপ্যমন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে প্রভুর স্মৃতিচিহ্ন রাখলেন। তারপর তাঁদের সবার উদ্যোগে কাষ্ঠ-মেষ-বর্ষে বা ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে এক বিশাল স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল।

ব্রোম তোনপা ঞেথাং-এ একটি বিহার নির্মাণ করলেন। প্রভু অতীশ তাঁর জীবদ্দশায় বহু ব্যক্তিকে প্রতিপালন করতেন, তিব্বতীতে তাদের বলা হয় সাদ্রা বা লোকজন। দীপংকরের মৃত্যুর পরে ব্রোম তোনপা তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলেন। ব্রোম কিছুদিন তোদলুং ও তার পরে, নাম-এর বালুকাময় উপত্যকায় বাস করলেন। সেই সময় দাম নামক অঞ্চলটির প্রধানরা একটি সভা করে স্থির করলেন যে তাঁরা ব্রোম তোনপাকে রাডেং বিহারে নিমন্ত্রণ করে আনবেন। তাঁদের নির্দেশে ফাংখা বেরছুং ব্রোমের কাছে এই আমন্ত্রণ নিয়ে এলেন।

ব্রোম তোনপা অগ্নি-বানর-বর্ষে বা ১০৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাডেং বিহারে গেলেন। এই বিহারে তিনি একটি মূল মন্দির ও তার দুই পাশে দুই স্তম্ভ ও প্রাঙ্গণ নির্মাণ করলেন। পরবর্তীকালে রাডেং-এর বিশাল মন্দিরের অভ্যন্তরে ব্রোমের নির্মিত এই মন্দির সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। ব্রোম তোনপা এর পরে ঘোষণা করলেন যে তিনি আর কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে জড়িত থাকবেন না। বললেন, "সংসার আমি ত্যাগ করলাম"। সেই সময় থেকে সাংসারিক সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি শুধু ধর্মপ্রচারে মন দিলেন।

এই রাডেং বিহারকে কেন্দ্র করে ব্রোম তোনপা তিব্বতে প্রথম কাদমপা সম্প্রদায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্রোম তোনপা প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের মূল কথা, প্রত্যেককে বুদ্ধের বা জিনের সমগ্র শিক্ষা—অর্থাৎ সূত্র ও তন্ত্র—একই সঙ্গে অনুশীলন করতে হবে। ছয়টি গ্রন্থকে তাঁরা তাঁদের মূল শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, যথা:

মহাযান-সূত্রালংকার
বোধিসত্ত্ব-ভূমি
শিক্ষা-সমুচ্চয়
বোধিসত্ত্ব-চর্যাবতার

জাতকমালা ও
উদান বর্গ।

এই গ্রন্থগুলিতে কিন্তু বিশুদ্ধ ও মৌলিক মহাযান মতবাদই প্রাধান্য পেয়েছে।

ব্রোম তোনপা আরও নয় বৎসর রাডেং-এ বাস করেছিলেন। তাঁর জীবিতকালে রাডেং বিহারে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা স্থায়ীভাবে বাস করতেন তাঁদের সংখ্যা ষাটের বেশি ছিল না। কাদমপা সম্প্রদায়ের অনুগামীদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। তবে ব্রোম যে ধর্ম-অভিযান শুরু করেন দিনে দিনে তার গতিবেগ বাড়তে থাকে। পরবর্তী কালে তিব্বতের প্রখ্যাত ধর্ম-সংস্কারক চোংখাপা এই আন্দোলনকে আরও সংগঠিত ও সুসংহত করেন, তখন কাদমপা সম্প্রদায়ের নূতন নাম হয় গেলুগপা। ক্রমে এই সম্প্রদায়ই তিব্বতের প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায় বলে পরিচিত হয়।

ব্রোম তোনপা প্রতিষ্ঠিত কাদমপা সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তবুও অতীশ দীপংকরের যোগ্য উত্তরাধিকারী ব্রোম তোনপা-র অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে তিব্বতের ঐতিহাসিক গোই লোচাবা-র মন্তব্য আমরা নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে স্মরণ করব। তিনি বলেছেন : ব্রোম যে পরিশ্রম করেছিলেন, তার ফল সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

ব্রোম তোনপা কিন্তু কোনো সময়েই তাঁর বিনয়-নম্রতা বিসর্জন দেন নি. তিনি অতীশের নগণ্য উপাসক বলে সব সময়ই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর রচিত স্তোত্রে শ্রদ্ধানত মস্তকে অতীশের চরণে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন :

"এই হিমবৎ দেশে আমার চেয়ে ভক্তিমান অনেক ভক্ত আপনার আছে,
তবু মাতা যেমন আপন সন্তানকে স্নেহ করেন তেমনি আপনার করুণার দ্বারা
হে আমার গুরু,

আপনি আমাকে চালনা করুন। হে মহান, সর্বত্র, সর্বকালে যেন আপনাকে আমার নাথরূপে পাই ; সম্যক সম্বোধি লাভের জন্য আপনি আমাকে প্রথম উপদেশ দান করুন—

ব্রোম তোনপা-র এই প্রার্থনা।"

পরিশিষ্ট—১
বিমলরত্ন লেখ

ভারতীয় ভাষায় বিমলরত্ন লেখ নাম। ভোট ভাষায় 'ডিমা মেদ পেই রিনপো ছেই ঠিন ইগ।'

গুরুগণকে প্রণাম। ভট্টারিকা তারাদেবীকে প্রণাম। মগধে জন্ম নিয়ে যিনি বুদ্ধশাসন বর্ধন করেছেন, রাজ্য ধর্মের দ্বারা পালন করেছেন, সেই নয়পালের জয় হোক ॥ ১ ॥

পূর্বে আপনি দান করেছেন, দশপুণ্য পালন করেছেন, ক্ষমা, বীর্য ও ধ্যান ইত্যাদি গুণে, হে দেব, আপনি ত্রি সম্পন্ন (প্রাপ্ত) হয়েছেন ॥ ২ ॥

গুরুগণের আদেশ শিরে ধারণ করবেন, সূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র সমূহ অনুসরণ করবেন, এতে আত্মপর উভয়েরই কল্যাণ হবে ॥ ৩ ॥

দ্বিধা সন্দেহ পরিহার করে সিদ্ধিলাভের জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হবেন। নিদ্রা, মূর্খতা ও আলস্য পরিত্যাগ করে অবিরাম সাধনা করবেন ও সর্বদা সতর্ক থাকবেন ॥ ৪ ॥

সর্বদা স্মরণ, জ্ঞান ও যত্ন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি সর্বভাবে প্রহরা দেবেন। দিবারাত্র বারবার মনের গতি পরীক্ষা করবেন ॥ ৫ ॥

নিজের দোষ সম্পর্কে চক্ষুষ্মানের মত ব্যবহার করুন, কিন্তু অন্যের দোষ সম্পর্কে অন্ধ হবেন। ঔদ্ধত্য ও অহংকার পরিত্যাগ করে সর্বদা শূন্যতা ধ্যান করবেন ॥ ৬ ॥

অন্যের দোষ সন্ধান করবেন না, আত্মদোষ প্রচার করবেন। অন্যের গুণ প্রচার করবেন, নিজের গুণ গোপন রাখবেন ॥ ৭ ॥

উপঢৌকন এবং উপহার গ্রহণ করবেন না। লাভ এবং যশ সর্বদা পরিহার করবেন। মৈত্রী ও করুণা ধ্যান করবেন, বোধিচিত্ত সুদৃঢ় করবেন ॥ ৮ ॥

দশ অকুশল কর্ম পরিহার করবেন। (ধর্মের প্রতি) শ্রদ্ধা দৃঢ় করবেন। কামনা বাসনা খর্ব করে ও আত্মসন্তোষ লাভ করে ধর্ম আচরণ করবেন ॥ ৯ ॥

ক্রোধ ও অহমিকা বর্জন করুন। চিত্তকে নম্র করুন। অসার জীবন ত্যাগ করে ধর্মের জীবন যাপন করুন ॥ ১০ ॥

সাংসারিক সকল বিষয় ত্যাগ করে, আর্য ধনে ধনী হোন। কোলাহলপূর্ণ আমোদ প্রমোদের স্থান ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বাস করবেন ॥ ১১ ॥

বাক্যবাগীশ হবেন না, জিহ্বাকে সংযত রাখবেন। গুরু ও আচার্যের সান্নিধ্যে এলে, শ্রদ্ধাভরে তাঁদের সেবা করবেন ॥ ১২ ॥

যাঁরা ধর্মাচরণ করেন—তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রাথমিক শিক্ষার্থী কিংবা অতি সাধারণ মানুষ—যে কেউ হোন না কেন, তাঁদের গুরু বলে শ্রদ্ধা করবেন ॥ ১৩ ॥

সর্বপ্রাণীকে ক্লেশ পীড়িত দেখে নিজের মধ্যে বোধিচিত্ত উৎপাদন করবেন। জনক জননী সন্তানের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করেন, সকলের প্রতি সেই ব্যবহারই করবেন ॥ ১৪ ॥

সংসারের সকল কর্ম ত্যাগ করে নিত্য সমাধি ধ্যান করুন। পাপাচারী বন্ধুকে পরিহার করে কল্যাণমিত্রকে অনুসরণ করুন ॥ ১৫ ॥

যে ভিক্ষুরা শীল লঙ্ঘন করে, ধর্মে যাদের মতি নেই. যারা পাপে প্রবৃত্ত – এমন ব্যক্তিদের প্রতিও উদাসীন হবেন না ॥ ১৬ ॥

যারা আচার্য প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, যারা অকৃতজ্ঞ, যারা কেবল ঐহিক জীবনের কথাই ভাবে; যারা ভক্তি জানে না, সেই পাপাচারী সঙ্গীদের সান্নিধ্যে তিন দিনের বেশি থাকবেন না ॥ ১৭ ও ১৮ ॥

ক্রোধ ও অসন্তোষের স্থান পরিহার করবেন। যেখানে পরম সুখ, সেখানেই যাবেন। যাদের প্রতি আপনাব আসক্তি আছে, তাদের ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে বাস করবেন ॥১৯॥

আসক্তি দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না, বরং মোক্ষই ব্যহত হয়। সর্বদা কল্যাণমিত্রের সঙ্গে থাকবেন ॥ ২০ ॥

প্রথমে যে কাজ সুরু করবেন সেই কাজটিই আগে সম্পন্ন করবেন এবং সর্বদা গুরুকে শরণ করে সূত্রাদি পাঠ করে এই কাজ করবেন; না হলে কিছুই সিদ্ধ হবে না ॥ ২১ ॥

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। পুণ্যের জন্য সযত্ন হবেন। এমন কি সাংসারিক বিষয়ে যখন নিযুক্ত থাকবেন, তখনও চিত্তকে নিরাসক্ত রাখবেন ॥ ২২ ॥

চিত্ত অহংকারে স্ফীত হলে, সেই অহমিকা দমন করবেন। চিত্ত অমনোযোগী হলে, তখনই গুরুর উপদেশ স্মরণ করবেন ॥ ২৩ ॥

চিত্তে নির্বেদ লালন করবেন, প্রজ্ঞাপারমিতা স্মরণ করে আপনার কর্মসমূহকে অচঞ্চল রাখবেন ॥ ২৪ ॥

বস্তুর প্রতি অনুরাগ ও বিরাগকে মায়াপ্রপঞ্চ বলে জানবেন। অপ্রিয় শব্দ সমূহকে প্রতিধ্বনি বলে জ্ঞান করবেন ॥ ২৫ ॥

শরীরের গ্লানি বা দেহযন্ত্রণাকে পূর্বের কর্মফল বলে মনে করবেন ॥ ২৬ ॥

কর্ম সমাপ্ত করে নির্জনে অবসর নেবেন। বন্য পশুর মৃতদেহের মতো নিজেকে সকলের অলক্ষ্যে রাখবেন। আত্মপ্রচারে সম্পূর্ণ নিরস্ত হবেন ॥ ২৭ ॥

সর্বদা সতর্ক থাকবেন। আত্মদোষ গণনা করবেন। মনে যখন কামনা, বিদ্বেষ, নিদ্রা, মূর্খতা, আলস্য বা শ্রান্তি আসবে তখন ব্রতের সার স্মরণ করবেন ॥ ২৮ ॥

অন্যদের সম্মুখে সতর্কতার সঙ্গে কথা বলবেন। চোখ রাঙিয়ে বা অবজ্ঞা করে কথা বলবেন না। সর্বদা হাস্যমুখে থাকবেন ॥ ২৯ ॥

অন্যদের প্রতি সর্বদা দানশীল হবেন, কৃপণ হবেন না। ঈর্ষা পরিহার করবেন। অন্যদের চিত্ত রক্ষণের কাজ করবেন ॥ ৩০ ॥

অন্যদের সঙ্গে সংঘাত সর্বদা পরিহার করবেন। কৃত্রিম সৌজন্য দেখাবেন না।

বান্ধব গোষ্ঠী বর্ধন করবেন না। সর্বদা সতর্ক থাকবেন। সর্বদা ক্ষমাশীল হবেন। ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকবেন ॥ ৩১ ॥

নিজেকে দীন ভৃত্য বলে মনে করবেন। লজ্জিত ও নম্র হতে শিখবেন। অন্যদের সুখী করতে চেষ্টা করবেন। নিজের সম্বর রক্ষা করে চলবেন ॥ ৩২ ॥

অন্যদের অপমান করবেন না। বিনয়ী হবেন। অন্যদের প্রতি ভালবাসা ও কল্যাণের কথা ভেবেই তাঁদের উপদেশ দেবেন ॥ ৩৩ ॥

সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। সত্য ধর্ম থেকে কখনও বিচ্যুত হবেন না। সর্বদা দেবতাকে ভক্তি করবেন এবং ত্রি-চক্র (অর্থাৎ দাতা, দান ও দানগ্রহণ) শুদ্ধ রাখবেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বজনীন করুণায় নিজেকে অভিসিঞ্চিত করুন। প্রতি দিন ও রাত্রে তিনবার করে সপ্তপূজা সমাপনের খ্যাতি লাভ করুন। ত্রি স্কন্ধকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করুন ॥ ৩৫ ॥

সর্বজীবের দুর্গতি নিবারণের জন্য কাজ করবেন। আপনার প্রণিধান বিস্তৃত করে সম্যক সম্বোধি লাভের জন্য প্রার্থনা করবেন। মহাবোধি লাভই সর্ব কর্মের লক্ষ্য করুন ॥ ৩৬ ॥

সম্বর গ্রহণ করে তা পূর্ণ করবার জন্য যত্নবান হবেন। এই ভাবে আপনি বর্গদ্বয় (অর্থাৎ, জ্ঞানবর্গ ও পুণ্যবর্গ) পূর্ণ করে (অর্থাৎ ক্লেশ-আবরণ ও জ্ঞেয়-আবরণ) মুক্ত হতে পারবেন ॥ ৩৭ ॥

নির্বাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনার মানব জীবন সার্থক করুন। নিজের ও অন্যদের কল্যাণের জন্য কাজ করুন। মহত্ত্ব অর্জন করুন ॥ ৩৮ ॥

কুহু কেকার মধুর ধ্বনির মত হয়ত আমার বাক্যগুলি সুমিষ্ট নয়। এর আগে এই কথাগুলি হয়ত অন্য পণ্ডিতরাও বলেছেন। তা সত্ত্বেও রাজার মর্মবেদনা দূর করবার জন্যই এই কথাগুলি লিখছি ॥ ৩৯ ॥

আপনার মঙ্গলের জন্যই এই কথাগুলি লিখছি, এগুলি সযত্নে বিবেচনা করবেন। অন্যরা সন্দেহপ্রবণ বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না। সর্বদা ষট্‌দেব ধ্যান করবেন ও নিজ সম্বর পরিশুদ্ধ রাখবেন। ধর্মপথে থেকে রাজ্য পালন করবেন। সর্বদা ক্ষমাশীল হবেন ॥ ৪০ ॥

স্থবির মহাপণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান কর্তৃক রাজা নয়পালকে প্রেরিত 'বিমলরত্ন লেখ' পত্রটি এখানেই সমাপ্ত হল।

পরিশিষ্ট—২

বোধি-পথ-প্রদীপ

ভারতীয় ভাষায় 'বোধি-পথ-প্রদীপ', তিব্বতী ভাষায় 'জনছুব-লমজি-ডোনমা'।

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী কুমারভূতকে প্রণাম। আমার প্রিয় শিষ্য জনছুবওদ (বা বোধিপ্রভের) অনুরোধে ত্রিকালের সকল জিন—তাঁদের ধর্ম ও সংঘসমূহকে—পরম শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে আমি 'বোধি-পথ-প্রদীপ' বিবৃত করছি।

অধম, মধ্যম ও উত্তম—পুরুষকে এই তিন প্রকারের বলে জানবে। তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন লক্ষণ স্পষ্ট করে লিখছি॥ ১॥

যে ব্যক্তি শুধু নিজের স্বার্থ ও সংসার-সুখের জন্য কাজ করে, তাকে অধম পুরুষ বলে জানবে॥ ২॥

সংসার-সুখের প্রতি ঔদাসীন্য ও পাপকর্মে স্বাভাবিক অনীহা সত্ত্বেও যে শুধু আত্মহিতে মগ্ন, তাকে মধ্যম পুরুষ বলে জানবে॥ ৩॥

নিজ দুঃখের দ্বারা যে সর্বপ্রাণীর দুঃখ নিবারণে সর্বদা নিরত, তাকে উত্তম পুরুষ বলে জানবে॥ ৪॥

যে মহৎ মানুষ উত্তম বোধি লাভ করতে ইচ্ছুক, গুরুগণ উপদিষ্ট সম্যক উপায় তাঁর কাছে বিশদ করে বলব॥ ৫॥

সম্যক সম্বুদ্ধের মূর্তি, চৈত্য ও শাস্ত্রের সম্মুখে পুষ্প, গন্ধধূপ ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিবেদন করবে॥ ৬॥

করজোড়ে, নতজানু হয়ে প্রথমে তিনবার শরণ-গমন আবৃত্তি করবে। যতদিন পর্যন্ত পরম বোধিসার প্রাপ্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত অনিবৃত্ত চিত্তে ত্রিরত্নেরই পূজা করবে। তদুপরি 'সমন্তভদ্রচর্যা'য় বিবৃত সপ্ত পূজার বিধি সম্পন্ন করবে॥ ৭-৮॥

প্রথমে, ত্রিদুর্গতি-জাত, জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণাকাতর সকল জীবের প্রতি মৈত্রীচিত্ত হও। প্রাণীমাত্রই দুঃখকাতর এবং দুঃখই দুঃখের কারণ—এই জেনে সর্বপ্রাণীর মুক্তির জন্য অনিবৃত্ত-প্রতিজ্ঞ হয়ে বোধিচিত্ত উৎপাদনে দৃঢ় হও॥ ৯-১০॥

মৈত্রেয়নাথের 'দ্রুমব্যূহ-সূত্র'-এ প্রণিধানচিত্ত উৎপাদনের গুণ বিবৃত হয়েছে। তা পাঠ করে কিংবা গুরুর কাছে শ্রবণ করে জানবে যে সম্বোধি চিত্তের গুণ অনন্ত। তা পুনঃপুনঃ অভ্যাস করবে॥ ১১-১২॥

'বীরদত্ত-পরিপৃচ্ছ-সূত্র' প্রভৃতিতে বোধিচিত্তের পুণ্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত। আমি সংক্ষেপে মাত্র তিনটি শ্লোকে তা বলব॥ ১৩॥

বোধিচিত্তের পুণ্য যদি রূপ গ্রহণ করত, তাহলে সমগ্র অন্তরীক্ষ পূর্ণ হয়েও তা নিঃশেষ হত না॥ ১৪॥

লোকনাথের (বুদ্ধের) উদ্দেশ্যে রত্নপূজা নিবেদন করে কেউ সমগ্র বুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ করতে পারেন, সেই মণিমুক্তা গঙ্গাতীরের বালুকণার মতই অসংখ্য হতে পারে। কিন্তু করজোড়ে যিনি মনে মনে অসীম বোধিচিত্তের উদ্দেশ্যে প্রণত হন, তাঁর ভক্তি-নিবেদন তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫-১৬ ॥

প্রণিধান বোধিচিত্ত উৎপাদনের পরে সযত্নে তা বর্ধনের চেষ্টা করবে। যথা উক্ত শিক্ষা পরজন্মের জন্যও স্মরণ ও সংরক্ষণ করবে ॥ ১৭ ॥

অবতার-চিত্ত-উৎপাদনের সম্বর নিজের অনধিকৃত থাকলে প্রণিধান-চিত্ত অনুৎপন্ন ও অবর্ধিত থাকবে। সম্বোধি সম্বর লাভ ও বর্ধন করতে হলে তা [অর্থাৎ অবতার-চিত্ত উৎপাদন] সযত্নে আয়ত্ত করতে হবে ॥ ১৮ ॥

সপ্ত-প্রতিমোক্ষ-সম্বর সর্বদাই লাভ করা যেতে পারে ; কিন্তু বিশেষ সৌভাগ্য না থাকলে বোধিসত্ত্ব-সম্বর লাভ সম্ভব নয় ॥ ১৯ ॥

তথাগতের উক্তি অনুসারে সপ্ত-প্রতিমোক্ষ-সম্বরের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের শ্রী সর্বোত্তম ; তাকেই ভিক্ষু-সম্বর বলা হয় ॥ ২০ ॥

শীল অধ্যায়ে [দশ] বোধিসত্ত্বভূমির বিধি ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে; সম্যক লক্ষণযুক্ত পরম গুরুর কাছে সম্বর গ্রহণ কর ॥ ২১ ॥

যিনি স্বয়ং সম্বরবিধিতে নিপুণ, যিনি স্বয়ং সম্বরে স্থিত, সম্বর-পতিতের প্রতি যিনি ক্ষমা ও করুণাময়—তাঁকেই শ্রেষ্ঠ গুরু বলে জানবে ॥ ২২ ॥

যাঁরা বহু চেষ্টাতেও এই জাতীয় গুরুর সন্ধান পাননি, তাঁদের কাছে আমি সম্বর-প্রাপ্তির সম্যক বিধি ব্যাখ্যা করব ॥ ২৩ ॥

'মঞ্জুশ্রী-বুদ্ধ-ক্ষেত্রালংকার-সূত্র'-এ বলা হয়েছে, অতীতে অম্বরাজ রূপে জন্মকালে মঞ্জুশ্রী কীভাবে বোধিচিত্ত উৎপাদন করেছিলেন ; এখানে তা উল্লেখ করছি ॥ ২৪ ॥

[শরৎচন্দ্র দাস বলেছেন, পরবর্তী ছয়টি শ্লোক (২৫—৩০) 'মঞ্জুশ্রী-বুদ্ধ-ক্ষেত্রালংকার-সূত্র' থেকে উদ্ধৃত]।

নাথদের সম্মুখে সম্যক-সম্বোধিচিত্ত উৎপাদন করে তিনি [মঞ্জুশ্রী] সর্বপ্রাণীকে ভবচক্র থেকে মুক্তির আহ্বান জানালেন ॥ ২৫ ॥

উত্তম বোধি প্রাপ্তি পর্যন্ত চিত্তকে ক্রোধ, কার্পণ্য ও ঈর্ষার কলুষ থেকে মুক্ত রাখতে হবে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা, পাপ ও কাম পরিহার এবং শীলসম্বরে সন্তুষ্টি দ্বারা বুদ্ধের অনুগামী হও ॥ ২৭ ॥

সত্বর স্বীয় বোধিলাভের জন্য ব্যগ্র হবে না। একটিমাত্র প্রাণীর জন্য হলেও সংসারের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ॥ ২৮ ॥

অনন্ত, অচিন্ত্য ক্ষেত্রসমূহ বিশোধন কর। দশদিকে সংস্থিত সর্বপ্রাণীর মুক্তিকল্পে ব্রতী হও ॥ ২৯ ॥

কায়-বাক্-চিত্তের সকল কর্ম শুদ্ধ কর। অকুশল কর্মে কখনো প্রবৃত্ত হবে না ॥ ৩০ ॥

কায়-বাক্-চিত্ত পরিশুদ্ধির দ্বারা অবতার-সম্বরে স্থিত হও। শীল-এর শিক্ষাপদ আয়ত্ত কর এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হও ॥ ৩১ ॥

সকল সম্বরের মধ্যে সম্বোধি-সত্ত্ব-সম্বর-লাভের জন্য বিশেষ যত্নবান হবে। এই ভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে ক্রমে তুমি সম্বোধি-সংঘ লাভ করবে ॥ ৩২ ॥

অভিজ্ঞান উৎপন্ন হলে সকল পুণ্য ও সকল জ্ঞানের স্বভাব পূর্ণ হয়—বুদ্ধগণ প্রত্যেকেই এই নির্দেশ দিয়েছেন ॥ ৩৩ ॥

অপারণত পক্ষ নিয়ে পাখি যেমন আকাশে উড়তে পারে না তেমনি অভিজ্ঞান শক্তি যার নেই, এমন ব্যক্তি দ্বারা প্রাণিহিত হয় না ॥ ৩৪ ॥

অভিজ্ঞান শক্তি অর্জন করলে দিনরাত্রির (চব্বিশ ঘণ্টার) মধ্যে যে পুণ্য অর্জন করা যায়, অভিজ্ঞান শক্তি বিনা শত জীবনেও তা আয়ত্ত করা যায় না ॥ ৩৫ ॥

আলস্যের দ্বারা নয়, অভিজ্ঞানের সাহায্যে একমাত্র কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই সম্যক সম্বোধি শীঘ্র লাভ করা সম্ভব ॥ ৩৬ ॥

আবার শমথ ব্যতীত অভিজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়, তাই শমথে উপনীত হবার ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে ॥ ৩৭ ॥

শমথ থেকে কণামাত্র বিচ্যুতি ঘটলে সহস্র বৎসরের কঠোর ধ্যানেও তুমি সমাধি প্রাপ্ত হবে না ॥ ৩৮ ॥

'সমাধি বর্গ' অধ্যায়ে (শমথের) উপাদান সমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, দৃঢ়ভাবে তাতে সুস্থিত হবে। যাই ধ্যান কর না কেন, সর্বদা চিত্তকে পুণ্যের অভিমুখে চালিত করবে ॥ ৩৯ ॥

যোগ-শমথ অবস্থায় উপনীত না হতে পারলে অভিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। প্রজ্ঞা-পারমিতা বিনা আবরণ ছিন্ন করা যায় না ॥ ৪০ ॥

তাই ক্লেশবৃত্তি ও জ্ঞেয়বৃত্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হলে যোগীকে সর্বদা উপায়-সহ প্রজ্ঞাপারমিতা ধ্যান করতে হবে ॥ ৪১ ॥

উপায়-ব্যতীত প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা-ব্যতীত উপায়—কোনোটিই ফলপ্রসূ নয়। তাই কোনোটিকেই অবজ্ঞা কোরো না ॥ ৪২ ॥

প্রজ্ঞা কী এবং উপায় কী—এ সম্বন্ধে সংশয় দূর করতে হলে প্রথমে প্রজ্ঞা ও উপায়ের মধ্যে পার্থক্য জানতে হবে ॥ ৪৩ ॥

জিনদের বচন অনুসারে, উপায় বলতে প্রজ্ঞা-পারমিতা ছাড়া দান-পারমিতা প্রভৃতি সকল কুশল ধর্মই বোঝায় ॥ ৪৪ ॥

নৈরাত্ম্য ধ্যানের দ্বারা নয়—উপায়-অভ্যাস ও প্রজ্ঞা-ধ্যানের দ্বারাই সত্বর বোধিলাভ সম্ভব ॥ ৪৫ ॥

স্কন্ধধাতু বা আয়তনসমূহ যে অজাত—স্বভাবশূন্যতার এই জ্ঞানই প্রজ্ঞা। [শাস্ত্রেও] একথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে ॥ ৪৬ ॥

[স্বভাবতঃ] সৎ-এর উৎপত্তি নেই। [স্বভাবতঃ] অসৎ আকাশকুসুমের মত। উভয়ই দোষদুষ্ট, উভয়ই অনুৎ ॥ ৪৭ ॥

স্বতঃ, পরতঃ বা উভয়তঃ [স্বতঃ এবং পরতঃ] ভবের জন্ম অসম্ভব। অহেতুও হতে পারে না। তাই তাকে নিঃস্বভাব বলেই জান ॥ ৪৮ ॥

আবার, বস্তু-ধর্মকে এক বা অনেক বলেও সনাক্ত করা সম্ভব নয়। অতএব তা নিশ্চয়ই শূন্য ॥ ৪৯ ॥

'শূন্যতা-সপ্তিত', 'মূল-মধ্যমক' প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবেই বস্তুসমূহের স্বভাবশূন্যতা ব্যাখ্যাত হয়েছে ॥ ৫০ ॥

[পুনরায়] তার বিশদ ব্যাখ্যার চেষ্টায় গ্রন্থের কলেবর বিশাল হবে। অতএব, তার পরিবর্তে ধ্যানের প্রয়োজনে সিদ্ধ সিদ্ধান্ত মাত্রই উক্ত হলো ॥ ৫১ ॥

প্রজ্ঞার সর্বধর্মই স্বভাবতঃ আলম্বনহীন। তাই নৈরাত্ম্য-ভাবনাই প্রজ্ঞা-ভাবনা ॥ ৫২ ॥

প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সর্বধর্মই অদৃশ্য [অলীক]। এই প্রজ্ঞা সুপরীক্ষিত বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত। অতএব বিকল্প বর্জন করে প্রজ্ঞানুগামী ধ্যান কর ॥ ৫৩ ॥

বিকল্পজাত ভবসংসার বিকল্পাত্মক। অতএব বিকল্পমুক্ত নির্বাণই উত্তমমতির (পরিচায়ক) ॥ ৫৪ ॥

তথাগত বলেছেন, বিকল্প মহামোহ মাত্র এবং সংসার-সমুদ্রে পতনের কারণ। তাই আকাশের মত নির্মল অ-বিকল্প সমাধিতে স্থিত হও ॥ ৫৫ ॥

'নির্বিকল্প-অবতার-ধারণী'-তেও উক্ত হয়েছে, নির্বিকল্প ধ্যানের ফলে জিনপুত্র দুরূহ বিকল্প জয় করে নির্বিকল্প লাভ করবেন ॥ ৫৬ ॥

শাস্ত্র ও বিদ্যার দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত যে সর্বধর্মই অজাত ও স্বভাবহীন। অতএব নির্বিকল্পের ধ্যান কর ॥ ৫৭ ॥

এই ধ্যানের দ্বারা ক্রমশ উষ্ণ, প্রমুদিত অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে অচিরে বুদ্ধত্ব লাভ করবে ॥ ৫৮ ॥

শান্তি, বিস্তর, মন্ত্র, ভদ্রকুম্ভ-ক্রিয়াজাত অন্তর্সন্ধির দ্বারা বা গুহ্যতন্ত্রের ক্রিয়া ও চর্যা দ্বারা সুখে বোধিলাভের কামনায়, প্রথমে সদ্গুরুর কাছে অভিষেক গ্রহণ করবে এবং রত্নাদি ও সেবার দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁর সন্তোষ উৎপাদন করবে ॥ ৫৯—৬১ ॥

সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হলে গুরু সর্বপাপ-বিশোধন অভিষেক দান করবেন এবং শুধুমাত্র এইভাবেই শিষ্য সিদ্ধিলাভের যোগ্য হবেন ॥ ৬২ ॥

ব্রহ্মচারীর গুহ্যজ্ঞান-অভিষেক সম্ভব নয়, কেননা 'আদিবুদ্ধ-মহাতন্ত্র'-এ তা দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ ॥ ৬৩ ॥

সেই অভিষেক গ্রহণের ফলে নিষিদ্ধ আচরণ ও তার ফলে তপঃ-সম্বর থেকে পতন ঘটে। এই মহাপাতকের ফলে ব্রতীর দুর্গতি-পতন অবশ্যম্ভাবী ॥ ৬৪-৬৫ ॥

কিন্তু যিনি সকল তন্ত্র শ্রবণ করেছেন এবং তার ব্যাখ্যা করতে পারেন, যিনি যজ্ঞ, দান ও পুজোয় রত এবং যিনি প্রকৃত গুরুর কাছে অভিষেক গ্রহণ করে এই সব বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য জেনেছেন—তাঁর পক্ষে এই অভিষেক নিষিদ্ধ নয় ॥ ৬৬ ॥

বোধিপ্রভ-র অনুরোধে সূত্র ইত্যাদি অবলম্বন করে বোধিপথের এই সংক্ষিপ্তসার আচার্য দীপংকরশ্রী কর্তৃক রচিত। মহাচার্য শ্রীদীপংকরজ্ঞান কর্তৃক রচিত গ্রন্থ এখানে সমাপ্ত।

ভারতীয় আচার্য দীপংকরশ্রীজ্ঞান ও তিব্বতী অনুবাদক (লোচাবা)' ভিক্ষু শুভমতি কর্তৃক অনূদিত, সংশোধিত ও উপস্থাপিত। মঙ্গলম্।

মহাচার্য শ্রীদীপংকরজ্ঞান কর্তৃক রচিত। সেই ভারতীয় পণ্ডিত ও লোচাবা শুভমতি কর্তৃক অনূদিত। শাংশুং-এর থোলিং মন্দিরে এই গ্রন্থটি রচিত।

পরিশিষ্ট—৩

তাঞ্জুরে সংরক্ষিত দীপংকরের রচনাবলীর মধ্যে সে গ্রন্থগুলির তিব্বতী তর্জমায় তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেছেন ঃ

১। অভিসময়-বিভঙ্গ
২। অমৃতোদয়-নাম-বলিবিধি
৩। অক্ষোভ্য-সাধন
৪। অষ্টভয়-ত্রাণ
৫। আপত্তি-দেশনা-বিধি
৬। আর্য-অচল-ক্রোধ-রাজ স্তোত্র
৭। আর্য-অবলোকিত-লোকেশ্বর-সাধন
৮। আর্য-গণপতি-রাগ-বজ্রসময় স্তোত্র
৯। আর্য-তারা স্তোত্র
১০। আয়ুঃ-সাধন
১১। এক-স্মৃতি-উপদেশ
১২। কর্ম-বিভঙ্গ
১৩। কর্ম-আবরণ-বিশোধন-বিধি-ভাষ্য
১৪। কায়-বাক্-চিত্ত-সুপ্রতিষ্ঠা
১৫॥ খসর্পণ-অবলোকিত-সাধন
১৬। গর্ভ-সংগ্রহ
১৭। চর্যা-গীতি-বৃত্তি
১৮। চর্যাসংগ্রহ-প্রদীপ
১৯। চিতা-বিধি
২০। চিত্তোৎপাদ-সম্বর-বিধি-ক্রম
২১। জল-বলি-বিমল-গ্রন্থ
২২। তারা-ভট্টারিকা-সাধন
২৩। দশ-অকুশল-কর্ম-পথ-(দেশনা)
২৪। দীপংকর-শ্রীজ্ঞান-ধর্ম-গীতিকা
২৫। দেব-পূজা-ক্রম
২৬। ধর্মধাতু-দর্শন-গীতি
২৭। নাগ-বলি-বিধি
২৮। পঞ্চ-চৈত্য-নির্বপণ-বিধি
২৯। পেয়োৎক্ষেপ-বিধি

৩০। প্রজ্ঞাপারমিতা-পিণ্ডার্থ-প্রদীপ
৩১। প্রজ্ঞা-হৃদয়-ব্যাখ্যা
৩২। বোধিচিত্ত-মহাসুখ-আম্নায়
৩৩। বোধি-পথ-প্রদীপ
৩৪। বোধি-মার্গ-প্রদীপ-পঞ্জিকা
৩৫। বোধিসত্ত্বাদিকর্মিক-মার্গাবতার-দেশনা
৩৬। ভগবদ্-অক্ষোভ্য-সাধন
৩৭। মধ্যমক-উপদেশ
৩৮। মন্ত্র-অর্থ-অবতার
৩৯। মহাযক্ষ-সেনাপতি-নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি-সাধন
৪০। মহাযান-পথ-সাধন-ধর্ম-সংগ্রহ
৪১। মহাযান-পথ-সাধন-সংগ্রহ
৪২। মুমুর্ষু-শাস্ত্র
৪৩। মুলাপত্তি-টীকা
৪৪। মৃত্যু-বঞ্চন
৪৫। রত্ন-করণ্ড-উদ্ঘাট-নাম-মধ্যমক-উপদেশ
৪৬। লোকাতীত-সপ্তাঙ্গ-বিধি
৪৭। বজ্রযোগিনী-সাধন
৪৮।
৪৯। } বজ্রযোগিনী-স্তোত্র
৫০। বজ্রাসন-বজ্রগীতি
৫১। বজ্রাসন-বজ্রগীতি-বৃত্তি
৫২। বসুপতি-উপাধি-পঞ্চক-স্তোত্র ব ?মেঘাবেশ
৫৩। বিমল-রত্ন-লেখ
৫৪।
৫৫। } বিমলোষ্ণীষ-ধারণী-বিধি
৫৬। শমহোম
৫৭। শ্রীগুহ্য-সমাজ-লোকেশ্বর-সাধন
৫৮। শ্রীগুহ্য-সমাজ-স্তোত্র
৫৯। শ্রী-চক্র-সম্বর-সাধন
৬০। শ্রী-ভগবৎ-অভিসময়
৬১। শ্রী-বজ্রপাণি-স্তোত্র
৬২। শ্রী-বজ্রযোগিনী-সাধন
৬৩। সত্যদ্বয়-অবতার
৬৪। সপ্ত-পর্ব-বিধি
৬৫। সময়-গুপ্তি

৬৬। সমাধি-সম্ভার-পরিবর্ত

৬৭। সর্ব-কর্ম-আবরণ-বিশুদ্ধি-কর-বিধি

৬৮। সর্ব-কর্ম-আবরণ-বিশোধন-নাম-মণ্ডল-বিধি

৬৯। সর্ব-তথাগত-সময়-রক্ষা-সাধন

৭০। সর্ব-সময়-সংগ্রহ

৭১। সিদ্ধ-একবীর-মঞ্জুঘোষ-সাধন

৭২। সূত্র-সমুচ্চয়-সঞ্চয়ার্থ

৭৩। সূত্র-অর্থ-সমুচ্চয়-উপদেশ

৭৪। সেক-উপদেশ

৭৫। সৌধ-দান

৭৬। সংচোদন-সহিত-স্বকৃত্য-ক্রম-বর্ণ-সংগ্রহ

৭৭। সংসার-মনোনির্যাণীকার-নাম-সংগীতি

৭৮। হোম-বিধি

৭৯। হৃদয়-নিক্ষেপ

পরিশিষ্ট—৪

তাঞ্জুরে সংরক্ষিত দীপংকরের যে রচনাবলীর তিব্বতী তর্জমায় তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন নি ঃ

১। অধ্যয়ন-পুস্তক-পঠন-পুরস্ক্রিয়া-বিধি
২। অমিতাভ-হৃদয়-রাগ-যমারি-সাধন
৩। আর্য-গণপতি চিন্তা-রত্ন (সাধন)
৪। আর্য-ষড়ক্ষরী-সাধন
৫। আর্য-হয়গ্রীব-সাধন
৬। একবীর-সাধন
৭। কর্তরিধর-জ্ঞাননাথ-আত্ম-উৎপাদন-জপ-স্তোত্র
৮। কর্ম-বজ্র-গৌরী-সাধন
৯। কুল-প্রণিধান
১০। গণপতি-গুহ্য-সাধন
১১। গুরু-ক্রিয়া-ক্রম
১২। চণ্ড-খড়্গ-যমারি-সাধন
১৩। চণ্ড-মহারোষণ-সাধন-পরমার্থ
১৪। চর্যাগীতি
১৫। দণ্ডধুক্-বিদার-যমারি-নাম-সাধন
১৬। প্রতীত্য-সমুৎপাদ-হৃদয়-মন্ত্র-প্রক্রিয়া-সংক্ষিপ্ত-ব্যূহ
১৭। প্রজ্ঞা-সুখ-পদ্ম-যমারি-সাধন
১৮। পারমিতা-যান-সপ্ত(ক)-নির্বপণ বিধি
১৯। বলি-বিধি
২০। বোধিসত্ত্ব-চর্যাবতার-ভাষ্য
২১। বোধিসত্ত্ব-চর্যা-সূত্রীকৃতাববাদ
২২। বোধিসত্ত্ব-মণ্যাবলী
২৩। মহাসূত্র-সমুচ্চয়
২৪। মুদ্গর-ক্রোধ-যমারি-সাধন
২৫। রত্ন-সম্ভব-যমারি-সাধন
২৬। রত্নালংকার-সিদ্ধি
২৭। বজ্রগীতি-সুখার্থ-সাধন
২৮। বজ্র-চর্চিকা-সাধন
২৯। বজ্র-তীক্ষ্ণ-যমারি-সাধন

৩০। বজ্র-ডাক·যোগিনী-সাধন
৩১। বজ্র-বারাহী-সাধন
৩২। বৈরোচন-যমারি-উপায়িকা
৩৩। শরণ-গমন-দেশনা
৩৪। শ্রী-গণপতি-শান্তি-সাধন
৩৫। শ্রী-সহজ-সম্বর···(অসম্পূর্ণ শিরোনাম)
৩৬। শ্রী-হয়গ্রীব-সাধন
৩৭। স্থানিপূণ-মহাদেব-বিঘ্ন-রাজ-সাধন
৩৮। হোম-বিধি